# অস্তিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে

সম্পাদনা

সঞ্জীব ঘোষ

নলেজ হোম ॥ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
১৮ শ্রাবণ ১৩৭৭

*

ভারতে প্রাপ্তিস্থান
বুক সেন্টার
৭৬ বউবাজার স্ট্রিট
কলকাতা ১২

*

প্রকাশক
এ. এম. খান মজলিশ
নলেজ হোম
১৪৬ গভর্নমেন্ট নিউমার্কেট
ঢাকা ৫

মুদ্রক
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা
ঢাকা ২

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

জাঁ-পল সার্ত্র্

সিমোন দ্য বোভয়রের উদ্দেশে

# ॥ মুখবন্ধ ॥

তিন সহকর্মী মিলে বেশ কয়েক বছর ধরেই অস্তিবাদী দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম। মাঝে মাঝে নানা আলোচনা-চক্রে শ্রোতা ও বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণও করেছি। অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কথা সাহিত্যিক প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষ, ড. মৃণাল ভদ্র, ড. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক রমাকান্ত সিনারী, শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. উজ্জ্বল মজুমদার, ড. দেবব্রত সিন্‌হা এবং অধ্যাপক আর্থার দান্তো নানা সময়ে অস্তিবাদ বিষয়ে আমাদের সংগে আলোচনা করে যে উৎসাহ দিয়েছেন, তার জন্য এঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত একটা সময় এলো যখন বুঝলাম এবার লিখিত আকারে আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলি প্রকাশ করা দরকার। নানা পত্র-পত্রিকায় যে যার মতো তা প্রকাশও করলাম কিছুকাল ধরে। নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আমাদের লেখাগুলিকে (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) আরও ঘষামাজা করে একটি বই-এর আকারে রূপ দেওয়া যায় কিনা, এ নিয়ে যখন পরবর্তীকালে তিনজন বসলাম, তখন অগ্রজপ্রতিম দুই সহকর্মী সানন্দে রাজী হয়ে এ কাজের দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলেন। অন্যদিকে বন্ধুবর সুনীল ভট্টাচার্যের অবিরাম তাগাদ শেষ পর্যন্ত আমাকেও দায়মুক্ত করল—বইটি প্রকাশিত হলো।

বইটির নাম যদিও 'অস্তিবাদ : দর্শনে ও সাহিত্যে', তবু দর্শনে ফেনোমেনোলজি বা মানসঘটনাবাদের জনক এডমুণ্ড হুসার্লের চিন্তাধারা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এর কারণ, মার্টিন হাইডেগার এবং জাঁ-পল সার্ত্র্ উভয়েই ছিলেন হুসার্লের ছাত্র এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। মানসঘটনাবাদী হিসেবেই দর্শনে উভয়ের যাত্রা শুরু, যদিও পরবর্তীকালে উভয়েই তাঁদের মন্ত্রগুরু হুসার্লের মানসঘটনাবাদ থেকে দূরে সরে এসেছিলেন। হাইডেগার ও সার্ত্রু-কে বুঝতে গেলে হুসার্লের দর্শন আলোচনা তাই অপরিহার্য মনে হয়েছে। এছাড়া, মার্লো পঁতির চিন্তাভাবনার সম্যক্ অনুধাবনের জন্যও হুসার্ল-আলোচনা প্রয়োজন।

অস্তিবাদী দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে আমাদের দেশে আন্তরিক চর্চা খুব একটা হয় নি। ব্যতিক্রম দু'একজন অবশ্যই আছেন। লেখালেখি যা হয়েছে তা-ও মূলত ইংরেজি ভাষাতেই। ইদানীংকালে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বাধা অবশ্য নানা রকমের, তবে প্রধানত পরিভাষার। তবু মাতৃভাষাতেই অস্তিবাদী দর্শন ও সাহিত্যকে সাধারণ জনমানসে পৌঁছে দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, অনেকেই। এঁদের সকলের, বিশেষ করে আমার একান্ত শুভার্থী বহুভাষাবিদ্ ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি ঋণী।

সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে এখানে আমি সংকলকের কাজই করেছি। কোন লেখাতেই কলম চালাই নি, চালাবার স্পর্ধাও রাখি না। প্রতিটি লেখার দায়িত্ব তাই সংশ্লিষ্ট লেখকের, সম্পাদকের নয়। বইটির আমিও অন্যতম লেখক। বাড়তি কাজ শুধু লেখাগুলি সাজানো—সেটা সানন্দেই করেছি। সম্পাদনার কোন কৃতিত্ব থাকলে তার দাবীদার আমি নই, ত্রুটি থাকলে দায় নিশ্চয়ই আমার।

বইটি প্রকাশ করার মূল উদ্দেশ্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দর্শন চর্চার প্রসারে সাহায্য করা, আর এই উদ্দেশ্য সফল হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

সঞ্জীব ঘোষ

# অস্তিবাদের স্বরূপ

সমকালীন সাহিত্য ও দর্শনের অন্যতম আন্দোলন হিসেবে অস্তিবাদ নতুন হলেও এর শেকড় রয়েছে হিব্রু সাহিত্যে এবং জার্মান কল্পরম্যবাদ বা রোম্যান্টিসিজমের মধ্যে। আধুনিক কালে অস্তিবাদের উদ্ভব হয়েছে জার্মান দার্শনিক এডমুণ্ড হুসার্লের মানস-ঘটনাবাদ বা ফেনোমেনোলজি থেকে, যদিও কোপেনহেগেনের দার্শনিক সোরেন কিয়েকের্গার্দের চিন্তায় অস্তিবাদী দর্শনের মৌল বৈশিষ্ট্য প্রথম পরিলক্ষিত হয়। কিয়েকের্গার্দই অস্তিবাদের আদিগুরু।

অস্তিবাদ বিশ শতকের বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি ও দার্শনিকের ভাব-ভাবনার দর্পণে এবং জীবনচর্যা ও জীবনচর্চায় প্রতিফলিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিমী দুনিয়ায় অস্তিবাদ নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি ; তবে অস্তিবাদ নিয়ে হৈচৈ-এর মাত্রার তীব্রতা ও ব্যাপকতা এখানে অপেক্ষাকৃত কম।

দর্শনের ইতিহাসে অস্তিবাদের দুটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়—আস্তিক ও নাস্তিক। সোরেন কিয়েকের্গার্দ, কার্ল য়্যাস্পার্স ও গ্যাব্রেল মার্সেলের চিন্তাধারা আস্তিক-অস্তিবাদ হিসেবেই চিহ্নিত। মানুষকে বড়ো করে তুলে ধরলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঈশ্বর বা পরমসত্তা জাতীয় কোন তত্ত্বে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে, ফ্রীদ্রিখ্ নীৎসে, জাঁ-পল সার্ত্র্ ও আল্বের ক্যামুর দর্শন নাস্তিক-অস্তিবাদ নামে অভিহিত। ঈশ্বর তাঁদের কাছে মৃত ; মানুষই সব। মার্টিন হাইডেগারের দর্শনকে আস্তিক বা নাস্তিক কোন আখ্যায়ই আখ্যায়িত করা সংগত নয় বলে মনে হয়, কেননা, ঈশ্বর সংক্রান্ত সরাসরি প্রশ্নে তিনি ছিলেন উদাসীন। ফরাসী দার্শনিক মরিস মার্লো পঁতিকে অন্যান্য অস্তিবাদীদের মতো 'অস্তিবাদী' লেবেল হয়তো মারা যাবে না, কেননা, দর্শনের ইতিহাসে তিনি মানসঘটনাবাদী হিসেবেই চিহ্নিত। তবে, মানসঘটনাবাদের জনক হুসার্ল এবং অস্তিবাদের প্রচার সচিব সার্ত্র্-এর চিন্তাভাবনার সংগে তাঁর দর্শনের সাদৃশ্য রয়েছে। হুসার্ল ও সার্ত্র্-এর দ্বারা তিনি প্রভাবিতও হয়েছেন গভীরভাবে। দর্শনের ইতিহাসে মার্লো পঁতিকে তাই অনেকে 'অস্তিবাদমূলক মানসঘটনাবাদী' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।

অস্তিবাদীরা কোন দার্শনিক 'সম্প্রদায়' বা 'গোষ্ঠী'-র অন্তর্ভুক্ত নন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে তাঁরা নিজ নিজ বক্তব্য রেখেছেন। ফলে, সাধারণভাবে সর্বাদীসম্মত কোন মতবাদ অস্তিবাদ থেকে পাওয়া যায় না। তবে, মোটামুটিভাবে বিভিন্ন অস্তিবাদীদের বক্তব্য জানার পর অস্তিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের একটা পরিচয় পাওয়া যায়, আর তা থেকেই আমরা অস্তিবাদ সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি।

অস্তিবাদ দার্শনিকীকরণের অন্যতম পন্থা, দার্শনিক মতবাদের সমষ্টি নয়। এই দার্শনিকীকরণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। অস্তিবাদ কোন বস্তু বা বস্তুসামগ্রীর দর্শন নয়, এ হলো মনুষ্য-পরিস্থিতির দর্শন। এ দর্শন বিষয়ীর

দর্শন, বিষয়ের দর্শন নয়। এ দর্শনে যুক্তির বদলে অনুভূতি ও কর্মই প্রাধান্য পেয়েছে। দর্শকের নয়, অভিনেতার দৃষ্টিকোণ থেকে অস্তিবাদীরা জীবন ও জগৎকে দেখেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভংগী তাই বিষয়গত। তাঁদের কাছে সত্য কদাপি ব্যক্তিমন যোগাচ্ছিন্ন হতে পারে না। অস্তিবাদ অনুসারে, এই বিরাট পৃথিবীর মূল্য আমার কাছে ততোটুকুই যতোটুকুতে আমি 'জড়িয়ে' আছি। সত্যের মূল্য তখনই যখন আমার অন্তরের গভীরে তার উপলব্ধি ঘটছে, যখন তার সংগে আমার আমিত্বের যোগাযোগ হচ্ছে।

অস্তিবাদ ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। ভাববাদ ব্যক্তিমানুষকে পরমসত্তার বা নৈর্ব্যক্তিক সার্বিক বুদ্ধির অংশ হিসেবে রূপায়িত করেছে। অন্যদিকে, প্রকৃতিবাদ মানুষকে জড় জগতের অংশে পরিণত করেছে, মানুষকে করে তুলেছে যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদ উভয়েই মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিককে, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে উপেক্ষা করেছে। মূর্ত মানুষের বাস্তবতা, স্বাধীনতা, এবং দায়বদ্ধতা ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদে নিশ্চিহ্ন। পক্ষান্তরে, অস্তিবাদ মূর্ত মানুষের দায়িত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য যে কোন মূল্য দিতে বদ্ধপরিকর। হেগেলের সর্বব্যাপী জ্ঞানবাদ ও বিশ্বগ্রাসী পরমাত্মাবাদের হাত থেকে দর্শনকে মুক্ত করার মহান দায়িত্ব তাই অস্তিবাদীরা নিয়েছেন।

অস্তিবাদ অনুসারে, মানব-অস্তিত্বের আসল রহস্য বুদ্ধি বা চিন্তার মাধ্যমে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় বেঁচে থাকার বাস্তবতার মধ্যে। মনের স্বমুখীনতায় নিহিত আছে অস্তিত্বের আসল রহস্য। আস্তিক বা নাস্তিক, মার্ক্সীয় বা অমার্ক্সীয়, ক্যাথলিক বা প্রটেস্টান্ট সব অস্তিবাদীরাই এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ফরমুলায় বা সূত্রাকারে মানবজীবনের ও মূর্ত অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। বুদ্ধি অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনে অক্ষম। অস্তিবাদ অনুসারে, 'বেঁচে থাকা' ( to live ) আর 'অস্তিত্বশীল হওয়া' ( to exist ) এক নয়। অর্থহীন জীবনযাপন করাকে 'বেঁচে থাকা' বলা যায়, কিন্তু 'অস্তিত্বশীল হওয়া' বলা যায় না কিছুতেই।

সকল অস্তিবাদীরাই এ বিষয়ে একমত যে, "অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্ববর্তী"। এটাই অস্তিবাদী দর্শন ও সাহিত্যের মূলতত্ত্ব। অস্তিবাদকে বুঝতে হলে এই মূলতত্ত্বটিকে ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। দর্শনের ইতিহাসের আদিযুগ থেকেই 'অস্তিত্ব' ( existence ) ও 'সারধর্ম' ( essence ) এই দুটি শব্দ নিয়ে দার্শনিকরা অনেক আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করে আসছেন। দর্শনের ইতিহাসে তাই দেখা যায় চিন্তা-রাজ্যে কখনও অস্তিত্বের প্রাধান্য, কখনও বা সারধর্মের প্রাধান্য। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন বস্তু যা তাই হয়েছে, তাকেই সেই বস্তুর সারধর্ম বলা হ..। এই সারধর্ম ঐ জাতীয় বস্তুর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য রূপে আমাদের বুদ্ধি বা চিন্তার কাছে ধরা দেয়। এই অর্থে সারধর্ম সব সময়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য সামান্য ধারণা হিসেবে স্বীকৃত। প্লেটো থেকে শুরু করে সকল ভাববাদী দার্শনিকরা সারধর্মকেই দর্শনে প্রাধান্য দিয়েছেন, মুখ্য বলে গণ্য করেছেন, অস্তিত্বকে বরাবরই করেছেন অবজ্ঞা বা অবহেলা। ভাববাদী চিন্তায় তাই অস্তিত্ব গৌণ, অনেক সময় উপেক্ষিতও। ভাববাদীরা লক্ষ্য করেছেন যে, 'অস্তিত্ব' শব্দটি ক্ষয়িষ্ণুতা ও পরিবর্তনশীলতাকে সূচিত করে। তাই আমাদের বুদ্ধি ঐ জগৎ থেকে সরে এসে অপরিবর্তনশীল, শাশ্বত ও সার্বিক সারধর্মের প্রতি আকৃষ্ট

হয়েছে। এ জগৎ 'ধারণা' ও 'আকার'-এর জগৎ। সারধর্ম সর্বদাই বিমূর্ততা ও সার্বিকতা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। কিন্তু দর্শনের ইতিহাস সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, চিন্তা-জগতে সারধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য চিরকাল বজায় থাকে নি; এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। আর এ বিদ্রোহ—অস্তিত্বের বিদ্রোহ; সার্বিকতা, বিমূর্ততা ও সারধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষ মূর্ত। আধুনিক অস্তিবাদ বলতে হেগেলের সারধর্মবাদের বিরুদ্ধে অস্তিত্বের মূর্ততার বিদ্রোহকেই বোঝায়, আর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন অস্তিবাদের আদিগুরু কিয়েকের্গাদ এবং তা বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিয়েছেন সার্ত্র।

'অস্তিত্ব' শব্দটি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব-শীলতা জগতে সেই বস্তুর বাস্তব অবস্থিতিকে নির্দেশ করে। অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থই হলো বস্তুজগতে দৈশিক ও কালিক সম্পর্কযুক্ত হওয়া। কিন্তু 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল' —এ জাতীয় বচনে যখন 'অস্তিত্ব' শব্দটির প্রয়োগ হয়, তখন তা কোন প্রকারেই ঈশ্বরের এই জগতে বাস্তব অবস্থিতিকে নির্দেশ করে না। 'সংখ্যার কি অস্তিত্ব আছে?'—এ জাতীয় বচনে 'অস্তিত্ব' শব্দটির ব্যবহারও অন্য অর্থে হয়েছে। 'অস্তিত্ব' শব্দটির বিভিন্ন অর্থের পেছনে না ছুটে এবার দেখা যাক, 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে অস্তিবাদীরা কী অর্থে গ্রহণ করেছেন। অস্তিবাদীদের কাছে 'অস্তিত্ব' শব্দটির একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে। তাঁদের কাছে 'অস্তিত্ব' শব্দটি একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একমাত্র মানুষই অস্তিত্বশীল—এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালা, টেবিল-চেয়ার, মনুষ্যেতর জীব, ঘর-বাড়ি ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব নেই। অস্তিবাদ অনুসারে, এ সব কিছুরই 'বাস্তব সত্তা' আছে, জগতে এগুলি 'বর্তমান', কিন্তু 'অস্তিত্বশীল' নয়। অস্তিবাদীদের কাছে 'অস্তিত্ব' শব্দটি সক্রিয়ভাবে ও স্বাধীনভাবে সংকল্প, নির্বাচন (বা মনোনয়ন) ও কর্ম করে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করাকেই নির্দেশ করে। অস্তিবাদ নিঃসন্দেহে তাই একটি ব্যবহারিক দর্শন। অস্তিবাদ অনুসারে, অস্তিত্বশীলতার অর্থই হলো স্বাধীনভাবে ও সক্রিয়ভাবে 'আমি কী হবো' তা নির্বাচন করা। মানুষ প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং নতুন করে নিজেকে তৈরি করে। ব্যক্তি প্রথমে অস্তিত্বশীল এবং পরে তার সার-ধর্ম বা প্রকৃতি সে তার অস্তিত্বের মাধ্যমেই অর্জন করে। মানুষের কোন স্থিরীকৃত বা নির্দিষ্ট সারধর্ম নেই। অস্তিত্ব তাই সারধর্মের পূর্ববর্তী।

শিল্প-সভ্যতা, যান্ত্রিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিক প্রবণতার বিরুদ্ধেও অস্তিবাদ প্রতিবাদমুখর। যুদ্ধোত্তর সমাজে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ পলে পলে যারা দেহ-প্রাণ-মন বিনিময়ে এ সভ্যতার মূল্যের কড়ি গুণছে, তাদের কাছে এ সভ্যতা মেকী মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আজকের সভ্যতায় মানুষের সমস্যা প্রতি-নিয়ত তাকে আশংকা ও উদ্বেগের চাপের টানাপোড়েনে অস্থির করে দিচ্ছে। এই যান্ত্রিক ও শিল্পসভ্যতার ফল হৃদরোগ, রক্তচাপ, নিঃসংগতা, বিচ্ছিন্নতা, মানসিক বিকার ও বিকৃত রুচি। মরণের নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে, স্নায়ুচাপ বাড়ছে, ব্যক্তিকে তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে গোষ্ঠীর আনুগত্য স্বীকার করতে হচ্ছে। ক্লান্ত অবসন্ন মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যুদ্ধে হার মেনে হতাশ হয়ে যাচ্ছে। গণসমাজের চাপে সে পিষ্ট। মানুষের এই ছবি অস্তিবাদীদের কাছে অসহ্য। অস্তিবাদ*

অনুসারে, মানুষ আজ যন্ত্রের দাস। যান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার বিরুদ্ধে অস্তিবাদ তাই প্রতিবাদমুখর। অস্তিবাদীরা মনে করেন, এ সভ্যতার কাছ থেকে আমরা যা পাচ্ছি তা আলো নয়, আলেয়া। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করতে না পারলে মানুষ অচিরেই হারাবে তার একান্ত সম্পদ—তার অন্তরাত্মা।

অস্তিবাদকে মুখ্যত মনুষ্যজীবন ও বিশেষ মননেতর বস্তুনিচয়কে বুদ্ধির প্রকারে (Categories) রূপান্তরিত করার বিরুদ্ধে এক জেহাদ বলা যায়। সাধারণভাবে অস্তিবাদকে অধিবিদ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক-ধর্মীয় চিন্তাধারার উদ্দীপক হিসেবেই এর গুরুত্ব বেশী। অস্তিবাদীরা মনে করেন যে, দর্শনের একটি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে, যা নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত হওয়া উচিত। এদিক থেকে বিচার করলে অস্তিবাদীদের বক্তব্য ও অবদান আধুনিক বিশ্লেষণী দর্শনের বক্তব্য ও অবদানের চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট, জোরালো ও সমর্থন-যোগ্য।

অস্তিবাদ অনুসারে, আজকের দিনে আরাম-কেদারায় শুয়ে কোন দর্শন রচিত হতে পারে না। বিমূর্ত চিন্তায় মগ্ন থাকাকে সেজন্যই অস্তিবাদে 'অপরাধ' (নৈতিক) বলে গণ্য করা হয়। যে দর্শনের সংগে মর্ত্যজীবনের কোন সম্বন্ধই নেই, অস্তিবাদীরা তাতে আগ্রহী নন। বাস্তব মনুষ্য-পরিস্থিতির প্রতি তাঁরা গভীর আগ্রহী এবং কোন কোন অস্তিবাদী মার্কস্‌বাদের প্রভাবে অসংগত ও অপ্রীতিকর মনুষ্য-পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনেও উৎসাহী। অস্তিবাদীরা মনে করেন, আতংক, উদ্বেগ, হতাশা, অপরাধবোধ, সসীমতা, একাকীত্ব, স্বাধীনতা-পরাধীনতা, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, হিংসা, বিচ্ছিন্নতা বা চ্যুতি, মৃত্যুবোধ ইত্যাদি মানব-অস্তিত্বের অপরিহার্য অংগ। এগুলিকে বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে মানুষের যথার্থ দর্শন ও সাহিত্য রচিত হতে পারে না। অস্তিবাদ তাই যুগভাবনার হুবহু প্রতীক বলেই মনে হয়। এতদিন পর্যন্ত দার্শনিকরা যে ধারায় চিন্তা করেছেন অস্তিবাদী চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দর্শনে এতদিন ধরে যে ভাবে মানুষকে চিত্রায়িত করা হয়েছে, যেভাবে মানুষের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, অস্তিবাদ তার বিরুদ্ধে এক জলন্ত প্রতিবাদ।

মোটামুটিভাবে এই হলো অস্তিবাদ। অস্তিবাদ যেহেতু কোন প্রণালীবদ্ধ দর্শন নয়, এবং যেহেতু অস্তিবাদীরা কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন, সেহেতু অস্তিবাদকে বুঝতে গেলে আলাদা আলাদাভাবে জানতে হবে অস্তিবাদীদের। তবে, এরও আগে জানা প্রয়োজন, কেন এই অস্তিবাদ ?

'অভিজ্ঞতাবাদ', 'বুদ্ধিবাদ', 'বস্তুবাদ', 'ভাববাদ', 'দৃষ্টবাদ', 'প্রয়োগবাদ', 'বিশ্লেষণী দর্শন', প্রভৃতির মতো অস্তিবাদ দর্শনের কোন একটি বিশেষ 'লেবেল' নয়। আমরা যদিও কোন কোন দার্শনিককে 'অস্তিবাদী' বলে চিহ্নিত করি, তাঁরা কিন্তু নিজেদের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত করতে রাজী নন। এমন কি, 'অস্তিবাদ', 'অস্তিবাদী' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতেও এখন তাঁদের আপত্তি। এই শব্দ দুটির যথেচ্ছ ব্যবহারই এর মূল কারণ। অস্তিবাদ আসলে এক ধরনের দার্শনিকীকরণ, বা বলা যেতে পারে, এ হলো এক ধরনের দর্শন-ক্রিয়া (Philosophical activity),—১৯৪০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ইউরোপে যার প্রসার ঘটেছে এবং আজ পর্যন্ত যার প্রভাব মানব-

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। অস্তিবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য প্রচলিত বা গতানুগতিক পাশ্চাত্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রশ্ন হলো, নানা ধরনের পাশ্চাত্ত্য দর্শন থাকা সত্ত্বেও অস্তিবাদের জন্ম হলো কেন ? নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে। কেন এই দর্শন-ক্রিয়া বা দর্শন-আন্দোলনের উদ্ভব হলো তা জানা না থাকলে অস্তিবাদী দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডের আলোচনা কখনই পূর্ণাঙ্গ হবে না।

ইউরোপের মাটিতে কেন জন্ম নিল অস্তিবাদ ? কেন অস্তিবাদ ইউরোপের বিভিন্ন মনীষীদের সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করল ? কী ছিল এই দার্শনিকীকরণ ও আন্দোলনের মধ্যে যাতে আকৃষ্ট হলেন প্রখ্যাত অনেক নাট্যকার, চিত্রকর, কবি, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট যাজক, মনোবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকরা ? ইউরোপের অনেক তরুণ বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণভাবে যুবসমাজ কেন এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন সারা বিশ্বে ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কেন এই আন্দোলন ইউরোপের গণ্ডী পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে ? এরকম আরো 'কেন'-র উত্তর আমাদের পেতে হবে যদি অস্তিবাদকে তথা অস্তিবাদীদের জানতে হয়, বুঝতে হয়।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, এতদিন ধরে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিকরাই অনুধ্যানমূলক (speculative) দর্শনের প্রতি ছিলেন আসক্ত এবং দর্শন-মণ্ডলী ( Philosophical System ) গঠনে উৎসাহী। বিমূর্ত দর্শন-চিন্তা ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবনায় তাঁরা ছিলেন মগ্ন। মানব-অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি তাঁরা কোন আগ্রহ দেখান নি। রক্তমাংসে-গড়া ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব ও তার সমস্যাবলী গতানুগতিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে উপেক্ষিত। ফলে, পাশ্চাত্ত্য দর্শন হয়ে পড়েছে বাস্তবতা-বর্জিত।

মধ্যযুগের ইউরোপের পোপ অধ্যুষিত খ্রীস্টীয় জগতে যেমন ব্যক্তি মানুষের কোন মূল্যই ছিল না, তেমনি পাশ্চাত্ত্যের ভাববাদী দর্শনেও ব্যক্তি মানুষের কোন মূল্য দেওয়া হয় নি। ভাববাদী দার্শনিকরা যুগ যুগ ধরে মানুষের ভাবসত্তা ও আত্মিক অস্তিত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। তাঁদের কাছে মানুষের বাহ্যিক অস্তিত্ব এবং বাস্তব জগতের সত্তা ছিল নঙর্থক। সর্বগ্রাসী পরমাত্মায় সব কিছুই লীন হয়ে গেছে। সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে এঁদের কাছে অস্তিত্ব অপেক্ষা সারধর্মের প্রাধান্য ছিল বেশী। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে মানবতাবাদ যখন তার যথার্থ স্বীকৃতি পেল তখন খ্রীস্টীয় জগতের সর্বগ্রাসী ঈশ্বরতত্ত্বের হাত থেকে উদ্ধার পেল ব্যক্তিমানুষ ও তার অস্তিত্ব। ভাববাদী দর্শনের হাত থেকে মানুষ আবার মুক্তি পেল মার্কসবাদের প্রসার ও প্রচারের ফলে। মার্কসীয় দর্শনে মানুষ পেল বাস্তবের আস্বাদ। মার্কসের পর ধীরে ধীরে নানা কারণে মার্কসবাদেও দেখা গেল সমষ্টিবাদের প্রাধান্য, ব্যক্তিমানুষ হারিয়ে ফেলল তার স্বাধীনতা। ব্যক্তি তার ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানব-অস্তিত্বের সংকট ও সমস্যা হয়ে পড়ে আরো তীব্র। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসার এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে পড়ল [illegible] অনাচার-

ভণ্ডামী, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনীতির সর্বগ্রাসী চরিত্র—সব কিছু মিলে মানুষকে করে তুলল বিপন্ন। কেবল পাশ্চাত্যে নয়, গোটা পৃথিবী জুড়ে চলছে এক অরাজকতা ও অস্থিরতা। চারদিকে শুধু সমস্যা আর সংকট। আর এ সংকট শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক জগতেও তা প্রকট। একটা প্রচণ্ড অর্থহীনতা আজ মানবসমাজের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষ আজ নিঃসংগ, দিশেহারা। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মানুষের এই চেহারা কয়েকজন দার্শনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এ যাবৎকাল বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও জগৎ-কে দেখেছেন দার্শনিকরা। ফলে গতানুগতিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বিমূর্তায়নের মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় নি তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হতাশা, উদ্বেগ, মনস্তাপ, বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, প্রভৃতি যা মানব-অস্তিত্বের একান্ত অপরিহার্য অংগ। মানুষের বাস্তব জীবন যে যুক্তিবিজ্ঞানের ফরমুলায় চলে না এটা অনেক দার্শনিকই বোঝেন না। বিশ্লেষণী দর্শনও মানব-অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনে অপারগ।

প্রকৃতিবাদ মানুষকে জড় জগতের অংশে পরিণত করেছে, মানুষকে করে তুলেছে যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। ভাববাদের মতো প্রকৃতিবাদেও ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন স্থান নেই। অন্যদিকে, সমষ্টিবাদ ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা, তার সত্তা, তার আন্তর বৃত্তি-সমূহের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সম্ভাবনাকে নিষ্পেষিত করেছে, তার স্বাভাবিক অগ্রগতিকে করেছে ব্যাহত। মার্ক্সবাদ নিঃসন্দেহে মানুষকে আলো দেখিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, পথের সন্ধান দিয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গীর ঘটিয়েছে অনেক পরিবর্তন, কিন্তু নানাদেশে মার্ক্সবাদ নানাভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ার ফলে মানুষ শেষ পর্যন্ত সঠিক পথের সন্ধান পায় নি। সাম্যবাদী দেশগুলিতেও ব্যক্তিস্বাধীনতার ছবি অস্তিবাদীদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। বোধ করি সেজন্যই জাঁ-পল সার্ত্র্ মার্ক্সবাদকে 'এ যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েও মার্ক্সবাদের কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বজায় রাখতে চেয়েছেন।

গতানুগতিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পদ্ধতি, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিষয়গততা ও সারধর্মবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপের মাটিতে তাই জন্ম নিয়েছে অস্তিবাদ—এক জ্বলন্ত বিদ্রোহ হিসেবে। ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করে, এবং সকল রকম নিয়ন্ত্রণ-বাদের বিরোধিতা করে অস্তিবাদ বিষয়ীগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষ ও তার জগৎকে-দেখতে শেখাল। অস্তিত্ব মুখ্য, সারধর্ম গৌণ—এ চিন্তা থেকেই আসলে জন্ম নিয়েছে অস্তিবাদ। ধীরে ধীরে অবশ্য পরিস্থিতি অনুযায়ী অস্তিবাদেরও রূপ পাল্টেছে। সেজন্যই আমরা দেখি কোন কোন অস্তিবাদী আস্তিক, আবার কেউ কেউ নাস্তিক। সার্ত্র্ তো শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রথমদিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতাকে সমালোচনা করে সমাজতান্ত্রিক পূর্ণ মানুষের কথা বলেছেন। অস্তিত্ব কোন কিছুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ সব সময়ই স্বাধীন, আর এই স্বাধীনতাকে কোন অবস্থায় কোন মূল্যেই বিকিয়ে দেওয়া চলে না। আসলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের শিক্ষিত যুবসমাজ যখন সুনির্দিষ্ট কোন মূল্যবোধের অভাবে, বাস্তব দর্শনচিন্তা ও কর্মকাণ্ডের অভাবে, বিরাট শূন্যতার বেদনায় পিষ্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে বিভ্রান্ত

হয়ে জীবন কাটাচ্ছিল, তখন তারা এল অস্তিবাদের সংস্পর্শে, বিশেষ করে সার্ত্র্‌-এর অস্তিবাদের। স্বভাবতই ইউরোপের মানুষ এই ব্যবহারিক দর্শনকে স্বাগত জানিয়েছে, এবং পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। স্বীকার করতেই হবে যে, অস্তিবাদী রচনায় আছে আন্তরিকতার সুর ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রকাশ, যা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে অস্তিবাদীদের সাধুতা ও সাহসে। কিছু অসংগতি, ও আত্মবিরোধ থাকা সত্ত্বেও অস্তিবাদীরা যে-সমস্ত সমস্যাবলীর কথা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যৎ মানুষের দর্শন রচনায় অস্তিবাদের মূল্য অপরিসীম।

## সোরেন কিয়ের্কেগার্দ

**ব্যক্তি ও তাঁর সমকাল :**

অস্তিবাদের আদিগুরু কিয়েকের্গার্দ-এর জন্ম কোপেনহেগেনে, ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মে। পোশাকী নাম সোরেন আবি কিয়েকের্গার্দ। স্ক্যানডিনেভিয়ার সংস্কৃতির পীঠস্থান কোপেনহেগেনের বিত্তশালী ব্যবসায়ী মাইকেল পেডারসন কিয়েকের্-গার্দ-এর সপ্তম ও শেষ সন্তান সোরেন কিয়েকের্গার্দ। জন্মের পর থেকেই কিয়েকের্গার্দ ধর্মভীরু পিতার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন,—মানুষ হয়েছেন তাঁর প্রযত্নেই। পিতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং দ্বিধাহীন আনুগত্য পরবর্তীকালে কিয়েকের্গার্দ-এর ঈশ্বর-ভক্তির অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে, আর তার উল্লেখ করেছেন কিয়েকের্গার্দ নিজে। মাত্র অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে পাঁচ ভাই এবং মায়ের মৃত্যু কিয়েকের্গার্দ-এর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, আর তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে নিদারুণ নিঃসঙ্গ নীরবতায়। সমবয়সী কোন সাথী তার ছিল না। পিতাই ছিলেন বন্ধু, নিত্যসঙ্গী। ধর্মীয় পরিবেশেই কিয়েকের্গার্দ বড় হয়েছেন। বাহ্যতঃ তাঁর শৈশব ও কৈশোর ছিল শান্ত ও আড়ম্বরহীন। কিন্তু, কিয়েকের্গার্দ-পরিবারে, বিশেষ করে কিশোর কিয়েকের্গার্দ-এর মনে, ছিল এক গভীর বিষণ্ণতার ছাপ। তাঁর পিতার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরের কাছে তিনি অপরাধী, আর ঈশ্বরের কোপদৃষ্টির জন্যই তাঁর পরিবারের এই অবস্থা। এক ধর্মীয় অপরাধ-বোধে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকত সব সময়, অবশ্য সেই অপরাধের কথা প্রকাশ পায় নি অনেক দিন পর্যন্ত। ফলে, সাংসারিক সচ্ছলতা বজায় থাকা সত্ত্বেও নীরব হতাশায় ও গভীর বিষণ্ণতায় পিতা-পুত্র দিন কাটিয়েছেন দীর্ঘদিন। পিতার অপরাধবোধ সংক্রান্ত দৃঢ়বিশ্বাস পুত্রের মধ্যেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কিয়েকের্গার্দ তাঁর পিতার ঐ বিশ্বাসকে 'ভূমিকম্প'-এর সংগে তুলনা করে লিখেছেন, "ঐ ভূমিকম্পই আমার জগৎটাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে এবং আমার অন্তঃকরণকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে."।

স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা এবং পারিবারিক আবেগীয় উত্তাপের অভাবের মধ্যে মানুষ হলেও জ্ঞানার্জনের দিকে কিয়েকের্গার্দ-এর ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। পিতার প্রেরণায় যথার্থ অর্থেই কিয়েকের্গার্দ শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের বাড়িটি ছিল কোপেন-হেগেনের বুদ্ধিজীবীদের আড্ডাস্থল। বিশপ মিনস্টার এবং মার্টেনসেন ছিলেন নিত্যদিনের অতিথি। পিতা-পুত্র তাঁদের চারপাশে গড়ে তুলেছিলেন এক সাংস্কৃতিক আবহাওয়া। কিয়েকের্গার্দ-এর পিতা জীবনের প্রথমদিকে ছিলেন নিতান্তই গরীব। প্রচলিত অর্থে তিনি শিক্ষিত ছিলেন না। তবে, কল্পনাশক্তি, তীক্ষ্ম মেধা, এবং অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী হওয়ার জন্য তিনি ছিলেন বুদ্ধিজীবীদের প্রীতি-

ভাজন। বুদ্ধিজীবীদের সংগে পিতা-পুত্র একত্রে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন, তর্ক করতেন, নানা সমস্যা নিয়ে ভাবতেন। মাঝে মাঝে পিতা-পুত্র একে অন্যের সংগে তর্কে মেতে উঠতেন এমন ভাবে যে, মনে হতো পিতা-পুত্র নয়, দুই বুদ্ধিজীবী যেন গভীর কোন সংকট নিয়ে আলোচনারত। কিন্তু বাহ্যিক জীবন এ ভাবে কাটলেও কিয়েকে'গার্দ-এর মন ছিল সদা-অশান্ত, নীরব হতাশায় পূর্ণ; কখনও বা দিশেহারা।

কেন এই অবস্থা? কিয়েকে'গার্দ-এর লেখা থেকেই জানা যায়, "পিতা ছিলেন গণ্যমান্য একজন ব্যক্তি, যিনি গভীরভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। কিন্তু আমাদের কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার সময় একদিন অসতর্ক মুহূর্তে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তিনি জীবনে একবারই মাত্র একটি গুরুতর অপরাধ (ধর্মীয় / নৈতিক) করেছেন, আর তা হলো একটি যৌন অপরাধ। গোপনে তিনি একটি মেয়েকে বিয়ে করে তার সংগে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছেন। এটি একটি ব্যভিচার ভেবে তিনি ঈশ্বরের কাছে অপরাধী বলে মনে করতেন......।" পিতার এই অপরাধবোধ কিয়েকে'-গার্দকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, ঘটনাটি তাঁর কাছে ছিল খুবই মর্মস্তুদ। এর ফলে শুধু পিতার ওপর তিনি বিশ্বাসই হারান নি, তাঁর গোটা জীবনটাই অন্য খাতে বইতে শুরু করল। হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষণ্নতা এবং অশান্ত হৃদয় নিয়ে কিয়েকে'গার্দ জীবন কাটিয়েছেন তাঁর পিতার মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৩৮)।

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয় তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। ঐ সময় তিনি ১৬ বছরের এক সুন্দরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিবাহবন্ধনের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কোপেন-হেগেনের এক বুর্জোয়া পরিবারের ঐ মেয়েটির নাম রেজিনা ওল্‌সেন্। আশ্চর্যের বিষয়, কোন যুক্তিসংগত কারণ না দেখিয়েই কিয়েকে'গার্দ হঠাৎ চুক্তিভংগ করেন এবং রেজিনার সংগে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেন। লোকের কাছে নিজেকেই এজন্য দায়ী করার উদ্দেশ্যে ভবঘুরে ও ছন্নছাড়ার জীবনযাপন করতে লাগলেন। অন্তরের যে বিষণ্নতা ছিল তাঁর নিত্যসংগী তার সংগে রেজিনার জীবনকে তিনি জড়াতে চান নি। দায়িত্ব জ্ঞানহীন ভবঘুরে হিসেবে নিজেকে লোকের চোখে প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হলেও কিয়েকে'গার্দ রেজিনার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে রেজিনাকে ছেড়ে কিয়েকে'গার্দ এক গভীর মনোবেদনায় বার্লিনে চলে যান। আপাত-কারণহীন এই আচরণ কিয়েকে'গার্দ-এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, এবং পরবর্তী-কালে তাঁর ভাব-ভাবনার দর্পণে তা প্রতিফলিত হয়েছে। রেজিনা প্রসংগে মন্তব্য করতে গিয়ে কিয়েকে'গার্দ লিখেছেন, "আমার 'বিশ্বাস' বজায় থাকলে আমি রেজিনার সংগেই থাকতাম। 'বিষণ্নতা' কোন দিনই ছেড়ে যাবে না জানি। তাই ওর জীবনকে এর সংগে জড়িয়ে লাভ কী? ওকে বিয়ে করা আমার কপালে নেই, যদিও আমি সংসার-জীবনের সমস্ত সুখ-ভালোবাসা আন্তরিকভাবেই চেয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। আমাকে এসব ত্যাগ করতে হয়েছে। আব্রাহাম যেমন ঈশ্বরাদিষ্ট হয়ে তাঁর একমাত্র পুত্র আইজ্যাক্‌কে উৎসর্গ করেছিলেন, আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য আমিও আমার রেজিনাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম......।" অন্তরের গ্লানি এবং তীব্র এক যন্ত্রণা নিয়ে কিয়েকে'গার্দ তাই আশ্রয় খুঁজেছেন পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে। কিয়েকে'গার্দ-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, রেজিনার সংগে সম্পর্ক ছিন্ন

করার পর তাঁর কাছে দুটি পথ খোলা ছিল : "হয় বিপথগামী হওয়া, না হয় আধ্যাত্মিকতায় মগ্ন হওয়া।" তিনি দ্বিতীয় পথই বেছে নিয়েছিলেন।

কিন্তু শুধুমাত্র ঐ দ্বিতীয় পথই তিনি বেছে নেন নি ; বেছে নিয়েছিলেন আরও একটি পথ, তা হলো লেখক হওয়া। অসংখ্য লেখা তিনি লিখেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্য ওয়ার্কস্ অব লভ্, আইদার / অর্, দ্য কন্‌সেপ্ট্ অব ড্রেড, দ্য সিক্‌নেস্ আনটু ডেথ, ফিয়ার অ্যাণ্ড ট্রেম্বলিং, স্টেজেজ অন্ লাইফ্‌স্ ওয়ে, ফিলসফিক্যাল ফ্রাগমেণ্টস্, কনক্লুডিং আন্‌সায়েণ্টিফিক্ পোস্টস্ক্রিপ্ট, রিপিটিশন, দ্য প্রেজেণ্ট এজ, ক্রিশ্চিয়ান ডিসকোর্সেস, ট্রেনিং ইন্ ক্রিশ্চিয়ানিটি এবং অ্যাটাক আপন্ ক্রিশ্চেনডম্।

অধুনা যে অস্তিবাদ বিশ্বের সাহিত্য-শিল্প-দর্শনে বিস্ময়কর চাঞ্চল্য এনেছে এর মূলে কিয়েকের্গার্দ-এর অবদান অবিস্মরণীয়। অস্তিবাদী দার্শনিক চিন্তাভাবনার উদ্ভব হয় তাঁর মনেই প্রথম। যে পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত-কালে তিনি মানুষ হয়েছেন এটাও কিয়েকের্গার্দকে বোঝার জন্য বিচার্য। তাঁর দেশ তখন ইংলণ্ডের সংগে ছ'বছর ব্যাপী যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, দেশবাসী হতাশায় ভুগছে,—সব দিক থেকেই দেশ তখন দেউলিয়া। রক্ষণশীল সমাজের পীড়ন ও চাপে মানুষের নিঃশ্বাস আটকে আসছে। এমতাবস্থায় মানুষ একটা প্রতিক্রিয়া করতে চাইবেই। কিয়েকের্গার্দও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর অশান্ত পারিবারিক জীবন, নীরব নিঃসংগ শৈশব ও কৈশোর, পিতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, তৎকালীন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবনতি, যুদ্ধোত্তর সমাজের ভয়াবহ চেহারা, নৈতিক সংকট এবং সর্বোপরি তাঁর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের টানাপোড়েন, বিষণ্নতা ও অশান্ত ব্যাকুলতাই জন্ম দিয়েছে অস্তিবাদের। তাঁর সমস্ত মনন-প্রয়াস তাই কেন্দ্রীভূত হয়েছে মানব-অস্তিত্বের অন্তর্মুখীনতার রহস্য উন্মোচনে। তিনি একান্তভাবেই ছিলেন অন্তর্মুখী বোদ্ধা। তাঁর হৃদয়ের গভীরে যে ঝড়, বিষণ্নতা ও টানাপোড়েন চলছিল, বাইরে তার প্রকাশ প্রকট না হলেও লোকচক্ষুর আড়ালে তা ধীরে ধীরে তাঁর জীবনশক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে হঠাৎ-ই একদিন রাস্তায় তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং ফ্রেডারিক হাসপাতালে আনীত হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দর্শনের ইতিহাসে কিয়েকের্গার্দ এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেকদিন পর্যন্ত কোন স্বীকৃতি পায় নি। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় অস্তিবাদের জনপ্রিয়তা বাড়ার পর এবং হাইডেগার, য়্যাস্পার্স ও সার্ত্র্ প্রমুখ কীর্তিখ্যাত অস্তিবাদীরা যখন কিয়েকের্গার্দকে একজন মনীষী হিসেবে যথাযোগ্য সম্মান জানাতে দ্বিধা করলেন না, প্রকাশ্যে যখন কিয়েকের্গার্দকে স্বীকার করলেন তাঁদের পূর্বসূরী হিসেবে, বস্তুত তখন থেকেই দর্শনের ইতিহাসে কিয়েকের্গার্দকে অস্তিবাদের আদিগুরু বা জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো।

**সত্যতা প্রসংগ :**

মাত্র ৪২ বছর আয়ু নিয়ে কিয়েকের্গার্দ এসেছিলেন এই জগতে এবং দর্শনের ইতিহাসের যাঁরা মোড় ঘুরিয়েছেন সেই বিরল প্রতিভার অন্যতম হয়ে আজও তিনি অমর

হয়ে আছেন। গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে নিঃসংগ অবস্থায় অশান্ত ও বিষণ্ন এক হৃদয় নিয়ে আত্মসচেতন এই অন্তর্মুখী বোদ্ধা তাঁর জীবনের সবটুকু শক্তি নিঃশেষে নিয়োজিত করেছেন মানব-অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনে। একান্ত আন্তরিকতায় স্বমুখীন অনুভবের আলোকে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন, অস্তিবাদকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বাহ্যিক অনাড়ম্বর ও আপাত-ঘটনাহীন জীবনের আড়ালে যে তীব্র জ্বালা ও বিষণ্নতা তাঁর হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল, যে ব্যক্তিগত অনুভূতি তাঁর মানসলোক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বস্তুত সেটাই তাঁকে অস্তিবাদী দার্শনিকীকরণে প্ররোচিত করেছে। তবে, এটাই সব নয়।

কিয়েকের্গার্দ এক সময় নিজেকে নিঃসংগ বৃক্ষের সংগে তুলনা করে লিখেছিলেন, "আমার শাখায় কেবল কাঠ-ঠোকরা বাসা বেঁধেছে ..।" সমস্যা-জর্জরিত নিঃসংগ ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নিয়েই কিয়েকের্গার্দ-এর অস্তিবাদের যাত্রা শুরু,—এটাই তাঁর দর্শনের লক্ষ্য, তাঁর সত্য। কিয়েকের্গার্দ 'ব্যক্তি'র ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং উনিশ শতকের মানসিকতার প্রতি বিদ্রূপ করেছেন, যে উনিশ শতক ভাবাবেগহীন বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কিয়েকের্গার্দ বলেছেন, "প্রতিটি যুগই নীতিভ্রংশতা, শঠতা ও লাম্পট্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তবে, সম্ভবত আমাদের (অস্তিবাদীদের) যা একান্ত সম্পদ তা হলো 'ব্যক্তি'র প্রতি গভীর টান বা ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়-সুখভোগ নয়...।" অস্তিবাদের স্বরূপ তাই প্রচলিত পাশ্চাত্য দর্শনের স্বরূপ থেকে আলাদা।

এতদিন ধরে পাশ্চাত্য দর্শনে যেভাবে মানুষের ছবি আমাদের সামনে রাখা হয়েছে কিয়েকের্গার্দই প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পরবর্তী কালে তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে নীৎসে, য়্যাস্পার্স, মার্সেল, টিলিশ, বারডেয়েভ, দস্তয়েভস্কি, উনামুনো, কাফ্‌কা, সার্ত্র্‌, ক্যামু, মার্লো পঁতি, পিকাসো, রিল্‌কে, হোল্ডার্লিন, এঁরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অস্তিবাদী আন্দোলনকে আরো ছড়িয়ে দিয়েছেন।

দেকার্ত থেকে হেগেল প্রমুখ দার্শনিকরা যে পদ্ধতিতে, যে তন্ত্র বা মণ্ডলীতে ( system ) আস্থা স্থাপন করে দর্শন রচনা করেছেন, কিয়েকের্গার্দ-এর চিন্তাধারা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বুদ্ধিবাদী দর্শন ও প্রচলিত ঈশ্বরবিদ্যার তীব্র সমালোচনা করে কিয়েকের্গার্দ বলেছেন যে, সমাজ-রাষ্ট্র-গীর্জা এবং সর্বোপরি আধিবিদ্যক চিন্তা-ভাবনার হাত থেকে মানুষকে মুক্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এগুলির সংগে রক্তমাংসে গড়া মূর্ত ব্যক্তিমানুষ কখনই অবিচ্ছেদ্যরূপে একাত্ম নয়। ব্যক্তিমানুষকে এগুলির সংগে একাত্ম মনে করার মানসিকতা হেগেলীয় চিন্তাভাবনার ফল। হেগেল অস্তিত্বশীল ব্যক্তি মানুষকে সর্বগ্রাসী পরমাত্মায় বিলীন করে দিয়েছেন, তাঁর দর্শনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন। ফলে, তিনি সমস্যা-জর্জরিত ব্যক্তির আত্মগত দিককে উপেক্ষা করেছেন। পক্ষান্তরে, কিয়েকের্গার্দ বলেছেন যে, আমাদের যদি সত্যতা লাভ করতে হয়, তা হলে আমাদের ঘোষণা করতে হবে এবং মানতে হবে যে, "সত্য হলো আত্মগত বা বিষয়ীগত" এবং তা সবসময়ই ব্যক্তির অস্তিত্বের সংগে জড়িত। অস্তিত্বের আসল রহস্য নিহিত আছে মনের স্বমুখীনতায়। কিয়েকের্গার্দ-এর দার্শনিকীকরণের মূল কথাই হলো, মনকে অন্তর্মুখী করতে হবে, বহির্মুখী নয়। দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে

ব্যক্তিকে দেখলে চলবে না। অভিনেতার দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন কিয়েকের্গাদ। তাঁর মতে, ব্যক্তিমানুষের মূর্ত অস্তিত্ব বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। বিষয়গত জ্ঞান তাই আমাদের সত্যে নিয়ে যেতে পারে না। ব্যক্তির যে অস্তিত্ব তা ধরা পড়ে বেঁচে থাকার বাস্তবতার মধ্যে। কিয়েকের্গাদ-এর কাছে 'হওয়া'-টাই বড় কথা, 'জানা' নয়। 'সত্য কী'—এ প্রশ্নের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ 'কী ভাবে সত্য?'। সত্য সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান নিয়ে বসে থাকলে হবে না; সত্যকে দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস করতে হবে। সত্যকে চিন্তায় কখনও পাওয়া যায় না। সত্যকে পেতে হলে হতে হবে স্বমুখীন, একনিষ্ঠ ও ব্যাকুল। কিয়েকের্গাদ-এর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর কথায় ও কাজে কোন ফারাক ছিল না। যা বলতেন, ব্যক্তিজীবনে তা পালন করতেন। এই প্রসংগে এক সময় ক্ষোভের সংগে তিনি বলেছিলেন, "সাধারণত দেখা যায় দার্শনিকরা সুরম্য প্রাসাদ তৈরি করেন, কিন্তু নিজেরা বাস করেন কুঁড়েঘরে, অর্থাৎ যা বলেন তা ব্যক্তিগত জীবনে পালন করেন না। কারণ, চিন্তাজালপ্রসূত সেই প্রাসাদ স্বপ্নের মতোই অলীক, এতে কল্পনায় বাস করা যায়, বাস্তবে নয়…।" প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, শোপেনহাওয়ার উচ্চকণ্ঠে সার্বজনীন সহানুভূতির কথা বললেও ব্যক্তিজীবনে ছিলেন অত্যন্ত স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা। এই সব চারিত্রিক অসংগতি কিয়েকের্গাদকে অত্যন্ত ব্যথিত করত।

'সত্য বিষয়ীগত'—কিয়েকের্গাদ-এর এই উক্তি বা বক্তব্য হয়তো যুক্তিবিজ্ঞানীর মনে অসন্তোষ বা বিরক্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু কিয়েকের্গাদ-এর মতে, যুক্তিবিজ্ঞানের ফরমুলায় জীবনের ব্যাখ্যা অচল। জীবন যুক্তির চেয়ে অনেক বড়। বিচিত্র জগৎ ও জটিল জীবনের ব্যাখ্যায় বুদ্ধি অপারগ। জীবন মানেই হলো অস্তিত্ব, সংকল্পাত্মক ক্রিয়া ও মৃত্যু। এ হলো অনুভবের বিষয়, নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে চেনার বিষয়। বহির্মুখী মন নিয়ে এ সত্যের নাগাল পাওয়া যাবে না। কিয়েকের্গাদ-এর কাছে সত্য কখনও ব্যক্তিমনের সংগে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। কোন দর্শনকেই সেজন্য দার্শনিক থেকে সম্পর্কবিযুক্ত করে বোঝা যায় না। কিয়েকের্গাদ-এর কাছে ব্যক্তিসত্তা ও মনের স্বমুখীনতাই প্রথম ও শেষ কথা,—সংক্ষেপে সার কথা। সত্যের অনুসন্ধান বা আত্মোপলব্ধি স্বমুখীনতায় নিহিত। বুদ্ধি দিয়ে বিষয়গত প্রক্রিয়ায় সত্যকে যে জানা, সে জানা হৃদয় দিয়ে জানার মতো নয়। বহির্মুখী চিন্তাকে অন্তর্মুখী করার প্রয়াসে কিয়েকের্গাদ নিজেকে মহান গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের সংগে তুলনা করে তাই বলেছিলেন, "সক্রেটিসের মহান দায়িত্ব আমি পালন করছি…"।

এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, "এ যুগে আর মানুষ নেই", কারণ, মানুষ মানেই ব্যক্তিমানুষ, আর "এই যুগ ব্যক্তিমানুষকে ভুলে গেছে, তাকে নির্বাসন দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সমষ্টির ধারণায়…।" এর থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে না এলে অচিরেই মানুষ হারাবে তার একান্ত সম্পদ—তার অন্তরাত্মা। অন্তরের গভীরেই রয়েছে সত্যতা, আত্মোপলব্ধিই সত্যতা, আর সেজন্যই কিয়েকের্গাদ-এর কাছে সত্যতা বিষয়ীগত।

**হেগেলীয় ভাবধারার বিরুদ্ধাচরণ :**

আধুনিক অস্তিবাদ বলতে হেগেলের সারধর্মবাদের (**essentialism**) তথা সর্ব-

গ্রাসী পরমাত্মাবাদের বিরুদ্ধে অস্তিত্বের মূর্ততার বিদ্রোহকেই বোঝায়, আর উনিশ শতকে এই বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে যিনি বিশ্ববাসীর কাছে সরবে এই বিদ্রোহে সামিল হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি হলেন সোরেন কিয়েকের্গার্দ। এ যুগ যে ব্যক্তিমানুষকে ভুলে গেছে, দেবতার আসনে বসিয়েছে গোষ্ঠী বা সমষ্টিকে, তার মূলে রয়েছে হেগেলের প্রত্যক্ষ প্রভাব। কিয়েকের্গার্দ দুঃখ করে বলেছেন, "এ যুগে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বেড়েছে, সব কিছুকেই সে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চায়, কিন্তু সে ভুলে গেছে প্রগাঢ় ভাবাবেগ নিয়ে কী করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে..."। তাঁর অস্তিবাদ তাই মানবজীবন ও বিশ্বে মননেতর বস্তুরাজিকে বুদ্ধির প্রকারে রূপান্তরের বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। হেগেলীয় ভাববাদ ব্যক্তিমানুষকে পরমসত্তার বা নৈর্ব্যক্তিক সার্বিক বুদ্ধির অংশ মাত্রে রূপান্তরিত ক'রে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিককে, অর্থাৎ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করেছে। ভাববাদের বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তাই কিয়েকের্গার্দ-এর চিন্তাভাবনাকে (বস্তুত সমগ্র অস্তিবাদকেই) বুঝতে হবে।

প্লেটো থেকে শুরু করে সকল ভাববাদী দার্শনিকরা মানুষের ভাবসত্তা ও আত্মিক অস্তিত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন যুগ যুগ ধরে। সত্যের সন্ধান তাঁরা করেছেন তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে। পরমসত্তার আলোকে তাঁরা জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন। তাঁদের কাছে এ জগৎ 'ধারণা' ও 'আকার'-এর জগৎ। ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সত্তা এঁদের কাছে নঞর্থক। সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে এঁদের কাছে 'অস্তিত্ব' অপেক্ষা 'সারধর্ম'-এর প্রাধান্য ছিল অধিকতর। সমস্যা-জর্জরিত ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের কোন স্বীকৃতি ভাববাদে নেই—যেমন ছিল না মধ্যযুগের ইউরোপের পোপ অধ্যুষিত খ্রীস্টীয় জগতে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন মূল্য। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে খ্রীস্টীয় জগতের সর্বগ্রাসী পরমসত্তার হাত থেকে যেমন উদ্ধার পেয়েছিল ব্যক্তিমানুষ ও তার অস্তিত্ব, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তিসত্তাকে ইউরোপের নবজাগরণের সময় প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন কিয়েকের্গার্দ। তাঁর সমস্ত জীবনটাই বস্তুত ব্যক্তিসত্তাবিনাশী হেগেলীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড সংগ্রাম। কিয়েকের্গার্দ-এর যৌবনে বৌদ্ধিক জগতের বোধ হয় সবচেয়ে বড় মাপের মানুষ ছিলেন হেগেল। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত হেগেলের ভাববাদ একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল দর্শনের ক্ষেত্রে। আর ঐ ভাববাদে আমরা দেখি রক্তমাংসে গড়া ব্যক্তিমানুষ হলো পরমচিন্তার আলোকে একটি ছায়ামাত্র। ভাববাদীরা সব সময়ই আকৃষ্ট হয়েছেন অপরিবর্তনশীল, শাশ্বত ও সার্বিক সারধর্মের প্রতি। সারধর্ম সব সময়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য সামান্য ধারণা হিসেবে ভাববাদে স্বীকৃত। হেগেলের ভাববাদে 'অস্তিত্ব' শব্দটি পরিবর্তনশীলতা ও ক্ষয়িষ্ণুতাকে নির্দেশ করে বলেই ভাববাদে 'অস্তিত্ব' গৌণ স্থান পেয়েছে। হেগেল ও ভাববাদীরা তাই 'সামান্য ধারণা'-কে চেয়েছেন, তৈরি করেছেন একটি ছেদহীন যুক্তিবিজ্ঞান। তাঁরা সত্যকে দেখেছেন পরমসত্তা ও বিষয়নিষ্ঠতার মধ্যে, সবকিছুকে বিচার করেছেন ভাবনাত্মক প্রজ্ঞার আলোকে। ফলে, ভাববাদী দর্শনে অস্তিত্বশীল ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার একাত্মকরণ ঘটেছে। কিয়েকের্গার্দ অস্তিত্বশীল ব্যক্তিমানুষকে দেখতে চেয়েছেন মূর্ত জগতের পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাধীন রক্তমাংসে গড়া মানুষ হিসেবে, সমষ্টির 'অংশ'

বা 'অংশ' হিসেবে নয়। 'অস্তিত্ব' শব্দটি কিয়েকের্গার্দ এবং অন্যান্য অস্তিবাদীদের কাছে বিশেষ অর্থবহ। তাঁদের কাছে 'অস্তিত্ব' কথাটি সক্রিয়ভাবে ও স্বাধীনভাবে সংকল্প ও কর্ম করে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে জীবন যাপন করাকে নির্দেশ করে।

হেগেলের ভাববাদে আমরা দেখি দার্শনিক অনুচিন্তনই ( **Philosophical Reflection** ) মানুষের শ্রেষ্ঠ নৈতিক উৎকর্ষ, পুণ্য বা সততা। 'বর্তমান'-এর জয়গানে হেগেলীয় দর্শন মুখরিত, 'ভবিষ্যৎ'-এর জন্য কোন ভাবনা সেখানে অনুপস্থিত। ফলে, সুন্দর ও উন্নততর ভবিষ্যৎ তৈরী করার কোন আদর্শ, কোন দায়বদ্ধতা, হেগেলীয় দর্শন থেকে পাওয়া যায় না। কিয়েকের্গার্দ কিন্তু আশু ভবিষ্যতের ভাবনায় ছিলেন ভাবিত ; তাই দর্শনের কাজ তাঁর কাছে জ্ঞানের অনুসন্ধান নয়, 'কী করব ?' তার অনুসন্ধান। সমাজ ও ধর্মের অধঃপতন এবং তাতে গীর্জা ও দার্শনিকের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছেন কিয়েকের্গার্দ। উনিশ শতকের দর্শন-জগতে যে হেগেলীয় ভাববাদী স্বৈরতন্ত্র বিরাজ করছিল, কিয়েকের্গার্দ-এর 'মানুষের জন্য ধর্মযুদ্ধ' সেই ভাববাদের বিরুদ্ধেই।

হেগেলীয় ভাববাদে আমরা যে একটি সর্বব্যাপী মণ্ডলী বা তন্ত্র পাই, কিয়েকের্গার্দ মনে করেন যে, এখানেই মূল ত্রুটি নিহিত। প্রণালীবদ্ধ দর্শনের বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ। অস্তিত্বকে কখনই প্রণালীবদ্ধ করা যায় না। 'কী ভাবে বাস করব ?', 'কী করব ?'—এই যে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা, এটা হেগেলের দর্শন থেকে পাওয়া যায় না। সত্তার চরম জ্ঞান হয়তো হেগেলীয় ভাববাদ থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু অস্তিত্বশীল ব্যক্তির কাছে একমাত্র সত্তা হলো তার নিজ নৈতিক সত্তা। কী হবে বিষয়গত সত্যতার অনুসন্ধান করে ?, কী হবে প্রণালীবদ্ধ দর্শন গড়ে তুলে ?, কী হবে এমন একটি জগৎ তৈরি করে যেখানে 'আমি' বাস করি না, শুধু দর্শক হয়ে অন্যের ভাবনায় ভাবিত হই ?' আমার আমিত্বের সংগে জড়িয়ে না থাকলে সে জগতের মূল্য আমার কাছে কতটুকুই বা ? কিয়েকের্গার্দ তাই দর্শনের কাছ থেকে দাবী করেছেন ব্যবহারিক প্রজ্ঞা, পরম জ্ঞান নয়।

হেগেল সহ অন্যান্য সমস্ত প্রচলিত বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের ব্যর্থতা হলো এই যে, তাঁরা বিষয়ীগত দৃষ্টিভংগীকে উপেক্ষা করেছেন ; 'ব্যক্তির অস্তিত্ব'কেও প্রণালীবদ্ধ করে অবলোকন করার চেষ্টা করেছেন। প্রণালীবদ্ধতার বা মণ্ডলীর মাধ্যম হলো প্রত্যয় ( concept ), কিন্তু কিয়েকের্গার্দ-এর মতে, অস্তিত্বকে প্রত্যয়ে রূপান্তরিত করা যায় না। একটি প্রত্যয় একটি সম্ভাবনা মাত্র, অথবা, কাণ্টের ভাষায় বলা যায়, একটি বিধি মাত্র ; কিন্তু অস্তিত্ব যা সূচিত করে তা হলো ঐ বিধির প্রয়োগ, সম্ভাবনার বাস্তব দৃষ্টান্ত। হেগেলীয় তন্ত্রে প্রত্যয়ের যৌক্তিক বিকাশে ব্যক্তি-অস্তিত্বকে ধরার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় সত্যি, কিন্তু বস্তুত তাতে যা ধরা পড়ে তা ব্যক্তির প্রত্যয়, ব্যক্তি নয়। বিষয়ীগততা ( ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব ) যুক্তিবিজ্ঞানে ধরা পড়ে না, কেননা, তা প্রত্যয়ে রূপান্তরিত করা যায় না। হেগেলের বিশ্বন্যায়ের বিরুদ্ধে কিয়েকের্গার্দ ছিলেন প্রতিবাদমুখর।

কিয়েকের্গার্দ-এর মতানুসারে, সমস্ত অস্তিত্বই বিশেষ অস্তিত্ব। ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের সমস্যা, তার বিশেষ বিশেষ চিন্তাভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, উদাম, প্রবণতা,

এ সব কিছু কোন বুদ্ধির প্রকারে, কোন প্রণালীবদ্ধ চিন্তায়, কোন বিশ্বচেতনার আলোকে ধরা পড়ে না। কারণ, ব্যক্তি বা ব্যক্তি-অস্তিত্ব সব সময়ই অনুপম, অদ্বিতীয়। যুক্তিবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ব্যর্থতা অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। তা ছাড়া, হেগেল 'অগ্রগতি'র ধারণায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও ঐ অগ্রগতি যৌক্তিক। কিন্তু কিয়েকের্গার্দ-এর মতে, জগৎটা তো শুধুমাত্র যৌক্তিক বা যুক্তিবৈজ্ঞানিক সম্বন্ধের সমষ্টি নয়।

কিয়েকের্গার্দ-এর কাছে দর্শন মূলত জীবন-দর্শন; প্রত্যয় এবং প্রত্যয়গত জ্ঞান নিয়ে দর্শনের কারবার নয়। তাঁর মতানুসারে, অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ জ্ঞাতা হওয়া নয়, কোন ক্রিয়ার কর্তা (নৈতিক) হওয়া। 'আমরা কী ভাবে জানি এবং কী জানি!'– এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দর্শনের কাজ নয়; বরং 'আমি কী করব?'—এটার উত্তর দেওয়াই দর্শনের যথার্থ কাজ। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দর্শনকে দিতে হলে ব্যক্তিগত আশংকা, ভয়, সংকট, দায়বদ্ধতা, ইচ্ছা, উদ্বায়ু প্রভৃতি বিষয় দর্শনে আসবেই, আর তা কখনই হেগেলীয় যুক্তিবিজ্ঞানে সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে না। জ্ঞানাত্মক সত্তা এবং নৈতিক সত্তা এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করে কিয়েকের্গার্দ লিখেছেন, "জ্ঞানাত্মক সত্তার জন্য যুক্তিবিজ্ঞান উপযুক্ত, কিন্তু নৈতিক সত্তার ক্ষেত্রে যুক্তিবিজ্ঞান কোন ভূমিকাই পালন করতে পারে না…।" আসলে, হেগেলের বিরুদ্ধে (এবং পাশ্চাত্য দর্শনের এক বিরাট অংশের বিরুদ্ধেও বটে) কিয়েকের্গার্দ-এর আক্রমণের মূল লক্ষ্যই হলো প্রণালীবদ্ধতা। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, সমস্ত প্রণালীবদ্ধ দর্শন তাত্ত্বিকমাত্র। বোধ হয় সে জন্যই কিয়েকের্গার্দ হেগেলীয় তন্ত্রের সমষ্টিগত প্রকৃতির পরিবর্তে বারবারই সক্রেটিসের অ-প্রণালীবদ্ধ দর্শনের কথা বলেছেন। বিষয়গত ব্যক্তি মনোযোগাচ্ছন্ন সত্য নয়, প্রজ্ঞা; অনুচিন্তনমূলক বোধ নয়, জীবনধারণের জন্য ব্যবহারিক পথনির্দেশই, ছিল কিয়েকের্গার্দ-এর কাম্য। কিয়েকের্গার্দ-এর অভিযোগ, সক্রেটিসের পর থেকেই 'ব্যক্তি-অস্তিত্ব'-কে পাশ্চাত্ত্য দর্শন উপেক্ষা করেছে। হেগেলের দর্শনে তো তা নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে।

হেগেলের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা করলেও কিয়েকের্গার্দ কিন্তু হেগেলের প্রতি সম্মান জানাতে দ্বিধা করেন নি। হেগেলের বিরুদ্ধে তাঁর যে মূল অভিযোগ তা হলো এই যে, ব্যক্তির অস্তিত্বের যে নৈতিক সংকট রয়েছে হেগেল তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, ফলে মনোনয়ন, স্বাধীনতা, দায়িত্ব, অংগীকার, হতাশা, অপরাধবোধ, উদ্বেগ প্রভৃতি মানব-অস্তিত্বের অপরিহার্য অংগ হেগেলীয় দর্শনে কোন গুরুত্বই পায় নি। অথচ, কিয়েকের্গার্দ ব্যক্তির মনোনয়নের স্বাধীনতাকেই (freedom of choice) সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। অস্তিত্বের প্রত্যয়ের দ্বান্দ্বিকতার (dialectic of the concept of existence) পরিবর্তে কিয়েকের্গার্দ-এর আগ্রহ ছিল বাস্তব অস্তিত্বের দ্বান্দ্বিকতায় (dialectic of actual extisence)। হেগেলের ভাববাদী দ্বন্দ্ব-তত্ত্বের পরিবর্তে কিয়েকের্গার্দ আমাদের উপহার দিয়েছেন অস্তিত্ববাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব।

**খ্রীস্টধর্ম প্রসংগ:**

কিয়েকের্গার্দ-এর অস্তিত্ববাদ ধর্মের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ধর্ম বলতে এখানে খ্রীস্টধর্মকে বোঝানো হচ্ছে। আমরা জানি, ধর্মীয় পরিবেশেই ঘটেছে তাঁর লালন-পালন

ও বর্ধন। ধর্মীয় সমস্যা নিয়ে তিনি গভীর ভাবে ভাবতেন এবং সর্বদাই চেষ্টা করেছেন কী করে একজন নিষ্ঠাবান খ্রীস্টান হওয়া যায়। কিন্তু খ্রীস্টধর্মের নামে অনাচার ও ব্যভিচার, ভুল ব্যাখ্যা, ছলাকলা ও প্রতারণা তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল। সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ দেখে তিনি হতাশ হয়েছেন, মর্মপীড়া অনুভব করেছেন,—দেখেছেন কী করে ব্যক্তি সমাজ, গীর্জা, রাষ্ট্র, প্রভৃতির শিকার হচ্ছে। তাই শেষ জীবনে খ্রীস্টধর্মের এইসব অনাচার ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মতে, 'খ্রীস্টধর্ম কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি নয়', যা বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে পারে। কিয়েকের্গার্দ লিখেছেন, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ধর্মপালন, ধর্মের তত্ত্বালোচনা নয়,—বিশ্বাস, বিশ্বাসের বিষয়বস্তু নয়। কেবল বক্তৃতা করে নয়, আলোচনা যুক্তি তর্ক নয়, ব্যক্তিজীবনে ধর্মকে অভ্যাস করে বাস্তব করে তুলতে হবে। খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করা নয়; আসল সমস্যা হলো, কী করে প্রকৃত খ্রীস্টান হওয়া যায়......।" একজন একনিষ্ঠ খ্রীস্টান হিসেবে তাঁর বিশ্বাস ছিল, মনকে অন্তর্মুখী করে অন্তরের গভীরে ডুব দিতে হবে, কেননা, অন্তরের গভীরেই অর্থাৎ বিশ্বাসেই ঈশ্বরের অবস্থিতি। 'বিশ্বাস' কিয়েকের্গার্দ-এর কাছে একটি 'ভাবাবেগ' ( passion )। সেজন্যই 'বিশ্বাস' কথাটিকে একটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কিয়েকের্গার্দ মনে করতেন যে, জীবন্ত ব্যক্তির কাছে দুটি পথ খোলা আছে,—সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হয় সে ভুলে যাক্, আর না হয় সচেতন হোক্, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে। আসলে 'মানুষ' বলতে কী বোঝায় তাই সকলে ভুলে যাচ্ছে। হেগেলের মতে, দর্শনে যিনি পরম ব্রহ্ম, ধর্মে তিনিই ঈশ্বর। হেগেল সব কিছুকেই দেখেছেন পরম ব্রহ্মের আলোকে; তাই রক্তমাংসের মানুষ ছেড়ে তিনি বিমূর্ত চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'অস্তিত্ব'কে তাই তিনি ধরতে পারেন নি। অস্তিত্বকে প্রণালীবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবে, অস্তিত্বের প্রণালী সম্ভব তাঁর কাছেই যিনি অস্তিত্বের আধার। একমাত্র ঈশ্বরেরই ক্ষমতা আছে তাঁর সৃষ্টিকে প্রণালীবদ্ধ করে অবলোকন করার; 'অন্য কেউ যেন কল্পনাও না করে'। এই প্রসংগে কিয়েকের্গার্দ হেগেলকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, "হেগেল যেন এই পৃথিবীর নাট্যশালায় দর্শকের আসনে বসে অভিনয় দেখছেন ও সমালোচনা করছেন। কিন্তু মূর্খ! তিনি জানেন না যে, সেই আসন শুধু ঈশ্বরের জন্যই নির্দিষ্ট......।"

হেগেলীয় চিন্তাধারার খণ্ডন এবং প্রচলিত খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ কিয়েকের্গার্দ-এর আস্তিক অস্তিবাদের অন্যতম মৌল অস্বিষ্ট। এই দ্বৈত বিপ্লবের কাজে কিয়েকের্গার্দ ছিলেন একান্তভাবেই নিষ্ঠাবান ও সংগ্রামী; আর এজন্য তাঁর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর লুথার' নামটিও সার্থক। খ্রীস্টধর্ম প্রসংগে কিয়েকের্গার্দ বলেছেন যে, গতানুগতিক খ্রীস্টধর্মীয় চিন্তায় খ্রীস্টান হওয়ার অর্থ হলো কতকগুলি মতের সমষ্টিকে সত্য বলে গ্রহণ করা। খ্রীস্টান হওয়ার সপক্ষে, বা খ্রীস্টধর্মের যথার্থ প্রমাণ করতে গিয়ে বলা হয় যে, এই সব মত যুক্তিসংগত। যুক্তি দিয়ে খ্রীস্টধর্মের যাথার্থ প্রমাণের চেষ্টাকে কিয়েকের্গার্দ সমালোচনা করেছেন। কান্ট বলেছিলেন যে, খ্রীস্টধর্মের প্রধান মতগুলি ব্যবহারিক প্রজ্ঞার অপরিহার্য স্বীকার্য সত্য এবং নৈতিকতার ধারণার পূর্বস্বীকার্য হিসেবে স্বীকার করতেই হবে। কান্টের আগেও অনেক দার্শনিক

ও ধর্মবিজ্ঞানী খ্রীস্টধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যের যুক্তি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। যীশুর মতের যাথার্থ্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা যৌক্তিক নীতি উপস্থাপিত করে নিজেদের সন্তুষ্ট ও গর্বিত মনে করতেন। হেগেলও মনে করতেন যে, খ্রীস্টধর্মের মতগুলি সমগ্র পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ধারার যুক্তি বৈজ্ঞানিক পরিণতি। এর ফলেই জন্ম নিল এই মানসিকতা যে খ্রীস্টান হওয়ার অর্থই হলো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে খ্রীস্ট-সমাজের একজন হয়ে যাওয়া। রাষ্ট্র-গীর্জার আনুকূল্যে এই ভাবেই গড়ে উঠল প্রতিষ্ঠানিক খ্রীস্টধর্ম, আর যাজকরা হয়ে উঠলেন প্রশ্নাতীত জ্ঞানের অধিকারী।

এই প্রসংগে বিশপ মিন্স্টার এবং মার্টেনসেন-এর প্রতি কিয়েকের্গার্দ-এর মনোভাবের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশপ মিন্স্টার ২০ বছর ধরে ডেনমার্কের চার্চের প্রাইমেট্ বা ধর্মীয় প্রধান ছিলেন। তিনি কিয়েকের্গার্দ-এর পিতার বন্ধু ও শুভার্থী ছিলেন। বিশপ মিন্স্টার ছিলেন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান। কিয়েকের্গার্দ মিন্স্টারকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে বিশপ মিন্স্টারের প্রতি কিয়েকের্গার্দ বিরূপ হয়ে উঠলেন। ব্যক্তিগতভাবে সমালোচনা না করলেও তাঁর মৃত্যুর পর যখন বিশপ মার্টেনসেন্ শোকসভায় বললেন যে, বিশপ মিন্স্টার ছিলেন অন্যতম 'জ্ঞানী ও সত্যদ্রষ্টা,' তখন কিয়েকের্গার্দ-তার প্রতিবাদ করেছিলেন।

কিয়েকের্গার্দ-এর লেখা ও জীবনী থেকে জানা যায় যে, তিনি রাষ্ট্র-গীর্জার[১] বিরোধী ছিলেন। সেজন্যই তাঁর লেখায় বারবার দেখা যায় ব্যক্তিসত্তার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর কাছে 'খ্রীস্টান হওয়া' কখনই আত্ম-সন্তুষ্টি ও সুখকে নির্দেশ করে না, বরং যা নির্দেশ করে তা হলো 'কষ্টভোগ'। খ্রীস্টান হওয়ার অর্থ হলো আতংক ও অপরাধবোধ সম্পর্কিত অসুখী ভাবাবেগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। দুঃখভোগ বা কষ্টভোগ এবং পাপ সম্পর্কিত অনুভূতির দ্বারাই খ্রীস্টধর্ম যেহেতু সংজ্ঞায়িত হয়, সেহেতু খ্রীস্টধর্ম কখনই কতকগুলি মতের সমষ্টি বলে গণ্য হতে পারে না। "খ্রীস্টধর্ম কোন 'জ্ঞান' নয়, এ হলো জীবনধারা"—এই হলো কিয়েকের্গার্দ-এর অভিমত। মানুষের সংগে ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ে আমরা কখনই নিশ্চয়তা লাভ করতে পারব না। মনুষ্য-পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তায় তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। ঈশ্বরের নিশ্চয়তা বিষয়ক চেতনা এবং মনুষ্য-পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা বিষয়ক চেতনা—এ দু'য়ের টানা-পোড়েন জনিত অ-শেষ তানের ( never ending tension ) মধ্যেই মানুষ জীবন যাপন করে। বস্তুত, 'খ্রীস্টান হওয়া'র অর্থই হলো নিশ্চয়তার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও মনে 'বিশ্বাস' বজায় রাখা। মনুষ্য-পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও 'বিশ্বাস' বজায় রেখে চলা এবং 'হতাশ' না হওয়াই একজন খ্রীস্টানের প্রকৃত লক্ষণ। এ প্রসংগে স্মর্তব্য যে, কিয়েকের্গার্দ খ্রীস্টধর্মকে পাল্টাতে চান নি, চেয়েছেন খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে পাল্টাতে। কিয়েকের্গার্দ-এর মতানুসারে

১. রাষ্ট্র-গীর্জা বলতে লুথারান চার্চ অব ডেনমার্ক কে বোঝানো হচ্ছে।

মতবাদ গ্রহণ করা নয়। খ্রীস্টধর্মকে 'মতবাদ' হিসেবে গ্রহণ করলে তা হবে অবাস্তব একটি ব্যাপার। যেহেতু খ্রীস্টধর্ম একটি জীবনধারা, সেহেতু এর সারধর্ম অনুভূতিতে নিহিত। খ্রীস্টধর্মকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা আসলে একজন খ্রীস্টানকে আবেগীয় দিক থেকে শূন্যগর্ভ করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। গতানুগতিক ধর্মবিদ্যার সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিকটা হলো ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে 'যুক্তি' বা 'প্রমাণ' দেওয়ার চেষ্টা। কিয়েকের্গার্দ বলেছেন, "যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা সবচেয়ে উদ্ধত ও নির্লজ্জ ঈশ্বরনিন্দা।" খ্রীস্টধর্মকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার যে চেষ্টা কিয়েকের্গার্দ লক্ষ্য করেছিলেন, তার নিন্দা তিনি করেছেন তীব্রভাবেই। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে 'মাধ্যম' হিসেবে যীশুকে তিনি খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। যীশুর 'কথা' নয়, যীশুর 'জীবন'ই প্রকৃত খ্রীস্টানের আদর্শ হওয়া উচিত। যীশুকে কিয়েকের্গার্দ একজন মানুষ হিসেবেই দেখেছেন, ঈশ্বর হিসেবে নয়। যীশুর মৃত্যু ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত—একথা তাই তিনি স্বীকার করেন নি। মানুষের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসার জন্যই যীশু জীবন উৎসর্গ করেছেন। মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন বলেই মানুষ যখন তাঁকে হত্যা করেছিল তখন তিনি বাধা দেন নি। বাইবেল পড়ে যীশুকে বোঝা যাবে না; কোন খ্রীস্টানের সে চেষ্টা আসলে অপচেষ্টাই হবে। কিয়েকের্গার্দ এর মতে, যীশুর প্রতি স্থির চিত্তে অন্তর্মুখী হয়েই যীশুকে উপলব্ধি করা যাবে। অস্তিত্বশীল হয়েই একমাত্র খ্রীস্টধর্মকে উপস্থাপিত করা যায়। খ্রীস্টধর্ম বস্তুত অস্তিমূলক সমাযোজন (communication)—এই হলো কিয়েকের্গার্দ-এর অভিমত। প্রকৃত খ্রীস্টান হওয়া ও স্বানুভবসিদ্ধ (authentic) মানবসত্তা হওয়ার অর্থই হলো নিজেকে 'সমষ্টি' থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অন্তরের গভীরে ডুব দেওয়া, স্বমুখীন হওয়া, একটি জীবনধারার প্রতি অংগীকারবদ্ধ হওয়া।

**মানব অস্তিত্বের ( জীবনের ) বিভিন্ন স্তর :**

হেগেলের ভাববাদী দ্বান্দ্বিকতার বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমরা কিয়েকের্গার্দ-এর দর্শনে পাই অস্তিবাদী দ্বান্দ্বিকতা, আর এই অস্তিবাদী দ্বান্দ্বিকতা আলোচনা প্রসংগেই কিয়েকের্গার্দ মানব-অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা করেছেন। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বে যেমন পরস্পর-বিরোধী ধারণার বা প্রত্যয়ের সাধারণ সূত্রাকারে ব্যক্তকরণ ঘটেছে, কিয়েকের্গার্দ-এর অস্তিবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বেও তা পরিলক্ষিত হয়। কিয়েকের্গার্দ-এর দ্বন্দ্বতত্ত্ব বস্তুত 'জীবন'-এর বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী ধারণা বা প্রত্যয় এবং বিভিন্ন মূল্য বা মান-এর আলোচনা। ভাষান্তরে, জীবন ধারার বিভিন্ন প্রকার, রীতি বা স্টাইল কিয়েকের্গার্দ-এর অস্তিবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের উপজীব্য বিষয়।

মানব-অস্তিত্ব আলোচনা প্রসংগে কিয়েকের্গার্দ বলেছেন যে, জীবনের তিনটি স্তর : সংবেদন বা অনুভূতির স্তর (aesthetic stage); নৈতিক স্তর (ethical stage) এবং ধর্মীয় স্তর (Religious stage)। এই স্তরগুলির বর্ণনা আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখায় পাই, বিশেষ করে 'আইদার অর্', ও 'দ্য সিকনেস্ আনটু ডেথ' গ্রন্থে।

প্রথম স্তরের বর্ণনা করতে গিয়ে কিয়েকের্গার্দ বলেছেন যে, এই স্তরটি ইন্দ্রিয়-সুখ

এবং ভোগৈষণা দ্বারা চিহ্নিত একটি স্বল্পস্থায়ী পর্যায়মাত্র। এই স্তরে ব্যক্তি আত্মচেতন থাকে এবং ব্যক্তি তার এই স্তরের জীবনে সাধারণত গান-বাজনা বা অন্যান্য সুখদায়ক উপকরণে আসক্ত থাকে। এই স্তরকে কিয়েকের্গার্দ অ-অনুচিন্তনমূলক স্তর (unreflective stage) বলেছেন। ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়-সুখ এই স্তরের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। রুশো ও বায়রন এই স্তরের জীবনেই আসক্ত ছিলেন। এই স্তরের জীবন আত্মকেন্দ্রিক জীবন, নীতিহীন জীবন। ডন্ জোয়ান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনুভূতির স্তরে ব্যক্তি 'সুখবাদী' কিংবা 'বুদ্ধিজীবী' হতে পারে। 'বুদ্ধিজীবী' বলতে তাঁদেরই বোঝানো হয়েছে যাঁরা বিমূর্ত দর্শন চিন্তায় মগ্ন থাকেন। সুখবাদীরা 'বর্তমান' নিয়েই ব্যস্ত, 'ভবিষ্যৎ'-এর ভাবনা তাঁদের নেই। ক্ষণিকের সুখই তাঁদের কাম্য। তাঁরা ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, প্রেম-ভালোবাসা পছন্দ করেন, কিন্তু বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 'দায়িত্ব' নিতে নারাজ। কারণ, বিবাহের সংগে নীতিবোধ ও কর্তব্য জড়িত। সুখবাদী তাঁর ভালোবাসার পাত্রীকে 'অস্তিত্বশীল' না ভেবে নিজ সুখের 'নৈর্ব্যক্তিক' উৎস বলেই মনে করেন। যেহেতু সুখবাদীরা 'বর্তমান' নিয়েই ব্যস্ত, 'ভবিষ্যৎ' এর ভাবনায় তাঁরা ভাবিত নন, সেহেতু তাঁদের জীবনে ধারাবাহিকতা, শৃংখলা, ও সংহতি দেখতে পাওয়া যায় না।

অনুভূতির স্তরের যে জীবন সেখানে কোন সংযম নেই, নীতি, আত্ম-অনুশাসন, কর্তব্য ও দায়বদ্ধতাও নেই, আছে শুধু ইন্দ্রিয়ের তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টিবিধান, খেয়াল-খুশীর চরিতার্থতা। সাক্ষাৎ বা তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টিবিধানই এই স্তরের জীবনের লক্ষণ বা ধর্ম। অনুভূতির স্তর অ-অনুচিন্তনমূলক হলেও অ-বৌদ্ধিক নয় বলেই কিয়েকের্গার্দ মনে করতেন, কেননা, সংগীত, নাটক, শিল্প প্রভৃতির রসাস্বাদন ব্যক্তি এই স্তরের জীবনে করতে পারে যদি তা সাক্ষাৎভাবে তার সন্তুষ্টি বিধান করতে সমর্থ হয়।

জীবনের এই স্তরে শুধু সুখ আছে তা নয়। এই স্তরের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, হতাশা, পুনরাবৃত্তি, ব্যর্থতা, একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তি ইত্যাদিও আছে। কিয়েকের্গার্দ-এর মতানুসারে, জীবনের অনুভূতির স্তরটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কেননা, ব্যক্তি একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তি ও পুনরাবৃত্তির হাত থেকে রেহাই পায় না। জীবনের অনুভূতির স্তরটি, যা ইন্দ্রিয় সুখভোগ অথবা বিমূর্ত দর্শন চিন্তায় মগ্ন থাকে, তা অনিবার্য ভাবে মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে আসে। কিয়েকের্গার্দ-এর মতে, একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তির দুটি রূপ ঃ (১) যে-কাজে নিযুক্ত তজ্জনিত বিরক্তি এবং (২) নিজেকে নিয়ে বিরক্তি। নিজেকে নিয়ে একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তিকেই কিয়েকের্গার্দ প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, এ ধরনের বিরক্তি হলো এক অবর্ণনীয় শূন্যতা, যা জীবনের সত্যিকারের অর্থকে বিকৃত করে। এই স্তরে মানুষ ধীরে ধীরে শূন্যতার অতল গহ্বরে চলে যায় এবং তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তখন জাগে অসন্তুষ্টি ও অতৃপ্তি। হতাশা, পুনরাবৃত্তির ক্লান্তি এবং বিষণ্ণতাকে ভিন্নমুখীকরণ করতে তখন সে প্রয়াসী হয় ইন্দ্রিয়সুখভোগে লিপ্ত হয়ে। অবসাদ বা হতাশা যত বেশি হয় ততই সুখভোগে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা তীব্র হয়। ইতিহাসনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই সম্রাট নীরোর কাহিনী জানেন,—রোম নগরী যখন অগ্নিদগ্ধ হচ্ছিল, নীরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। আত্ম-অনুচিন্তন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভাবে ব্যক্তি তখন 'সমষ্টি'-তে তথা সমষ্টিগত জীবনে হারিয়ে যায়।

কিয়েকের্গার্দ বলেছেন, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জীবন হলো 'হয় অথবা নয়'-রূপ একটি সংকল্প বা মনোনয়ন। আমাদের স্বানুভবসিদ্ধ আত্মার খোঁজ করতে হলে মনোনয়নের বাস্তবতার সম্মুখীন হতেই হবে। 'অস্তিত্বশীল' হওয়ার অর্থই হলো মনোনয়ন করা, কর্ম করা, জগতের সঙ্গে 'জড়িত' হওয়া, বাস্তব জীবন ধারণ করা,—বাস্তব জগৎ থেকে সরে এসে বিমূর্ত চিন্তায় বাস করা নয়। আমাদের যে স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা তা বহিঃরাজ্যে নেই, আছে আন্তররাজ্যে। এ আত্মা জ্ঞানাত্মক আত্মা নয়, নৈতিক ক্রিয়ার কর্তা। সম্ভবতঃ সেজন্যই কিয়েকের্গার্দ বলেছেন, "স্বানুভবসিদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মনোনয়নে, সংকল্পে, স্বাধীনতায়, কর্মে ও দায়বদ্ধতায়……।"

জীবনের নৈতিক স্তরের বর্ণনা দিতে গিয়ে কিয়েকের্গার্দ 'দৃঢ়সংকল্প' এবং 'দায়িত্ব'-এর কথা বলেছেন। হেগেলের 'চিন্তার দ্বান্দ্বিকতা'-কে তিনি দূর করতে চেয়েছেন তাঁর 'মনোনয়নের দ্বান্দ্বিকতা' দিয়ে। নৈতিক স্তরে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত না থেকে সামাজিক জীব হিসেবে নিজেকে মনে করে,—সে মনে করে যে, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে তার কিছু নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এই কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তাকে মনোনয়ন করতে হয়, কোন নীতি অনুসারে চলতে হয়, আর সেখান 'মানুষ'কে বিচার করতে হয় উদ্দেশ্য হিসেবে, উপায় হিসেবে নয়। জীবনের নৈতিক স্তরে বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামাজিক-চেতনার কথা বললেও কিয়েকের্গার্দ কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে বর্জন করেন নি, কেননা, তার মতে, সামাজিক-চেতনা কখনই ব্যক্তি-সত্তাবিরোধী নয়। সমাজের সদস্য বলেই ব্যক্তির কাছ থেকে সমাজ প্রশ্নাতীত আনুগত্য আশা করতে পারে না। ব্যক্তির স্বাধীনতা নৈতিক স্তরেও বজায় থাকে। তবে, ব্যক্তি নৈতিক স্তরে যৌক্তিক নীতি অনুসারে চলে। তার এই স্তরের জীবন হয়ে ওঠে অনুচিন্তনমূলক। সে আত্ম মূল্যায়ন করে, জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চায়। আর তা করতে গিয়ে বুঝতে পারে জীবনের অনুভূতির স্তরের অসারতা। পক্ষপাতশূন্য বা নিরপেক্ষ অনুচিন্তন ব্যক্তির কাছে নৈতিক নীতিসমূহকে তুলে ধরে, যা তার জীবনকে অর্থমণ্ডিত করে। ব্যক্তির সঠিক মনোনয়ন তার স্বমুখীনতার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিয়েকের্গার্দ বলেছেন যে, ব্যক্তি যতক্ষণ নিরপেক্ষ অনুচিন্তনের স্তরে থাকে ততক্ষণ তার নিজেকে অপরাধী বা দোষী মনে হয়, কারণ, সে নৈতিকতার দাবী পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। তবে, সমাজে ভালো কাজ করে এই অপরাধবোধের মাত্রা অনেকটা কমিয়ে আনা যায়।

কিয়েকের্গার্দ-এর কাছে নৈতিক স্তরের আদর্শ মানুষ সক্রেটিস্, কেননা, 'সক্রেটিসই শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ মানুষ'। মানুষ এবং মানুষের কর্তব্যের প্রশ্নে সক্রেটিস ছিলেন সদা আগ্রহী, মানবচরিত্রের উৎকর্ষসাধনই ছিল তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। নৈতিকতাতেই সক্রেটিসের ছিল সর্বাধিক আগ্রহ; বস্তুত নৈতিক বিষয়েই তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। যা কল্যাণকর, যা ভালো, তা যেমন তিনি বলতেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তা পালনও করতেন। কিয়েকের্গার্দ জীবনের দ্বিতীয় স্তরটির আলোচনা প্রসংগে বলেছেন যে, এই স্তরটি আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি-জীবন থেকে বৃহত্তর একটি জীবনে উন্নীত হবার ইংগিত বহন করে। এই স্তরটি প্রথম স্তর অপেক্ষা উন্নত হলেও জীবনের হতাশা থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারে না।

জীবনের তৃতীয় স্তরে, অর্থাৎ ধর্মীয় স্তরে, ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি নির্বিচার অনুগত্যের মাধ্যমে আত্ম-উন্মোচনের মহত্তর উপলব্ধি লাভ করে। ধর্মীয় স্তর, কিয়েকের্গার্দ-এর মতে, অপর দুটি স্তর অপেক্ষা উন্নত। অস্তিত্বের বা মানবজীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে যেমন যথাক্রমে ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং নৈতিক মূল্য ও বিচার প্রাধান্য পায়, তেমনি ধর্মীয় স্তরে প্রাধান্য পায় 'ঈশ্বরের প্রতি ভারার্পণ'। কিয়েকের্গার্দ-এর মতে, ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যই হলো "বিশ্বাস ও অন্তর্মুখীনতা'। কিয়েকের্গার্দ বলেছেন, 'বিশ্বাস' -এর বিপরীত হলো 'পাপ' এবং 'হতাশা'-ই 'পাপ'। কিয়েকের্গার্দ-এর কাছে খৃস্টধর্ম মতবাদের সমষ্টি নয় ; এ হলো জীবনে চলার পথ, কতকগুলি মূল্য বা মানের সমষ্টি। তাই ঈশ্বরের ধারণা মনে রেখে হতাশ হওয়া এবং স্বরূপে অবস্থান না করা, অথবা, মূর্ত ব্যক্তি না হওয়ার ইচ্ছাকেই 'পাপ' বলে কিয়েকের্গার্দ অভিহিত করেছেন। আত্মনিষ্ঠ হওয়ার মাধ্যমে এবং মুক্ত হৃদয় নিয়ে অকপটে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে 'বিশ্বাস' প্রদর্শিত হয়, আর পাপ ও হতাশাকে এই বিশ্বাসের মাধ্যমেই জয় করা যায়। কিয়েকের্গার্দ-এর মতানুসারে ধর্মীয় স্তরে বিচারবুদ্ধি আমাদের সত্যতায় নিয়ে যেতে পারে না, কেননা, সত্যতা বিচারবুদ্ধির নাগালের বাইরে। ধর্মের ভিত্তি হলো আপ্তপুরুষ, শিক্ষক,—যেমন যীশু। যীশুর অস্তিত্বের সংগে সংগে ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার্য হয়ে পড়ে। ঈশ্বর-প্রেমিক কিয়েকের্গার্দ বিশ্বাস করতেন যে, যে 'শক্তি' থেকে আত্মার উৎপত্তি সে তাতেই মিলিত হয়। ঈশ্বর-ভক্তি ছাড়া ব্যক্তির কোন উপায় নেই, আর সে তা লাভ করে ধর্মীয় স্তরেই। অনন্ত, অনাদি অসীম পরমকরুণাময় ঈশ্বর কালিক জগতে যীশুখৃস্টের মাধ্যমে ব্যক্তির মুক্তি সম্ভব করে তোলেন। যীশু আসলে ঈশ্বরেরই কালিক প্রকাশ এবং তিনিই ব্যক্তিকে পাপ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে সাহায্য করেন। কিয়েকের্গার্দ লিখেছেন, "আমার জীবনের প্রতিষ্ঠা হবে আমার নিজস্ব অস্তিত্বের গভীরতম স্থির-চেতনার ওপর, যা আমাকে ঈশ্বরের সংগে যুক্ত করবে···।" ঈশ্বর-সম্পর্কিত কোন জ্ঞানী ব্যক্তির পরোক্ষ জ্ঞান কিয়েকের্গার্দ-এর কাছে খুব মূল্যবান ছিল না। তিনি মনে করতেন, ঈশ্বর ও সত্য পেতে হলে প্রয়োজন হার্দিক ব্যাকুলতা, আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও অন্তর্মুখীনতা। ঈশ্বরকে পেতে হলে মাধ্যম হিসেবে কোন ব্যক্তির জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।

কিয়েকের্গার্দের মতে, ঈশ্বরের পারমার্থিক সত্তার দ্বারা ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে দূরত্ব বোঝায় না, বোঝায় তাঁর স্বরূপ—যা অপরিবর্তনীয়, নিত্য, অবাধ ও মুক্ত। ঈশ্বরের ব্যবহারিক সত্তার দ্বারা বোঝায় ঈশ্বরের সৃষ্টিক্ষমতা এবং জীবে প্রেম ও করুণা। বোধ করি সেজন্যই কিয়েকের্গার্দ হেগেলের বিরুদ্ধাচরণ করে বলেছেন যে, পরমব্রহ্মের ধারণায় ঈশ্বর ও জীবকে হারিয়ে না ফেলে, বিশ্বচেতনার উত্তাপে সবকিছুকে গলিয়ে না ফেলে, ঈশ্বরের সংগে আমাদের যোগাযোগের সূত্রটি অনুসন্ধান ও আয়ত্ত করা উচিত। ঈশ্বরের সংগে সম্পর্কিত ব্যক্তিই কিয়েকের্গার্দ-বর্ণিত জীবনের ধর্মীয় স্তরে মুখ্য উপজীব্য বিষয়, আর কিয়েকের্গার্দ-এর ব্যক্তিজীবনের পছন্দ ছিল এই ধর্মীয় স্তরই। কিয়েকের্গার্দ নিজের জীবন দিয়ে এই তিনটি স্তর উপলব্ধি করেছিলেন, এবং এগুলিকে সাধারণভাবে মানবজীবনের বিভিন্ন স্তর হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তিমানুষ এর যে কোন একটি স্তরে জীবন

যাপন করতে পারে, অথবা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হতে পারে। আর, তা করতে হলে ব্যক্তিকেই সচেতনভাবে মনোনয়ন করতে হবে কোন্ স্তরে সে জীবন যাপন করবে। বিষয়গতভাবে জীবনের এই স্তরগুলিকে বোঝা যাবে না, বিষয়ীগতভাবে এগুলিকে উপলব্ধি করতে হবে। সেজন্যই কিয়েরকেগার্দ সারাজীবন ধরে মানুষকে বিষয়গততার অধ্যাস ( illusion of objectivity ) থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী ছিলেন। বিষয়গততা হলো এক ধরনের প্রবণতা যা মানুষের চিন্তা ও আচরণকে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, অথচ মানুষের মূর্ত জীবনকে নিয়মবদ্ধ করা যায় না। এজন্যই কিয়েরকেগার্দ বিষয়গততাকে বর্জন করে বিষয়ীগত দৃষ্টিভঙ্গী দর্শনে গ্রহণ করেছেন।

# ফ্রীদ্‌রিষ্‌ নীৎসে

**ব্যক্তি ও তাঁর সমকাল :**

অস্তিবাদের জনক কিয়েকের্গাদ-এর সংগে আস্তিকদের যেরূপ সম্বন্ধ, নীৎসের সংগে নাস্তিকদের সম্বন্ধ অনেকটা সেই ধরনের। ফরাসী সাহিত্যিক-দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্রে তাঁর 'একজিস্টেনসিয়েলিজম্‌ অ্যান্ড হিউম্যানিজম্‌' গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে বলেছেন, "সুসমঞ্জস নাস্তিক্যবাদের সংগে সংগতি রেখে একটি পূর্ণ সিদ্ধান্ত টানা ছাড়া অস্তিবাদ আর কিছু নয়।" সার্ত্রে বর্ণিত এই যে সুসমঞ্জস নাস্তিক্যবাদ, এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা দিয়েছেন সন্দেহাতীতভাবে নীৎসেই তাঁদের মধ্যে প্রথম। অস্তিবাদীদের মধ্যে যাঁরা নাস্তিক, তাঁরা নীৎসের প্রভাবে প্রভাবিত।

নীৎসের জন্মস্থান প্রাশিয়ার রোকেন শহর, জন্মকাল ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর। পিতা ছিলেন মন্ত্রী এবং রাজ-পরিবারের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, মাতা ছিলেন আচারনিষ্ঠা ধার্মিক মহিলা। প্রাশিয়ার সম্রাট ফ্রীদ্‌রিষ্‌ চতুর্থ উইলিয়মের জন্মতারিখও ছিল ১৫ই অক্টোবর। নীৎসের পিতা সেজন্যই গর্ব করে সম্রাটের নামানুসারে ছেলের নাম রেখেছিলেন ফ্রীদ্‌রিষ্‌। পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে নীৎসের একটি সরস মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : "আমার জন্মদিনটি দেশের পক্ষে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জনসাধারণ খুব জাঁকজকমের সংগেই এই দিনটি পালন করে।"

নীৎসের জন্মের কিছুকাল পরেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পাঁচ বছরের বালক নীৎসের লালন-পালন ও প্রাথমিক শিক্ষার ভার পড়ল তাঁর মাতার ওপর। সযত্নেই তিনি পুত্রকে লালন-পালন করেছেন, এবং যা উল্লেখযোগ্য তা হলো, নীৎসেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও মেয়েলীস্বভাব বিশিষ্ট করে তুলেছিলেন। ফলে, প্রতিবেশী দুরন্ত ছেলেদের, যারা পাখীর বাসা নষ্ট করত, ফুলবাগান তছনছ করত, অন্যদের বিদ্রূপে বা বিরক্ত করত, মিথ্যা কথা বলত, তাদের নীৎসে পছন্দ করতেন না। অস্তিবাদী কবি রাইনের মারিয়া রিলকে ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংগে এ বিষয়ে নীৎসের স্বভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও রিলকের মতো নীৎসের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়েছে পুরুষ ও নারীপ্রকৃতির সহবাসিতা। সংগীদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নির্জনে বাইবেল পড়ায় তাঁর ছিল প্রচুর আনন্দ। স্কুলের সহপাঠীদের অনেকেই তাঁকে সেজন্য 'যীশু' বলে ডাকত। ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত স্থানীয় জিমন্যাসিয়ামে এবং পরে ১৮৬০ পর্যন্ত ফর্‌টায় বিখ্যাত বোর্ডিং স্কুলে নীৎসে লেখাপড়া করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ঈশ্বর-অনুরাগী নীৎসে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, খ্রীস্টধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং সগর্বে ঘোষণা করেন যে, 'ঈশ্বর মৃত'। নীৎসের এই উক্তির প্রভাব আমরা

পরবর্তীকালে সার্ত্র্-এর দর্শনে ও সাহিত্যে দেখতে পাই। যে ঈশ্বরপ্রীতি নীৎসের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল এবং যা ছিল তাঁর প্রাণের ধন তা হারিয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। জীবন তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে ওঠে। বন্ ও লিপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সহপাঠীর সংগে অত্যন্ত উচ্ছৃংখলভাবে জীবন কাটাতে শুরু করেন,—সুরা ও নারীদেহের প্রতি তখন এসেছিল তীব্র আসক্তি, ধূমপানে দারুণ আগ্রহ। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল সুরা, ধূমপান ও নারীদেহে তার অনাসক্তি। মোহভংগ হলো স্বল্পকালের মধ্যেই। এখানে নীৎসের একটি সরস মন্তব্য উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না : "যারা সুরা ও ধূমপানে আসক্ত থাকে তারা সূক্ষ্ম চিন্তা ও স্পষ্ট প্রত্যক্ষে অপারগ…।"

১৮৬৫ খৃীস্টাব্দে নীৎসে দুঃখবাদী দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের 'ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উইল অ্যাণ্ড আইডিয়া' গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁর এমন ভক্ত ও অনুরাগী হয়ে পড়েন যে, কেউ কেউ নীৎসের আড়ালে মন্তব্য করেছেন যে, "একমাত্র ঈশ্বর-পাগল স্পিনোজা ছাড়া শোপেনহাওয়ারের প্রভাব থেকে কেউই নীৎসেকে মুক্ত করতে পারবেনা…।"

২৩ বছর বয়সে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে নীৎসেকে সামরিক-বিভাগে যোগ দিতে হয়। বিধবার একমাত্র পুত্র হওয়া সত্ত্বেও সরকার তাঁকে সেনাবাহিনীর কাজকর্ম থেকে মুক্তি দেন নি। পরে অবশ্য ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় সেনাবাহিনীর কাজকর্ম থেকে অব্যাহতি পান। নীৎসের সৈনিক জীবন সংক্ষিপ্ত হলেও কঠোর নিয়মশৃংখলা, সহিষ্ণুতা ও আনুগত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।

সৈনিকের জীবন থেকে এবার নীৎসে ফিরে এলেন লেখাপড়ার জগতে। যোদ্ধা হওয়ার পরিবর্তে হয়ে গেলেন বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করলেন পি· এইচ· ডি· ডিগ্রী। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই ধ্রুপদী ভাষাতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। স্কুলে ছাত্র থাকাকালীনই নীৎসে গ্রীক মনীষীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কবিতা ও সংগীতে ছিল গভীর অনুরাগ। প্লেটো ও অ্যাস্‌কাইলাস্ সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত। ইশাইয়া বার্লিন ও কার্ল পপারের মতো নীৎসেও ছিলেন ইতিহাসবাদ-বিরোধী। সমস্ত রকম অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রতিবাদমুখর। সমস্ত রকম ভ্রান্তি ও অধ্যাসের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করার প্রয়াসে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। বুর্জোয়াদের যেমন তিনি সমালোচনা করেছেন, তেমনি বুদ্ধিজীবীদেরও সমালোচনা করেছেন। 'বুদ্ধিজীবী' বলতে তিনি শুধুমাত্র পেশাগত দার্শনিকদেরই বোঝান নি, তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদেরও বুঝিয়েছেন।

বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নীৎসের কাজ করার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা ছিল বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ-দার্শনিক রিচার্ড ভাগ্‌নারের প্রীতিপূর্ণ সাহচর্য ও বন্ধুত্বলাভ। লিপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীনই নীৎসে ভাগ্‌নারের সান্নিধ্যে আসেন। ভাগ্‌নারের প্রশংসায় তিনি ছিলেন উচ্ছ্বসিত। নীৎসের রচনায় ভাগ্‌নারের প্রভাব সুস্পষ্টরূপেই প্রতিফলিত। এমন কি, তাঁর পত্রাবলীতেও

রয়েছে ভাগ্নারের অকুণ্ঠ প্রশংসা। ব্রাণ্ডিস্-কে লেখা এক চিঠিতে নীৎসে একসময় লিখেছিলেন, "……সংগীত ছাড়া মানবজীবন ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়…।" ১৮৭২-এ প্রকাশিত নীৎসের রচনা 'দ্য বার্থ' অব্ ট্রাজেডি ফ্রম্ দ্য স্পিরিট অব্ মিউজিক্' ভাগ্নারের প্রশস্তিতে পূর্ণ। ভাগ্নার-কে তিনি 'আধুনিক অ্যাস্কাইলাস্' বলে চিহ্নিত করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই উক্ত গ্রন্থটি ভাগ্নারের আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হয় নি। কিন্তু তরুণ বুদ্ধিজীবী মলেনডরফ্ গ্রন্থটির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এর ফলে জার্মান জনমানসে নীৎসের ভাবমূর্তি সাময়িকভাবে কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তা সত্ত্বেও একজন মনোবিজ্ঞানী, নীতিবিজ্ঞানী ও দার্শনিক হিসেবে নীৎসে নিঃসন্দেহে প্রথম সারির একজন।

নীৎসের চিন্তাধারা আলোচনা প্রসংগে উইল ডুরাণ্ট একসময় বলেছিলেন, "নীৎসে হলেন ডারউইনের সন্তান এবং বিসমার্কের ভ্রাতা…।" নীৎসের চিন্তাধারায় বিবর্তন-বাদের প্রতি প্রকট পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। যোগ্যতমেরই বাঁচার অধিকার আছে—এই তত্ত্বে নীৎসেও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শক্তিমানরাই যোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও নীৎসে ডারউইনের সংগে তাঁর মত পার্থক্যের কথা স্বার্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কাণ্ট যে রকম হিউমের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেও হিউমের সমালোচনা করেছেন, নীৎসেও তেমনি ডারউইনের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর বিরোধিতা করেছেন। কাণ্টের কাছে হিউম যেমন ছিলেন 'প্রিয় শত্রু', নীৎসের কাছে ডারউইনও ছিলেন অনেকটা সেইরকমের। ডারউইন বিবর্তনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি তাঁর বিবর্তনতত্ত্বে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বা 'যোগ্য-তমের বাঁচার অধিকার'-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু নীৎসের মতানুসারে, প্রকৃতিকে আমরা সাহায্য না করলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সাফল্য লাভের সংগত কোন হেতু নেই। ডারউইন অহেতুক 'পরিবেশ'-কে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে নীৎসের অভিমত। তাঁর মতে, নতুন নতুন আকার বা গঠন তৈরি হয় আন্তরশক্তির ফলেই, যা পরিবেশকে কাজে লাগায়। জড়বাদ ও যান্ত্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে নীৎসে ছিলেন প্রতিবাদমুখর। বিবর্তন প্রক্রিয়ার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিবর্তনবাদ 'আকস্মিকতা'-র ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে বলে নীৎসে অভিযোগ করেছেন। তাঁর মতানুসারে, জগতে যে সংগঠন, শৃংখলা, ও সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় তা আকস্মিকতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

জীবন যুদ্ধে যদি শক্তিমানেরই একমাত্র বাঁচার অধিকার থাকে, তাহলে 'শক্তি'ই আসল গুণ ও কাম্য, আর দুর্বলতা বর্জনীয়। এই সিদ্ধান্তকে ইংলিস ডারউইন-বাদীদের মধ্যযুগীয় ভিক্টোরিয়ান ভীরুতা এবং জার্মান সমাজবাদী ও ফরাসী দৃষ্টবাদীদের বুর্জোয়া ভব্যতা স্বাগত জানাতে পারে নি। খ্রীস্ট ধর্মবিজ্ঞানকে বাতিল করার সাহস হয়তো তাঁদের ছিল, কিন্তু যুক্তিবাদী হওয়ায় স্পর্ধা তাঁদের ছিল না। তাঁরা তথাকথিত নৈতিক প্রত্যয়গুলিকে, পরার্থবাদকে এবং অসহায়তাকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। তারা অ্যাংলিকান, ক্যাথলিক বা লুথারিয়ান না হয়ে থাকতে হয়তো পারেন, কিন্তু খ্রীস্টান না হয়ে থাকা তাঁদের কাছে অসম্ভব—এটাই ছিল নীৎসের বিশ্বাস। নীৎসের মতানুসারে, খ্রীস্টধর্ম মানবজীবনের পরিপন্থী, কেননা, এর

মূলে রয়েছে প্রেম, ভালোবাসা, দয়া, করুণা ও সহানুভূতি। কিন্তু জীবনযুদ্ধে যা প্রয়োজন তা হলো শক্তি, গর্ব ও বুদ্ধি। আসলে, জার্মান-ঐক্যের স্রষ্টা লৌহমানব বিসমার্কের আদর্শ নীৎসের মনে মন্ত্রের মতোই অনুরণিত হয়েছিল। নতুন জার্মানীর ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি ও শৌর্য এবং শিল্প-প্রসার সম্পর্কিত প্রচেষ্টার একজন প্রবক্তা ও প্রচারকের প্রয়োজন ছিলো, যুদ্ধজাত বিরোধের মীমাংসার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি দর্শনেরও। খ্রীস্টধর্ম সে কাজে একেবারেই অক্ষম। ডারউইনবাদ কিছুটা সক্ষম। প্রয়োজন ছিল আর একটু স্পর্ধা ও সাহসের। নীৎসের মধ্যে দুই-ই পাওয়া গিয়েছিল।

ইউরোপীয় ঐতিহ্যের এবং মানুষের নানাবিধ তীব্র সংকট ও সমস্যাবলী নিয়ে নীৎসে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন, দিনের পর দিন কাটিয়েছেন উদ্বেগ নিয়ে। অন্যান্য অস্তিত্ববাদীদের মতো নীৎসেও মনে করতেন যে, আমরা আমাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন সংকটের সম্মুখীন হই। সংকট এড়িয়ে গিয়ে যথার্থ মানব জীবন যাপন করা যায় না।

১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬—এই সময়ের মধ্যে নীৎসে চারটি রচনা প্রকাশ করেন এবং সম্মিলিত ঐ রচনা চতুষ্টয়ের ইংরেজি নাম দেওয়া হয় 'থট্স আউট অব্ সীজন'। প্রথম রচনাটিতে তিনি জার্মান সংস্কৃতির প্রতিভূ ডেভিড স্ট্রাউসের সমালোচনা করেছেন। দ্বিতীয়টিতে প্রচলিত সংস্কৃতির প্রতিকল্প হিসেবে ইতিহাসগত শিক্ষণের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত অনুরাগকে তিনি আক্রমণ করেছেন। তৃতীয় রচনাটিতে শিক্ষাবিদ হিসেবে শোপেনহাওয়ারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং চতুর্থ রচনাটিতে তিনি ভাগ্‌নারের গুণকীর্তন করছেন।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে চতুর্থ রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে নীৎসে ও ভাগ্‌নার পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন,—মানসিক ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। যে দুর্মর প্রীতির বন্ধন উভয়ের মধ্যে ছিল তা শিথিল হয়ে এলো। নীৎসে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভাগ্‌নার নিজ মতবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১৮৭৯ সালে অসন্তুষ্টি, বিরক্তি এবং ভগ্নস্বাস্থ্য নীৎসেকে বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। পরবর্তী দশ বছর তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর রচনার অনেকগুলিই সেই সময় লিখিত। সংক্ষেপে, দর্শন জগতে বিচরণ, সংগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ—এই ছিল নীৎসের তখনকার অবস্থা।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সাহায্যকারী দূরদৃষ্টির সাহায্যে নীৎসে বুঝতে পেরেছিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ তার অনন্যতা ও অভিন্নতা হারানোর বেদনা সহ্য করতে পারবে না, অসহায় দিশেহারা অবস্থায় তাকে দিন কাটাতে হবে। যে হতাশার সুর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিউম্যান, অল্-টু-হিউম্যান' এ পাওয়া যায়, তা এ জগতের মানুষের সংকটাবস্থার উপলব্ধিরই প্রতিফলন। তবে, মানুষের অসহনীয় ও অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় নীৎসে খুঁজে বেড়িয়েছেন, চুপ করে থাকেন নি। তাঁর অত্যুজ্জ্বল মনীষা ও তীক্ষ্ণ মেধা নিয়ে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন। বহুদর্শী চিন্তাবিদ হিসেবে শুধু বাইরে থেকে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেন নি, অন্তরের

গভীরতম স্থান থেকে উৎসারিত হয়েছে তাঁর প্রেরণা। অন্তর্মুখী একজন বোদ্ধা হিসেবে নীৎসে তাঁর চিন্তাধারাকে বৈপ্লবিক বলে চিহ্নিত করে 'ডিনামাইট'-এর সংগে তুলনা করেছেন।

নীৎসের বুদ্ধির সন্দীপ্ত ও ক্রমবর্ধমান মনোবেদনা তাঁকে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। শোপেনহাওয়ারের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হলেও নীৎসে শোপেনহাওয়ারের মতো জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'না' বলেন নি। শাশ্বত পুনরাবর্তন তত্ত্বের প্রচার করে নীৎসে শোপেনহাওয়ারের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে এসেছিলেন। শাশ্বত পুনরাবর্তন তত্ত্বানুসারে জীবনের প্রতিটি দুঃখকষ্ট, হাসিকান্না, উদ্বেগ, মনস্তাপ প্রভৃতি চক্রাকারে বারবার ঘুরে আসে। এর গতি সরলরেখার মতো একমুখী নয়, এর গতি চক্রাকার। বিশ্বের চক্রাকার গতিতে যে বিশ্বাস করে না একমাত্র সেই ব্যক্তিই স্বেচ্ছাচারী ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে বাধ্য, এই হলো নীৎসের সিদ্ধান্ত। শাশ্বত পুনরাবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে নীৎসে আসলে জীবনেরই জয়গান করেছেন। শোপেনহাওয়ারের মন্ত্রশিষ্য হয়ে জীবনকে দুঃখময় বলে বর্ণনা করলেও শেষপর্যন্ত নীৎসে সৃজনশীল মনীষার দ্বারা এই অবস্থার যে পরিবর্তন করা যায় তাতে বিশ্বাস করেছেন। মানুষের সম্ভাবনার ক্রমাগ্রগতিতে তিনি ছিলেন আস্থাবান। একদিন অতিমানবের আবির্ভাবে বিশ্বের মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে—এটা ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা। শক্তি-ই জীবনের মূল উৎস, শক্তির স্ফুরণই জীবনের লক্ষ্য। শক্তির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ আরো শক্তিশালী হবে এবং পৃথিবীতে একদিন অতিমানবের আবির্ভাব ঘটবে। অতিমানব তাঁরাই হবেন যাঁরা আন্তরশক্তিতে শক্তিমান। যান্ত্রিক সভ্যতার নানাবিধ সংকট এবং অধ্যাত্মবাদের মোহ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র শক্তি-ই, আর নীৎসীয় অতিমানব হলো আসলে ঐ শক্তিরই ব্যক্তিরূপ।

নীৎসের মধ্যে ছিল এক বিদ্রোহী সত্তা। যান্ত্রিকতাবাদ, নিয়ন্ত্রণবাদ, ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামী, ও বিষয়গততা, এ সবের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। জীবনকে তিনি বড় করে দেখেছেন এবং বলেছেন, জ্ঞান জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, জীবনই সবকিছুর ওপরে। আক্ষেপ করে তিনি একসময় বলেছিলেন, "উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বিরাজ করছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাধান্য, বিষয়গততার ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ; ফলে অচিরেই পৃথিবীতে দেখা দেবে নতুন ধরনের বর্বরোচিত আচরণ। অবশ্য আধুনিক জীবনধারার এই রীতি পাল্টাবে অতিমানবের আবির্ভাবে"।

উনিশ শতকের সমাজে আমরা একদিকে দেখি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি এবং মানুষের চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ ; কিন্তু অন্যদিকে দেখি যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে পিষ্ট মানুষের উদ্বেগজনক ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারা। মানুষের এই ছবি নীৎসের কাছে ছিল পীড়াদায়ক। তাঁর চিন্তার গভীরতা ও তীব্রতা এবং বিবর্ধমান উদ্বেগ ও বিদ্রোহী মনোভাব স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। উপরন্তু, তাঁর উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রজীবন তাঁর রক্তে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যৌনরোগের বীজাণু, যা পরবর্তীকালে সিফিলিস রোগের আকারে

আত্মপ্রকাশ করে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায়। একাকিত্ব, অনিদ্রা, ভগ্নস্বাস্থ্য, উদ্বেগ এবং সংগ্রামের তীব্র বাসনা তাঁকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁকে বাসেলের চিকিৎসালয়ে ভর্তি করা হয়। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর নীৎসে নোমবুর্গ-এ তাঁর মায়ের কাছে চলে আসেন। মায়ের মৃত্যুর পর আশ্রয় নেন ভাইমার-এ তাঁর বোনের বাড়ীতে। আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শোনা যায়, মানসিক রোগ থেকে তিনি কখনই সম্পূর্ণ মুক্ত হন নি। ইতিমধ্যে নীৎসে তাঁর রচনাসম্ভারের জন্য জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য তিনি তাঁর যশ ও প্রতিষ্ঠার কথা বুঝতেই পারেন নি। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে আগস্ট নীৎসে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

এতো বৈপরীত্য, এতো বিদ্যুৎবেগ, এতো যশ-অপযশের কাহিনী, এতো অত্যদ্ভুৎ বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ নীৎসের চরিত্রে আছে যার তুলনা হয় না। আবেগময়তার অপ্রতিহত প্রাধান্য, প্রচলিত ঐতিহ্য ও মূল্য-বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সৃষ্টিধর্মী স্বাধীনতার ঐকান্তিক মূল্যায়ন নীৎসের দার্শনিক নিরীক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত রীতিনিয়মের অতীত দুর্বার মানসশক্তি যার স্বধর্ম, তার জ্বালাময় অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেই নিহিত থাকে আত্মবিনাশের উপকরণ। নীৎসের অসাধারণ মনীষা এবং অপ্রচলিত নীতিবোধ কখনই তাঁকে স্থিরচিত্তে দুদণ্ড বিশ্রাম নিতে দেয় নি। তাঁর মনীষা ও প্রতিভার জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক—প্রাণটাই চলে গেল অকালে। এমন হতভাগ্য করুণ জীবনের দৃষ্টান্ত দর্শনের ইতিহাসে বিরল।

**নীৎসের নীতিদর্শন ঃ**

অস্তিবাদের আদিগুরু কিয়েকের্গার্দ এবং জার্মান অস্তিবাদের পুরোধা নীৎসে উভয়কেই দর্শনের ইতিহাসে অস্তিবাদের নৈতিক পূর্বসূরী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উভয়ের নীতিদর্শন 'সত্য' সম্পর্কিত তাঁদের মতবাদ থেকেই উদ্ভূত। কিয়েকের্গার্দ-এর মতো নীৎসেও মনে করতেন যে, বিষয়গততাই জ্ঞানের প্রধান শত্রু। তাঁর মতানুসারে সত্য সদাই বিষয়ীগত। জগৎ-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করার জন্য যে-সব প্রত্যয় আমরা ব্যবহার করি, সেগুলি আমরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে মনোনয়ন করি এবং আরোপ করি। জগৎ সম্পর্কে কী ধারণা বা প্রত্যয় আমরা গ্রহণ করব তা আমাদের স্বাধীন মনোনয়নের ওপরই নির্ভর করে। মানব-আচরণের সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় তার স্বাধীন ইচ্ছা ও মনোনয়নের প্রকাশ। স্বাধীন মানুষের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নীৎসের দর্শনেই প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

জগতের সংগে মানুষের যে সম্পর্ক তা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে গিয়ে নীৎসে বলেছেন, সম্পূর্ণ বিষয়গত জ্ঞান বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। ঘটনার আপাত বিষয়গত ও বৈজ্ঞানিক বর্ণনার ক্ষেত্রেও মনোনয়নের উপাদান থেকেই যায়। সম্পূর্ণ বিষয়গত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করা যে অসম্ভব, সাধারণ লোক তা মানতেই চায় না, অথচ এটাই বাস্তব, এটাই সত্য। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চরম বিষয়গত সত্য বলে কিছু নেই। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমরা যখন বৈজ্ঞানিক

ব্যাখ্যা দিই, যখন আমরা প্রত্যয় নির্বাচন করে তা ব্যবহার করি, শেষ পর্যন্ত তা কিন্তু আমাদেরই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনাতেও মূল্যায়ন এসে পড়ে এবং তা নির্ভর করে আমাদেরই পছন্দ-অপছন্দের ওপর, ইষ্ট-অনিষ্টের চিন্তার ওপর। কাজেই নীৎসের কাছে চরম বিষয়গত সত্য ভ্রম। সমস্ত সত্যই আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। নীৎসে বলেছেন, "সম্পূর্ণ বিষয়গত জ্ঞানান্বেষণের ক্রমবর্ধমান বাসনার মধ্যেই নিহিত থাকে মানুষের আত্মধ্বংসের বীজাংকুর··· ।"

আমাদের মানস-জীবনের যে তিনটি দিক—চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা, আছে তার মধ্যে ইচ্ছা-কেই নীৎসে প্রাধান্য দিয়েছেন। নীৎসের মতে, ইচ্ছা কোন বিশেষ শক্তি মাত্র নয়। ইচ্ছা বলতে তিনি গোটা মানুষকেই বুঝিয়েছেন। ইচ্ছা ছাড়া মানুষকে 'মানুষ' আখ্যা দেওয়া যায় না। ইচ্ছা আছে বলেই তো মানুষ অসংগত পরিবেশকে পাল্টাতে চায়, জগতের পরিবর্তন ঘটাতে আগ্রহী হয়, স্বাধীন ভাবে মনোনয়ন করে। প্রভুত্ব করার ইচ্ছা আর বাঁচার ইচ্ছা নীৎসের কাছে সমার্থক। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা, কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, জগতের ওপর প্রভুত্ব করার ইচ্ছা মানুষের স্বভাবগত। নীৎসের কাছে জ্ঞান ও কর্ম দুটি স্বতন্ত্র নয়, বরং বলা চলে, ইচ্ছা-ক্রিয়ার দুটি দিক মাত্র। আমাদের সমগ্র জীবনটাই—জ্ঞানাত্মক, নৈতিক, ব্যবহারিক এবং সৃজনমূলক—আমাদের ইচ্ছার বিষয়। ইচ্ছা হলো বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত করার শক্তি। আমাদের জ্ঞানাত্মক হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি (cognitive tools) প্রভুত্ব-অভিমুখী বা আধিপত্য-অভিমুখী। এই যে প্রভুত্ব করার ইচ্ছা বা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা তা একান্তই ব্যবহারিক, এবং তা থেকে জগৎ-সম্পর্কিত বর্ণনা ও শ্রেণীকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বা সংকল্পই শুধু জন্ম নেয় না, জন্ম নেয় আচরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও।

নীৎসে মনে করতেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন চরম বিষয়গত সত্য নেই, তেমনি নৈতিকতার ক্ষেত্রেও কোনো চরম সত্য নেই। নীৎসের নীতিদর্শনের বৈপ্লবিক ঘোষণা হলো, নৈতিকতার ক্ষেত্রে স্থিরীকৃত সার্বিক কোন চরম মূল্য নেই। নীতিবিদ্‌দের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, তাঁরা সার্বিকতার ওপর ভিত্তি করে নৈতিক রীতিনীতি প্রণয়ন করেন, ফলে নৈতিক উৎকর্ষের যথার্থ অর্থ ও তাৎপর্য বিকৃত হয়, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে দেখা দেয় বিভ্রান্তি ও সংশয়। আসলে সার্বিক ও চিরন্তন নৈতিক নীতি বলে কিছু নেই। যুগভেদে, স্থান-কালভেদে সমস্ত নৈতিক নীতিই পাল্টায়। কোন নৈতিক রীতিনীতিই সম্পূর্ণ বিষয়গততা দাবী করতে পারে না। এর থেকে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, নীৎসের নীতিদর্শন নৈতিক প্রকৃতিবাদের বিরোধী। নৈতিক প্রকৃতিবাদ অনুসারে, নৈতিক মূল্য বা মান জগতের প্রত্যক্ষলব্ধ বৈশিষ্ট্য থেকে গৃহীত, যা প্রতিটি মানুষ একইভাবে অনুসরণ করে। কিন্তু নীৎসের অভিমত হলো, নৈতিক মূল্য বা মান স্থিরীকৃত নয়, অনড় নয়, 'আবিষ্কার'-এর জন্য প্রদত্ত নয়। বস্তুতে মূল্য বা মান সবসময়ই বিশেষ বিশেষ মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়। মানুষ নিজেই নৈতিক মূল্য মনোনয়ন বা নির্বাচন করে নেয়। অন্যভাবে বলা যায়, নীৎসের মতানুসারে সার্বিক কোন নীতিবিজ্ঞান

নেই। নীতিবিজ্ঞানীদের কাজ হলো মানদণ্ড 'তৈরি' করা, 'আবিষ্কার' করা নয়। ব্যাখ্যার (interpretation) কাছে জগৎ সদাই উন্মুক্ত, মূল্য ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়, আমরা যেমন খুশি সেগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারি।

কোন কোন সমালোচক নীৎসে-কে নিহিলিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু 'নিহিলিজম' শব্দটি নীৎসে কী অর্থে ব্যবহার করেছেন তা জানা প্রয়োজন। 'নিহিলিজম' বলতে নীৎসে বুঝেছেন বা বুঝিয়েছেন 'মিথ্যা বিশ্বাস বা ধারণার প্রতি আনুগত্য'। এই অর্থে তথাকথিত নীতিবিদ্, বৈজ্ঞানিক, ধর্মবিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ্‌রাই নিহিলিজম্ প্রচারের জন্য দায়ী বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতানুসারে, ধর্ম, বিজ্ঞান, নৈতিকতা সবই মনুষ্যসৃষ্টি, অথচ স্রষ্টাই আজ সৃষ্ট জগতের দ্বারা বন্ধ। সৃষ্ট বস্তু আজ প্রভুত্ব করছে স্রষ্টার ওপর। স্রষ্টা আজ দাস। মানবসত্তার এই অবনতি নীৎসের কাছে ছিল অসহ্য। মানুষকে তার স্বস্থানে বসাতেই হবে ; তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, সব কিছুর কর্তা সে নিজে, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীনতার সম্যক উপলব্ধিই মানুষকে নিজ আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে, এই ছিল নীৎসের দৃঢ়বিশ্বাস। এতেই রয়েছে নিহিলিজম্ থেকে মুক্তির উপায়। প্রচলিত অর্থে তাই নীৎসে-কে নিহিলিস্ট বলা যায় কিনা তা বিচার্য।

প্রচলিত নৈতিকতার বিরুদ্ধে নীৎসের কণ্ঠ ছিল প্রতিবাদমুখর। ধর্মীয় যাজক, পুরোহিত ও নীতিবাগিশদের মিথ্যা আচরণ, ভণ্ডামী এবং বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। পুরোহিতরা আমাদের বর্তমান জীবনকে উপেক্ষা করে পরবর্তী জীবনের প্রতি আগ্রহ দেখানোর জন্য উপদেশ দেন, নীতিবিদ্‌রা যা বলেন ব্যক্তিজীবনে তা পালন করেন না। এক কথায় তাঁরা লোক ঠকান। তাঁরা প্রচার করেন আত্মত্যাগের বাণী। কিন্তু নীৎসের মতানুসারে, আত্মত্যাগ আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর, দুর্বলের আশ্রয়স্থল। যারা শক্তিমান তারা এ জীবনকে, জীবন ও জগতের সৌন্দর্যকে উপভোগ করার চেষ্টা করে। জীবনকে তারা উপেক্ষা করে না, অস্বীকারের তো প্রশ্নই নেই। নৈতিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে নীৎসে তাই 'শক্তি'-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং দয়া, করুণা, দান, প্রেম, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর প্রভৃতি খ্রীস্টীয় নৈতিক ধারণাগুলিকে দুর্বলের আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য করেছেন।

নীৎসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শক্তির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ আরো শক্তিশালী হবে, নতুন নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করবে এবং এভাবেই শক্তির অনুশীলনের ফলে একদিন পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটবে অতিমানবের। এই অতি-মানবই হবে মানুষের আদর্শ। তিনিই হবেন জগতের পূর্ণ মানুষ। বিশ্বমানবের সর্বাংগীন কল্যাণের জন্য অতিমানবের শক্তির প্রয়োজন আছে। নৈতিকতা দয়ায় নিহিত নেই, আছে শক্তিতে। শক্তি অর্জন করেই বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধন করতে হবে। শক্তি সমস্ত ন্যায়-নীতি, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদির ঊর্ধ্বে। নীৎসের মতে দুষ্ট লোকেরা সমাজের যত না অপকার করে, তথাকথিত নীতিবিদ্‌রা করেন তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রেম দ্বারা মানবজাতিকে একসূত্রে বাঁধার কথা নীৎসে

কখনও কল্পনা করেন নি ; বরং তার বক্তব্য হলো, প্রেমের মহিমাকীর্তন করা কাপুরুষ-তার লক্ষণ। এ প্রসংগে স্মর্তব্য, নীৎসে যে শক্তির কথা বলেছেন তা পশুশক্তি নয়। আধিপত্য বা প্রভুত্ব করার যে ইচ্ছা তাতে থাকবে আত্মসংযম। অতিমানব তাঁরাই হবেন যাঁরা আন্তরশক্তিতে হবেন শক্তিমান।

কাণ্টের সংগে নীৎসে একমত ছিলেন যে, নৈতিকতা অপরিহার্যভাবে নিয়মের (Law) ব্যাপার। কিন্তু কাণ্টের মতো তিনি সার্বিক কোন নৈতিক নিয়ম মানেন নি, কেননা, তাঁর কাছে সার্বিক নীতিবিজ্ঞান সমর্থনযোগ্য নয়। বিষয়ীগত নৈতিকতায় তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই প্রচলিত কোন নৈতিক নিয়মের পরিবর্তে অন্য কোন নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করতে পারে ! সে স্বাধীন। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে ব্যক্তি যা খুশি তাই করতে পারে। স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈতিকতা নীৎসের কাছে অভিন্ন নয়।

নীৎসের ভাবনার দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে চিন্তা বা বুদ্ধির তুলনায় সহজাত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার প্রাধান্য, সমাজের তুলনায় ব্যক্তির প্রাধান্য, ক্লাসিক টাইপের (অ্যাপলনিয়ান) তুলনায় রোমাণ্টিক টাইপের (ডায়োনিসিয়ান) প্রাধান্য। এই মানুষটি সম্পর্কে ভাগনার একসময় তাঁর ( নীৎসের ) বড় ভাই-কে লিখেছিলেন : "আপনার ভাই একজন অত্যন্ত অস্বস্তিকর মানুষ"। ভারসাম্য মনের শান্ত ভাব ও ঋষিসুলভ পবিত্রতা কোনদিনই নীৎসের ছিল না, অথচ সগর্বে একসময় তিনি বলেছিলেন, "আমি মানুষকে আবার ফিরিয়ে দেব তার ঋষিসুলভ পবিত্রতা, যা সমস্ত নৈতিকতা ও সংস্কৃতির প্রধান শর্ত··· ।"

নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে নীৎসে ছিলেন ইউরোপীয় মানবসমাজের সংকটের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতায় ছিল তাঁর গভীর আস্থা। শোপেনহাওয়ারের প্রভাবাধীন থাকা সত্ত্বেও জীবনকে গ্রহণ করার সাহস ছিল তাঁর। জীবনের ইতিবাচক দিককে তিনি উপেক্ষা করেন নি। পারস্যের দার্শনিক জরাথুস্ট্রকেই তিনি প্রথম নীতিবাদী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আর সেজন্যই তিনি জরাথুস্ট্রকে তাঁর মুখপাত্র হিসেবে বেছে নিয়ে রচনা করেছেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'দাস্ স্পেক্ জরাথুস্ট্র'। জুডাইক্-ক্রিশিয়ান নৈতিকতা জীবনকে অস্বীকার করে, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে বলে নীৎসে এর সমালোচনা করে তাঁর নিজ বক্তব্য বিশ্ববাসীর কাছে পেঁাছে দিয়েছেন জরাথুস্ট্রের মুখ দিয়ে। প্রচলিত মূল্যবোধ ও অন্তঃসারশূন্য নৈতিকতার বিরুদ্ধাচরণ করে জীবনের মূল্য প্রতিষ্ঠায় নীৎসের অবদান সাহসের পরিচয় বহন করে নিঃসন্দেহে।

# কার্ল য়্যাস্পার্স

**জীবন ও দর্শন ঃ**

অস্তিবাদের ইতিহাসে কার্ল য়্যাস্পার্স একজন জার্মান প্রটেস্টেণ্ট এবং আস্তিক্যবাদের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত। জার্মান অস্তিবাদের ব্যাখ্যাকার হিসেবে মার্টিন হাইডেগারের পরই তাঁর স্থান। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম। লেখাপড়া করেছেন ওলডেনবার্গের হিউম্যানিটিজ জিমনাসিয়ামে। পরে আইন পড়েছেন হাইডেলবার্গ ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরবর্তী পাঁচ বছর চিকিৎসাশাস্ত্র পড়েছেন বার্লিন, হাইডেলবার্গ ও গ্যয়টিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর গবেষণার জন্য এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন একটি মনরোগ সংক্রান্ত ক্লিনিক-এ। পরবর্তীকালে য়্যাস্পার্স অধ্যাপনা করেছেন বার্লিন, মিউনিক ও গ্যয়টিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে য়্যাস্পার্স হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু 'জার্মান সাম্রাজ্যের' একজন কড়া সমালোচক ছিলেন বলে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ থেকে নাৎসীবাহিনী তাঁকে অপসারিত করে। অত্যাচার ও মৃত্যুভয়ে তাঁকে দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে। অবশেষে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তিবাহিনী য়্যাস্পার্সকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। পরবর্তীকালে য়্যাস্পার্স বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন কৃতিত্বের সংগে। কিয়েকের্গার্দ ও গাব্রিয়েল মার্সেলের খ্রীস্টীয় অস্তিবাদী ধারার সংগেই য়্যাস্পার্সের চিন্তাধারার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিক হিসেবে য়্যাস্পার্স নিয়মানুগ চিন্তাধারার পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং সুষ্ঠু জীবন যাপনের প্রতিই ছিল তাঁর আগ্রহ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দর্শনের উৎপত্তি হবে মানুষের ব্যক্তি-অস্তিত্ব থেকে এবং অন্যান্য মানুষকে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথার্থভাবে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করবে। দর্শনে য়্যাস্পার্সের আবির্ভাব একজন মনরোগনিরূপণ শাস্ত্রবিদ হিসেবে। একজন অস্তিবাদী হিসেবে প্রচলিত দর্শনচিন্তা এবং আধুনিক সমাজের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিরূপ মনোভাব। আধুনিক সমাজে ব্যক্তির আত্মগত দিককে দাবিয়ে রাখার যে প্রবণতা, যান্ত্রিক ও শিল্প-সভ্যতার ব্যক্তিসত্তাবিনাশী যে মানসিকতা আমাদের জীবনকে পংগু করে দিচ্ছে, এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছে য়্যাস্পার্সের দর্শনে। অন্যান্য অস্তিবাদীদের মতো য়্যাস্পার্সও সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করে এবং রক্তমাংসে গড়া মানুষ-কেন্দ্রিক দর্শন প্রচার করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর বিভিন্ন রচনা-গুলির মধ্যে ফিলসফি অব এক্‌জিস্টেনস, দ্য সাইকোলজি অব ওয়ার্ল্ড-ভিউজ, ম্যান ইন দা মডার্ন এজ, দ্য গ্রেট ফিলসফার্স, রীজন অ্যাণ্ড এক্‌জিস্টেনজ, রীজন

অ্যান্ড অ্যান্টি-রীজন ইন আওয়ার টাইম, দ্য পেরিনিয়াল স্কোপ অব্ ফিলসফি, দ্য অরিজিন অ্যান্ড গোল অব্ হিস্ট্রি, জেনারেল সাইকোপ্যাথলজি, ওয়ে টু উইস্‌ডম্‌ প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য।

মেজাজ এবং পদ্ধতিগত কিছু মৌলিক বিষয়ে হাইডেগারের সংগে য়্যাস্পার্স-এর পার্থক্য ছিল। উভয়ের বৌদ্ধিক পটভূমিকা ছিল ভিন্ন, ভিন্ন ছিল উভয়ের শিক্ষণ পদ্ধতিও। হাইডেগার বিজ্ঞান বিষয়ে প্রায় অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু য়্যাস্পার্স তা ছিলেন না। বরং তিনি মনে করতেন, "যে দার্শনিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন, বা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল যিনি হারিয়েছেন তাঁর সহজেই ভ্রান্তি আসবে···।" কিন্তু ঐ সঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছেন যে, "বিজ্ঞান ও দর্শনকে তাই বলে অভিন্ন মনে করা সংগত নয়; সেরকম কোন প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না।" বোধ হয় সে-কারণেই তিনি আধুনিক দর্শনের জনক দেকার্ত এবং মানসঘটনাবাদের জনক হুসার্লের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। অস্তিবাদী হিসেবে য়্যাস্পার্স দর্শনকে কখনই বিজ্ঞানরূপে চিহ্নিত করেন নি। মানসিক রোগের চিকিৎসক হিসেবে য়্যাস্পার্স এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন যে, কোন রোগীর মানসিকতাকেই পুরোপুরিভাবে বিষয়নিষ্ঠ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যাবে না, আর তা উচিতও নয়। মানুষের মন কোন বিমূর্ত সার্বিক নিয়মের অধীন নয়, কোন নির্দিষ্ট ফরমুলায় মানব-মনের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। তাঁর এই সিদ্ধান্ত স্বভাবতই তাঁর ও রোগীদের মধ্যে এক মধুর, ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে তাঁকে উৎসাহিত করে তোলে। য়্যাস্পার্স তাঁর অভিজ্ঞতার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'ঐ সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিষয়নিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব যথেষ্ট ও ফলবতী নয়, বরং বিষয়ীগত দৃষ্টিভঙ্গীই এক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী।'

দর্শনকে বিজ্ঞানের রূপ হিসেবে চিহ্নিত করতে চান নি বলেই বোধহয় য়্যাস্পার্স ফ্রয়েড ও মার্কসের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। য়্যাস্পার্স-এর মতানুসারে, ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় জগৎ-ব্যাখ্যা বিজ্ঞানেরই নামান্তর। বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে যান্ত্রিক সভ্যতাকে মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছে সেই যান্ত্রিক-সভ্যতার কবল থেকে মানুষ যতদিন না মুক্ত হতে পারছে ততদিন পর্যন্ত মানুষের সত্যিকারের জীবন-উপলব্ধি হবে না। বিষয়গত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনের যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না।

য়্যাস্পার্স দেখেছেন যে, বিজ্ঞানে উন্নত হয়েও মানুষ আজ যন্ত্রণাবিদ্ধ ও অবসাদগ্রস্ত, সভ্যতার অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষ আজ অস্থির ও অশান্ত। এ সভ্যতায় মানুষের জ্ঞান বেড়েছে, জীবনের গতি বেড়েছে, প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা বেড়েছে, কিন্তু শান্তি আসে নি, জীবন-যন্ত্রণা কমে নি। বিজ্ঞানের ফরমুলায় বা ছকে জীবন চলে না। এ যুগের সভ্যতা মানুষকে 'যন্ত্র'-এ পরিণত করেছে, 'মানুষ'-এ পরিণত করতে পারে নি। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক—জীবনের সব স্তরেই যান্ত্রিক সভ্যতার ক্ষতচিহ্ন সুস্পষ্ট। ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি স্তরে আজ হতাশা পরিস্ফুট। ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা এ সভ্যতায় অবহেলিত, তার অস্তিত্ব বিপন্ন। মন তার বহির্মুখী হয়ে পড়েছে। কিন্তু মনকে অন্তর্মুখী করতে না পারলে মানব-

অস্তিত্বের উপলব্ধি হবে না। অস্তিত্বের আসল রহস্য ও তাৎপর্য নিহিত আছে মনের অন্তর্মুখীনতায়। য়্যাস্পার্স মনে করতেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধ্যমে জীবন বা মানব-অস্তিত্ব নিঃশেষিত হয়ে যায় না। জীবনের বেশীরভাগই থেকে যায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নাগালের বাইরে। বিজ্ঞান দিয়ে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সবরকম নিয়ন্ত্রণবাদেরই বিরোধী ছিলেন য়্যাস্পার্স। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, য়্যাস্পার্সের এই মনোভাবের সঙ্গে ভিট্‌গেনস্টাইনের মনোভাবের সাদৃশ্য দেখা যায়। ভিট্‌গেনস্টাইন তাঁর 'ট্রাকটেটাস্' গ্রন্থে বলেছেন, "সমস্ত সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া যখন হয়ে যায়, জীবনের সমস্যাবলী তখন পর্যন্ত ছোঁয়াও হয় নি।" অর্থাৎ, য়্যাস্পার্স ও ভিট্‌গেনস্টাইন্ উভয়ের মতেই জীবন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বড়। জার্মান-কাণ্টীয় ঐতিহ্যই মনে হয় এই সাদৃশ্যমূলক মনোভাবের উৎস।

কিয়ের্কেগার্দ ও নীৎসের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন য়্যাস্পার্স। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁদের শিষ্য বা অনুগামী বলা চলে না। কেননা, য়্যাস্পার্স অন্ধভাবে তাঁদের অনুসরণ করেন নি। তবে, তাঁদের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেকে লাভবান করেছেন নিঃসন্দেহে। য়্যাস্পার্স মনে করেন যে, কিয়ের্কেগার্দ ও নীৎসের পর দর্শনের রূপ একই থাকতে পারে না। হিউম যেভাবে জ্ঞানের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের সচেতন করে তুলেছেন, সেরকম কিয়ের্কেগার্দ এবং নীৎসেও অসংগত মনুষ্য-পরিস্থিতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে আমাদের সজাগ করে তুলেছেন।

মনোরোগ নিরূপণশাস্ত্রবিদ্ হিসেবে দর্শনের জগতে য়্যাস্পার্সের আবির্ভাব ঘটলেও শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, মনরোগনিরূপণশাস্ত্র প্রকৃত মানবাত্মার স্বরূপ উদঘাটন করতে পারে না। প্রকৃত মানবাত্মা বাস্তব জগতে বাস করে, তা কোনরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় নয়। য়্যাস্পার্সের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে দু'রকম আত্মার উল্লেখ রয়েছে—স্বানুভবসিদ্ধ (authentic) আত্মা এবং স্বাননুভবসিদ্ধ (unauthentic) আত্মা। যে আত্মা আমরা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করি, যে আত্মা বংশগতির দ্বারা নির্দিষ্ট দৈহিক কাঠামোতে অবস্থান করে, যা সামাজিক পরিবেশ ও রীতিনীতি এবং দেহগত প্রকৃতির দ্বারা গঠিত হয়, এবং যা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা আলোচনা করেন, তা হলো স্বাননুভবসিদ্ধ আত্মা। পক্ষান্তরে, যে আত্মা সকল রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, স্বাধীন সংকল্প গ্রহণ করে, যা নতুন নতুন সৃষ্টির মূলে বর্তমান থাকে তা হলো স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা। বিষয়ীরূপে চৈতন্যই, য়্যাস্পার্সের মতে, স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা। যেহেতু তা কখনও জ্ঞানের বিষয় হয় না, সেহেতু স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা মনোবিজ্ঞানকেও ছাড়িয়ে যায়।

য়্যাস্পার্সের মতানুসারে, অপরাধবোধ, হতাশা, আতংক, উদ্বেগ, চ্যুতি বা অনন্বয়, একাকিত্ব, মৃত্যু প্রভৃতির অভিজ্ঞতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা মাঝে মাঝে সংকটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হই। এইসব অভিজ্ঞতায় আমরা উপলব্ধি করি আমাদের স্বাননুভবসিদ্ধ আত্মার অগভীরতা এবং সেই সংগে সচেতন হই স্বানুভব-সিদ্ধ আত্মা সম্পর্কে। যদিও স্বাননুভবসিদ্ধ আত্মা স্বানুভবসিদ্ধ আত্মার চেয়ে

আলাদা, তবু একথা মনে রাখতে হবে যে, স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা স্বাননুভবসিদ্ধ আত্মার মাধ্যমেই জগতে ক্রিয়া করে। স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা বাইরে থেকে আমার কাছে উপস্থাপিত হয় না, আমি স্বানুভবসিদ্ধ আত্মাকে অনুভব করি একটি সত্তা হিসেবে যা স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করে এবং নিজেকে তৈরি করে। প্রতি মুহূর্তেই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং নতুন করে নিজেকে তৈরি করছে। এই ভবিষ্যৎ রচনার মাধ্যমেই স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। ব্যক্তি অস্তিত্বশীল এবং তার সারধর্ম বা প্রকৃতি সে তার অস্তিত্বের মাধ্যমেই অর্জন করে।

স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা সব সময়ই স্বাধীন ইচ্ছাকে সূচিত করে, অন্ধ আবেগকে নয়। য়্যাস্পার্স-এর মতানুসারে, স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা চেতনশীল এবং জগতের সংগে সম্পর্কিত। বস্তুরাজি সমন্বিত বাহ্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। এই জগৎকে তিনি বিজ্ঞানের জগৎ বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এই জগতে যা জানা যায় তা বস্তু এবং বিষয়গত,—বিষয়গত এই অর্থে যে, বস্তুর যে অভিজ্ঞতা হয় তা লিখে বা বলে জানানো যায় এবং বস্তু সম্পর্কে যা জানা যায় তা সকলের পক্ষেই বোধগম্য ও গ্রহণীয়। য়্যাস্পার্স বিজ্ঞানকে বোধগম্য জগৎ ও ধীশক্তির মধ্যে এক সম্পর্ক বিশেষ হিসেবে দেখেছেন। বিজ্ঞানপ্রদত্ত বিষয়গত জ্ঞানের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল না, কারণ, তাঁর মতে, মানুষের প্রজ্ঞার লক্ষ্য হলো জ্ঞানের ঐক্য ও সামগ্রিকতা, আর বিজ্ঞান তা দিতে পারে না। অবশ্য তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে, বিজ্ঞানের জগৎ ছাড়া অন্য কোন জগৎ নেই। বিজ্ঞানকে নিয়েই তাই দর্শনের যাত্রা শুরু। এ জগতের সংগে সম্পর্কবিহীন হলে দর্শন সবই হারাবে। "দর্শনের রাজ্যে একমাত্র তাঁরই প্রবেশাধিকার আছে যিনি অত্যন্ত প্রগাঢ়ভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জগতের অনুসন্ধানের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবেন"—য়্যাস্পার্স-এর এই উক্তি এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানের ক্ষমতা এবং সীমা সম্পর্কে দর্শন অবহিত হয়েও অসংগ সত্তা (Absolute) সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে না, অথচ চিন্তা করার ইচ্ছা থেকে যায়। য়্যাস্পার্স-এর মতে, দার্শনিকের 'অস্তিত্ব' নিয়েই দর্শনের শুরু, অর্থাৎ দার্শনিক যা তাই নিয়ে দর্শনের আরম্ভ, দার্শনিকের জ্ঞান বা দার্শনিক যা জানেন তা নিয়ে নয়। দর্শনের বিষয়বস্তু কখনও বিষয়গত পদ্ধতিতে জানা যাবে না। দর্শনের জন্ম ব্যক্তির অন্তঃস্থলে। য়্যাস্পার্স দৃষ্টবাদ এবং ভাববাদের বিরুদ্ধাচরণ করে বলেছেন যে, দৃষ্টবাদ সমস্ত দর্শনকে বিজ্ঞানে পর্যবসিত করতে সচেষ্ট, আর ভাববাদ সমস্ত বিজ্ঞানকে দর্শনে রূপান্তরিত করতে প্রয়াসী। কিন্তু, উভয় প্রকার প্রয়াসই অপপ্রয়াসে পরিণত হতে বাধ্য। য়্যাস্পার্স-এর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল শেষ পর্যন্ত দার্শনিককে অন্তরজগতের দিকেই মনোনিবেশ করতে হয়, কারণ, দার্শনিককে তাঁর নিজের 'অস্তিত্ব' নিয়েই কাজ শুরু করতে হয়, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এখানেই দার্শনিক খুঁজে পান তাঁর স্বাধীনতা। আত্মসচেতনতা আমাদের স্বাধীনতার সূচক।

কিন্তু য়্যাস্পার্স-এর মতানুসারে, মানুষ সব কিছু থেকে পুরোপুরি স্বাধীন নয়। আমার স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা জগতের সংগে সম্পর্কিত, [illegible] এক সীমাহীন

অসংগ সত্তার সংগে বিজড়িত। আমার সংগে ঐ অসংগ সত্তার সম্পর্ক স্পষ্ট হয় দুঃখকষ্ট, অপরাধবোধ, সংগ্রাম, হতাশা, শংকা, উদ্বেগ, মনস্তাপ, মৃত্যু প্রভৃতি চূড়ান্ত অবস্থায়। আমরা অসংগ সত্তার জ্ঞান লাভ করতে পারিনা, তবে কিছু প্রতীকের মাধ্যমে উক্ত সত্তাকে অনুভব করতে পারি। য়্যাস্পার্স-এর মতে, এই প্রতীকগুলি আমাদের জীবনকে গভীরতা দান করে। অগভীর বা ভাসা-ভাসা স্তরে আমরা জগৎ ও জাগতিক বস্তু সম্পর্কে সচেতন হই, গভীর স্তরে আমরা পাই আত্মার অস্তিত্বকে যা জগৎ ও জাগতিক বস্তুর শর্ত, এবং গভীরতম স্তরে আমরা অনুভব করি অসংগ সত্তাকে, যা আত্মাকেও প্রভাবিত করে। আস্তিক্য অস্তিবাদী হিসেবে এ ধরনের চিন্তা য়্যাস্পার্সের পক্ষে স্বাভাবিক।

য়্যাস্পার্স-এর আস্তিক-চিন্তাধারা এবং অস্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে হলে 'সমাযোজন' (Communication) ও 'অতিক্রমণ' (Transcendence) শব্দ দুটির অর্থ বুঝতে হবে। এই শব্দ দুটির ওপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, সমাযোজন ও অতিক্রমণ সত্যিকারের মানব অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। 'সমাযোজন' বলতে য়্যাস্পার্স শুধুমাত্র যূথপ্রবৃত্তি ও সামাজিক সংগপ্রিয়তার সাধারণ প্রথাকে বোঝাতে চান নি, বরং অন্ততঃ দুজন মানুষের সরাসরি একত্র-মিলন (Togetherness) বা সংবন্ধতাকেই বুঝেছেন, যে দুজন মানুষ একত্রে তাদের ব্যক্তিত্বের গভীরতম সত্তার পরিপূর্ণতাকে অনুভব করার জন্য সচেষ্ট থাকে, একে অন্যের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় সরাসরিভাবে জড়িত থাকে, একে অন্যের অনুভূতির অংশীদার হয়। সামাজিক জীবনে অন্যান্য মানুষের সংগে ব্যক্তির যোগাযোগ বা সমাযোজন তার অস্তিত্বের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সমাযোজন ছাড়া স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা বাস্তব নয়। একমাত্র সমাযোজনের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার প্রকৃত আত্মা খুঁজে পায়। সত্য হলো তাই যা আমাদের সংবন্ধ বা একত্রিত করে এবং সমাযোজনের মধ্যেই সত্যের বীজ নিহিত। এ জগতে মানুষ একমাত্র সমাযোজনের মাধ্যমেই বেঁচে থাকতে পারে। অন্যের সংগে সম্পর্কিত না হয়ে বেঁচে থাকার অর্থই হলো সত্যের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়া। একা কেউ তার আত্মাকে সত্যিকারের অর্থে বাঁচাতে পারে না। আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের মাধ্যমেই অস্তিত্বের উপলব্ধি ঘটে, সমাযোজনের মাধ্যমেই আত্মার একাকিত্ব মুক্তি লাভ করে, ব্যক্তির সত্যিকারের আত্মোপলব্ধি ঘটে। শুধুমাত্র বাক্যবিনিময় নয়, শুধুমাত্র পরিচিতি বা আলাপ-আলোচনা নয়, সামগ্রিক প্রকাশের বা অভিব্যক্তির প্রতি অবিরাম অগ্রগতিই সমাযোজনকে সম্ভব করে তোলে। সমাযোজনের ব্যর্থতার মধ্যে নিহিত আছে প্রজ্ঞার সবচেয়ে বড় অমংগলের সংকেত। ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ সমাযোজনে অসমর্থ।

য়্যাস্পার্স-এর কাছে দর্শন হলো জীবনযাপনের পথনির্দেশক ; দর্শন তাঁর কাছে কোন প্রণালীবদ্ধ মতবাদ নয়। দর্শন হলো এক অবিরত অন্বেষণ। দর্শন মানে 'গতি', 'চলা',—'থামা' নয়। সেজন্যই দর্শনকে কোন স্বয়ং-সম্পূর্ণ মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না।

ব্যক্তি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী ও কালিক হলেও আমরা একে অতিক্রম

করতে পারি। য়্যাস্পার্স-এর মতে, দুটি সীমারেখার ক্ষেত্রে আমরা জ্ঞানের পরিধিকে অতিক্রম করতে পারি, যাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। ঐ দুটি সীমানা হলো অতিক্রমণ ও অস্তিত্ব। চূড়ান্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমেই আমরা ঐ সীমানায় পেঁছাই। 'অতিক্রমণ'-এর ধারণা আমাদের স্বাধীনতার সংগে অপরিহার্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। 'অতিক্রমণ' শব্দটি ব্যক্তি মানুষের চেয়ে মহৎ কোন সত্তাকে সূচিত করে, যাকে মানুষ সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করতে পারে। 'দার্শনিক বিশ্বাস'-এর মাধ্যমে সেই সত্তার সংগে ঘটে ব্যক্তির সংযোগ। ঐ সত্তাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করা যায় না। মানুষের মধ্যে আছে সেই সত্তার স্পন্দন, যা অস্বীকারও করা যায় না। একমাত্র স্বানুভবসিদ্ধ আত্মাই পারে মানব জীবনকে স্বাধীনতার আস্বাদ দিতে, জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে। সীমাবদ্ধ পরিবেশে দুঃখকষ্ট, হাসিকান্না, উদ্বেগ, হতাশা, ব্যর্থতা, আতংক, মনস্তাপ, মৃত্যু প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও মানুষকে তার অন্তরের বিশ্বাস, ইচ্ছা ও অনুভূতির প্রতি মনোযোগী হতে হবে। মনের স্বমুখিনতার মধ্যেই নিহিত আছে সত্যের আসল রূপ, অস্তিত্বের প্রকৃত রহস্য। দার্শনিকীকরণ তাই বুদ্ধির চর্চা বা অনুশীলন নয় ; এ হলো এক অবিরাম অন্বেষণ, যেখানে রয়েছে অতিক্রমণের চেষ্টা। য়্যাস্পার্স-এর কাছে দার্শনিকীকরণ হলো মনুষ্য পরিস্থিতির প্রতি মানুষকে সচেতন করে তোলা। অস্তিত্বের অর্থই হলো অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে উপলব্ধি করা, আর এই উপলব্ধির মাধ্যমেই ঘটে উত্তরণ বা অতিক্রমণ। য়্যাস্পার্স-এর দর্শনে ঈশ্বরের ভূমিকা সব সময়ই অতীন্দ্রিয় সত্তা হিসেবে। তাঁর মতে, সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুই হলো অতীন্দ্রিয় সত্তার ভাষা, চিহ্ন বা প্রতীক, আর দর্শনের কাজই হলো সেই ভাষা বা প্রতীকের অর্থ প্রকাশ করা। অতীন্দ্রিয় সত্তা সব কিছুর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত, সব কিছুকে এই সত্তা 'আলিংগন' করে আছে। অসংগ সত্তার সংগে আমার সম্পর্ক বা যোগাযোগই হলো আমার সত্তার ভিত্তি।

য়্যাস্পার্স-এর মতানুসারে, স্বাননুভবসিদ্ধ আত্মা, স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা এবং অসংগ সত্তা—এই তিনটি স্তরেই ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারে। মানুষ, তাঁর মতে, সব সময়ই স্বাতিক্রমণকারী সত্তা। প্রতিটি মানুষই বর্তমানে যা তা সে হতে চায় না, যা সে নয় তাই হতে চায়। ভবিষ্যৎ রচনার এই স্বাধীনতা স্বাতিক্রমণকেই সূচিত করে এবং প্রতি মুহূর্তেই এই স্বাতিক্রমণ ঘটছে। ব্যক্তি এইভাবেই শেষ পর্যন্ত অসংগ সত্তা বা অতীন্দ্রিয় সত্তার সংগে সম্পর্কিত হয়। দর্শনের কাজই হলো মানব-মনকে অসংগ সত্তার প্রতি ধাবিত করা। মানুষ যখন তার সসীমতা সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তাকে অতিক্রম করার ব্যাপারেও সচেষ্ট হয়। আসলে, ব্যক্তির সসীমতা ও ক্ষণিকতা অতিক্রমণের সচেতনতাকেই নির্দেশ করে।

য়্যাস্পার্স-এর দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের সীমা নির্দেশ করা এবং ঐ সীমার অপরপ্রান্তে যা আছে সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলা। তাঁর দার্শনিকীকরণ তাই অতিক্রমণকে সব সময়ই নির্দেশ করে।

প্রযুক্তিবিদ্যা, যান্ত্রিক সভ্যতা ও কলাকৌশলের দ্বারা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে য়্যাস্পার্স-এর বিদ্রোহ এবং ব্যক্তির যান্ত্রিকীকরণের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ তাঁর দর্শনকে

এক নতুন রূপ দান করেছে। মানবিকতা নষ্ট করে ব্যক্তিকে যন্ত্রে পরিণত করার বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে প্রচেষ্টা, তাকে য়্যাস্পার্স তাই বারবার আক্রমণ করেছেন। আধুনিক শিক্ষায় মানবিকতাবোধের অভাবে তিনি ছিলেন রীতিমত বিচলিত। আধুনিক যান্ত্রিক ও শিল্পসভ্যতায় মানুষের বিয়োগান্ত অন্তর্দ্বন্দ্বকে তাই তিনি জোরালো ভাষায় প্রকাশ করে মানুষকে সচেতন করে তুলেছেন। সেদিক থেকে তার অবদান প্রশংসনীয়। আধুনিক সভ্যতার একজন সমালোচক হিসেবে তিনি নানাভাবে এই ঠুনকো সভ্যতার অন্তর্লোক উন্মোচিত করার জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ।

প্রবন্ধটি বঙ্গীয় দর্শন সংসদের আলোচনাচক্রে পঠিত ও আলোচিত। পরবর্তীকালে সংসদের মুখপত্র 'প্রজ্ঞা'-য় (প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) প্রকাশিত। এখানে পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপে প্রকাশ করা হলো।

## গেব্রিয়েল মার্সেল (১৮৮৯)

**জীবন ও দর্শন :**

ফরাসী দার্শনিক, নাট্যকার ও সমালোচক গেব্রিয়েল মার্সেলের জন্ম ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর পিতা ছিলেন শিক্ষিত সংস্কৃতিবান পুরুষ। জাতীয় সংগ্রহশালার বিভিন্ন শাখায় তিনি ডিরেক্টর হিসেবে কৃতিত্বের সংগে কাজ করেছেন। মাত্র চার বছর বয়সে মার্সেল মাতৃহারা হন। মানুষ হয়েছেন কর্তৃত্বপরায়ণা এক মাসির প্রযত্নে। মাসি ছিলেন উদার প্রটেস্টেণ্ট ধর্মাবলম্বী এবং নৈতিকতার কট্টর সমর্থক। পিতার অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) এবং মাসির কট্টর নৈতিকতা—এই পরিবেশেই মানুষ হয়েছেন মার্সেল। স্কলাস্টিক চিন্তাধারার মধ্যেই তাঁর লালন-পালন হয়েছে। একমাত্র লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধিক বিকাশ। শৈশব অবস্থা থেকেই ভ্রমণের সুযোগ মার্সেল-এর কপালে জুটেছিল। তাঁর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে বিভিন্ন দেশভ্রমণের প্রভাব ছিল অপরিসীম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি রেডক্রশ সংস্থায় কাজ করেছেন। হারিয়ে-যাওয়া সৈনিকদের খুঁজে ফিরিয়ে নিয়ে আসা ছিল তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধজাত ভয়াবহ অবস্থাতেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, মানব-অস্তিত্বের 'ট্রাজিক' বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দানে বিমূর্ত দর্শন ব্যর্থ। ৩৯ বছর বয়সে মার্সেল ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হলেও দর্শন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বা উপলব্ধি পাল্টায় নি।

যৌবনেই শুরু হয়েছিল মার্সেল-এর লেখার কাজ—মূলতঃ নাটক সংক্রান্ত। ঐ সঙ্গে চলে দর্শনচর্চা—এ কাজ শুরু হয় জার্মান, ইংলিশ ও আমেরিকান ভাববাদীদের নিয়ে। বুবের ছিলেন তার সমকালীন। সংগীত সম্পর্কে মার্সেল-এর আগ্রহ ছিল প্রচণ্ড। সংগীত রচনায় তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতা সম্পর্কে নিজেই একসময় মন্তব্য করেছিলেন যে, "এটাই আমার সত্যিকারের পেশা; একমাত্র এতেই আমি সৃজনশীল।" ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ থেকে মার্সেল অধ্যাপনা করেছেন বেশ কিছুকাল—অবশ্য মাঝে বিরতি দিয়ে।

অস্তিবাদী হিসেবে মার্সেল-এর চিন্তাধারার সংগে কিয়েকেগার্দ ও য়্যাস্পার্স-এর চিন্তাধারার সাদৃশ্য ও নৈকট্য খুবই স্পষ্ট। ফরাসী এই চিন্তাবিদ অন্য এক ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁ-র স্বভাবাদের দ্বারা অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু বার্গসোঁ-র প্রভাব থাকলেও মার্সেলের অস্তিবাদ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং স্বাধীন চিন্তা প্রসূত। মার্সেল সুস্পষ্টভাবে একথা বলেছেন যে, তাঁর চিন্তাধারা একটা বিশিষ্ট রূপ বা আকার নেওয়ার পর তিনি কিয়েকেগার্দ ও অন্যান্য অস্তিবাদীদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছেন। মানুষ হিসেবে মার্সেল ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির। তাঁর দৃষ্টিভংগী ও পদ্ধতি ছিল সবসময়ই দার্শনিক। দর্শন, সংগীত ও নাটকের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড

অনুরাগ ও তীব্র আকর্ষণ। নাটকের বিষয় হিসেবে মার্সেল নিঃসংগতা, হতাশা, ব্যর্থপ্রেম, মনোমালিন্য, নৈরাশ্য প্রভৃতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিয়েরকেগার্দ-এর মতো তিনিও ছিলেন আস্তিক। কিন্তু কিয়েরকেগার্দ-এর বিদ্রোহ ছিল তদানীন্তন গীর্জার বিরুদ্ধে, আর মার্সেল-এর বিদ্রোহ ছিল শিল্প-সমাজের বিরুদ্ধে, প্রযুক্তিবিদ্যা-প্রভাবিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাঁর অস্তিবাদকে অনেকে "খ্রীস্টীয় অস্তিবাদ" নামে চিহ্নিত করেছেন। আস্তিক অস্তিবাদী হিসেবেই তিনি পরিচিত।

প্লেটোর ভাববাদের প্রতি ছিল মার্সেল-এর প্রচন্ড বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা। 'বাস্তব' ও 'বৌদ্ধিক' সমার্থক—ভাববাদের এই তত্ত্ব তাঁর কাছে গ্রহণীয় ছিল না। উপরন্তু, ভাববাদীরা অস্তিত্বকে সারধর্মে পরিণত করেছেন ; এমনকি, সকল সারধর্মকে একটি মাত্র সারধর্ম অর্থাৎ পরমসত্তায় রূপান্তরিত করেছেন। ভাববাদ মানুষ ও জগতের স্বরূপ ও প্রকৃতিকে বিকৃত করে। ভাববাদী দার্শনিক অস্তিত্বের বাস্তবতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন, বিমূর্তচিন্তা নিয়ে মগ্ন থাকেন। পক্ষান্তরে, মার্সেল মনে করেন, অস্তিত্বের বাস্তবতায় সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। ঈশ্বর্ সৎ কিনা—এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে, কেননা, 'সততা' গুণটিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকে আলাদা করা যায়। অন্যভাবে বলা চলে, সততা থাক্ বা না থাক্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকবেই ; কিন্তু 'অস্তিত্ব' ও 'অস্তিত্বশীল' এই দুটিকে কোনপ্রকারেই আলাদা করা করা যায় না।

সমকালীন ফরাসী পন্ডিত, দার্শনিকও নৃতত্ত্ববিদ লেভি স্ত্রাউস্ একসময় অস্তিবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধ্যানধারণাকে দর্শনের স্তরে উন্নীত করা খুবই বিপজ্জনক। দার্শনিকের কাজ সত্তার স্বলক্ষণকে নিজের সংগে যুক্ত না করে বোঝা।' মার্সেল-এর দর্শন লেভি স্ত্রাউসের চিন্তাধারার বিরোধী। তাঁর সমস্ত লেখাতে তিনি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, সত্তার স্বলক্ষণকে বোঝা মানেই হলো নিজের এবং অন্যান্যদের সংগে যুক্ত করে বোঝা। মার্সেল সত্তা ও অস্তিত্বের আলোচনা করেছেন দর্শনের একটি বৃহৎ কাঠামো তৈরি করার জন্য নয়, করেছেন 'মানুষের দর্শন' তৈরির উদ্দেশ্যে। 'ম্যান এ্যাগেনস্ট্ হিউম্যানিটি' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : 'আমার সমস্ত দর্শনচিন্তার গতিশীল উপাদান হলো বিমূর্তচিন্তার বিরুদ্ধে আপোষহীন ও বিরামহীন সংগ্রাম'। দর্শকের নয়, অভিনেতার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি দর্শন জগৎবাসীকে উপহার দেওয়াই ছিল মার্সেল-এর লক্ষ্য।

মার্সেল-এর মতানুসারে, দর্শনের প্রকৃত বিষয়বস্তু হলো, মানুষের অপ্রীতিকর অবস্থা বা সংকটাবস্থা। 'আমি কে'? এবং 'সত্তা কী'?—এই দুটি প্রশ্নে ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। মার্সেল দর্শনকে দেখেছেন এক অবিরাম অন্বেষণ হিসেবে এবং তাঁর মতে, এই অন্বেষণের মূলে রয়েছে এক জরুরী আন্তর প্রয়োজন এবং এক গভীর অশান্ত বোধ। দার্শনিক চিন্তাধারা কখনও বিষয়নিষ্ঠ পদ্ধতিতে অগ্রসর হয় না। দার্শনিক যে বাস্তব পরিবেশে বাস করেন, যে জগতের সংগে রয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, দৈনন্দিন জীবনে তাঁর যে উপলব্ধি ও অনুভূতি, তাঁর যে সমস্ত প্রতিবেশী তাদের সুখদুঃখকে বাদ দিয়ে, সেগুলির সংগে সংশ্রবহীন হয়ে, দার্শনিক কখনই সত্যিকারের অর্থে এই জগতে বাস করতে পারেন না। জগতের সংগে তো তিনি

'জড়িয়ে' আছেন—একে উপেক্ষা করবেন কী করে ? যদি তিনি তা করেন, তাহলে তো তিনি স্বধর্ম ভ্রষ্ট হয়ে পড়বেন। বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিন্তার জগতে বসবাস করতে গেলে তাঁকে সমাজ থেকে 'পলাতক' হিসেবেই গণ্য করতে হবে। বিমূর্ত মানসিকতার সংগে ছিল না তাই তাঁর কোন আপোষ।

একজন ক্যাথলিক হিসেবে মার্সেল বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় ধর্মযাজকের মাধ্যমে, অন্যান্য মানুষের মাধ্যমে—একে অন্যের সংগে সংযোগের মাধ্যমে। বিষয়ীগততাকে তিনি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন নি—বিষয়ীগততা কখনই আত্মকেন্দ্রিকতা নয়। মার্সেল বরাবরই বুদ্ধি বা যুক্তির চেয়ে অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবসত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ছিল তাঁর গভীর দরদ। ভাবনাত্মক প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে ছিল তীব্র বিদ্বেষ। ভাবনাত্মক প্রজ্ঞার বিপদই এই যে, তা দার্শনিককে তাঁর অভিজ্ঞতার সত্যতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর এ বিশ্বাসও ছিল যে, বিমূর্তায়ন অনেক সময়ই ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী এবং হিংসার জন্ম দেয়। অবশ্য সার্ত্র্-এর মতো মার্সেল রাজনীতি নিয়ে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন নি। তবে, সার্ত্র্-এর মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, নাটকীয় আকারই হলো একজনের সংগে অন্যের অস্তিবাদী সম্পর্ককে প্রকাশ করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তেমনই, ডায়েরি বা দিনপঞ্জী হলো ব্যক্তির আন্তরজীবন বর্ণনা করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

মার্সেলের কাছে এই জগৎ 'ভগ্ন জগৎ'—এই জগৎ তার সত্যিকারের ঐক্য হারিয়েছে এবং নিজের সংগেই বর্তমানে বিরোধে লিপ্ত। আধুনিক গণ-সমাজের চিত্র মার্সেলের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই সমাজে ব্যক্তি মানুষের যে চেহারা ফুটে উঠেছে তাতে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অবহেলিত ও নিষ্পেষিত। এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নেই কোন আন্তরসম্পর্ক, মানুষের মন আজ বহির্মুখী। মার্সেল-এর দৃঢ়বিশ্বাস, এ সবই শিল্প-সভ্যতার ফলাফল। য়্যাস্পার্সের মতো মার্সেলও ছিলেন বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার তীব্র সমালোচক।

দর্শনে প্রচলিত প্লেটো ও দেকার্তের দ্বৈতবাদকে মার্সেল সমর্থন করেন নি। চিন্তা ও সত্তা, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এবং ব্যক্তি ও সমাজ—এই চতুর্বিধ দ্বিতত্ত্বকে প্রমাবিদ্যার সৃষ্ট প্রভেদ বলে মার্সেল বর্জন করেছেন। বাস্তব সত্তাকে 'জানা' যায় না—এই ছিল মার্সেলের বিশ্বাস। বার্গসোঁ-র সুরে সুর মিলিয়ে তিনিও বলেছেন, একাত্মভাবের মাধ্যমে আমরা বস্তুর সংগে আসল মোকাবিলা করি। অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা অনুভব বা উপলব্ধি করতে সক্ষম বলেই তিনি মনে করতেন।

অস্তিত্বের প্রশ্নটি মার্সেলের কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, অস্তিত্বের প্রশ্ন কোন 'সমস্যা' নয়, এ হলো 'রহস্য'। 'সমস্যা' ও 'রহস্য' মার্সেলের দর্শনে বিশেষ অর্থবহন করে ; এগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মার্সেল শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ব্যক্তি যখন জগৎকে বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, নিজেকে যখন জগতের সংগে 'জড়িয়ে' রাখে না, দেখে না, তখন 'সমস্যা' শব্দটি ব্যবহার করা সংগত। 'সমস্যা' সবসময়ই আমাদের 'সামনে' থাকে। পক্ষান্তরে ব্যক্তি

যখন নিজেকে জগতের সংগে 'জড়িয়ে' রাখে, বাস্তব-পরিবেশের সংগে সে যখন জড়িত, তখন 'রহস্য' শব্দটি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। মার্সেলের মতানুসারে, আমার আমিত্ব থেকে আমার অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে জ্ঞাতব্য বিষয় হিসাবে কখনই আমি আমার সামনে উপস্থাপিত করতে পারি না। আমার অস্তিত্ব কোন 'সমস্যা' নয়, যা আমি চিন্তা বা বুদ্ধির সাহায্যে সমাধান করতে পারি। একমাত্র প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই অস্তিত্বের 'রহস্য' ধরা পড়ে। মার্সেলের মতে, অস্তিত্বের উপলব্ধি ঘটে বাস্তবে বেঁচে থাকার মাধ্যমেই,—ইচ্ছায়, আবেগে, কর্মে, অনভূতিতে, আশংকায়, মনোনয়নে, সংকল্পে আমার অস্তিত্বের 'রহস্য' আমার কাছে ধরা পড়ে। 'রহস্য' সবসময়ই যাচাই-এর অযোগ্য।

এই প্রসংগে মার্সেল আরো দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তা হলো, 'অধিকারী হওয়া' ও 'সত্তা', যার ইংরেজি প্রতিশব্দ যথাক্রমে হলো 'হ্যাভিং' ও 'বিয়িং'। 'হ্যাভিং' শব্দটির দ্বারা মালিকানার ধারণাকে বোঝানো হয়েছে, যথা, 'আমার একটি গাড়ী আছে'। পক্ষান্তরে 'বিয়িং' শব্দটির দ্বারা 'আমি যা' তাই বোঝানো হয়। প্রসংগক্রমে বলা যেতে পারে, মার্সেল 'হ্যাভিং' শব্দটির দ্বারা আজকের দিনের সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা 'অনন্বয়' বা বিচ্ছিন্নতা'-কে সূচিত করেছেন বলে মনে হয়। যদিও তিনি রাজনীতি সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা করেন নি, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও তিনি 'হ্যাভিং' শব্দটির দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর, তা হলো হারানোর ভীতি বা আশংকা। যাদের কিছু আছে তাদেরই তো হারানোর ভয় থাকে; কিছু না থাকলে হারানোর ভয়ও থাকে না। তাঁর এই বক্তব্য যেন মার্কসের '১৮৪৪-এর ইকনমিক অ্যান্ড ফিলসফিক এসেজ'-এর অনেক উদ্ধৃতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মার্সেলের দর্শনে 'অংশগ্রহণ' ( participation ) শব্দটিরও একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। তাঁর মতে, আমি আমার অস্তিত্ব এবং অন্যান্য মানুষের অস্তিত্ব, এমন কি বস্তুরও অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। এগুলি আমার কাছে 'উপস্থাপিত' হয় না, এগুলিতে আমি 'অংশগ্রহণ' করি, 'একাত্মতা' অনুভব করি। সংবেদনে আমি বস্তুর সংগে অংশগ্রহণ করি; আমার দেহ এবং অন্যান্য দেহের সংগেও আমি অংশগ্রহণ করি। আমার দেহ থেকে আমি স্বাধীন নই, আমি ও আমার দেহ অভিন্নও নয়। দেহের মাধ্যমেই আমি জগতে ক্রিয়া করি এবং দেহের মাধ্যমেই আমার চারপাশের জগতের সংগে অনুভূতিময় এক সম্পর্কে সম্পর্কিত হই।

মার্সেলের দর্শন অনুধাবন করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা। মানুষকে, বিশেষ করে দার্শনিককে, তিনি 'পথিক' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন; তবে এ 'পথিক' অপরিচিত জগতের পথিক নয়। বহির্জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মার্সেলের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, আমি কী করে জগতের সংগে সম্বন্ধযুক্ত? —এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মার্সেল একটি খ্রীস্টীয় ধারণার সাহায্য নিয়েছেন। ঐ ধারণাটিকে ইংরেজিতে 'ইনকারনেসন' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষের স্বরূপকে এবং ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে সত্তার স্বরূপকে

স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্যই খ্রীস্টীয় ঐ ধারণাটিকে ব্যবহার করা হয়। মানুষ ও জগতের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাকে বোঝাবার জন্যই মার্সেল ঐ শব্দটির অবতারণা করেছেন। মানুষ দেহের মাধ্যমেই নিজেকে মূর্ত করে তোলে, দেহী নাম ধারণ করে। দেহের মধ্যেই তার স্থিতি। দেহের জন্যই মানুষ অস্তিত্বশীল ঐতিহাসিক সত্তা। দেহময় সত্তার তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান মার্সেলের দর্শনে রয়েছে। আমি যদি দেহের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠি, তাহলে জগৎ আমার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে, আর ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের মধ্যে ঈশ্বর মূর্ত হয়ে ওঠেন। এইভাবেই আমি অন্যের সংগে সম্বন্ধযুক্ত হই। জীবন শূন্য জগতে কতকগুলি বার্থ ঘটনার শৃঙ্খল নয়, জীবন হলো একটি আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা, যেখানে আমি একা নই। একা হওয়াই জীবনের একমাত্র দুঃখ। মার্সেলের দর্শনে 'পথিক' এর ধারণা গতিশীল ভাবেই দেশ ও কালের ধারণাকে সূচিত করে। তীর্থযাত্রার যেমন একটি লক্ষ্য থাকে, জীবনেরও তেমন লক্ষ্য আছে। পথিক বর্তমানের সম্মুখীন হয়, অতীতকে গ্রহণ করে এবং তার ভবিষ্যৎকে প্রক্ষেপ করে। একজন নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক হিসাবে মার্সেলের বিশ্বাস ছিল যে, অন্যদের সংগে আমাদের সম্পর্ক এবং ঐশ্বরিক সত্তার সংগে আমাদের সম্পর্ক উভয়ই যীশুখ্রীস্টের দেহধারণের মাধ্যমে প্রকাশিত—যে যীশুখ্রীস্ট ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে অন্যান্য মানুষের সংগে দৈনন্দিন পথপরিক্রমা করেছেন।

মার্সেল-এর মতানুসারে, সাক্ষাৎ অনুভূতির ক্ষমতা মানুষের আছে। এই স্তরেই ঘটে ব্যক্তির চিন্তার জগৎ থেকে সত্তার জগতে উত্তরণ। সত্তাকে, মার্সেলের মতে, বিষয়গত ভাবে ও 'সমস্যা' হিসেবে বিচার করা যায় না। আমার আমিত্বের উপলব্ধি ঘটে অন্তরের গভীরে, সত্তাকে পাওয়া যায় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। খ্রীস্টীয় ধর্মবিজ্ঞানে সত্তা এবং ঈশ্বর অভিন্ন, এবং মার্সেল-এর মতে, তা কোন প্রকারেই 'সমস্যা' নয়, এ হলো 'রহস্য'। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বৌদ্ধিক যুক্তিবিচারের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়— এই তত্ত্বে মার্সেল তাই বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতানুসারে, ঈশ্বর বাইরের কোন সত্তা নন, যাঁর অস্তিত্ব যুক্তিবিচারের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়; বরং তাঁর অস্তিত্ব ব্যক্তির অস্তিত্বের সংগেই ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে আছে। ঈশ্বরকে পাওয়া যায় অংশ-গ্রহণের মাধ্যমে, বিশ্বাসের মাধ্যমে, একাত্মানুভবের মাধ্যমে। আকুলতা, নিষ্ঠা, প্রার্থনা, ভালবাসা, ধ্যান, আন্তরিকতা, অর্থাৎ, এককথায়, আন্তরানুভূতির মাধ্যমেই ঘটে ব্যক্তির সংগে ঈশ্বর তথা পরমসত্তার যোগাযোগ। বিশ্বাসেই রয়েছে ঈশ্বরের অবস্থিতি। কিয়ের্কেগার্দ-এর মতো মার্সেলও 'বিশ্বাস'-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসই আসল কথা। তাই তিনি 'বিশ্বাস'-এ ফিরতে বলেছেন। তাঁর মতে, দার্শনিকের কাজ হলো সকলকে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়া। ঈশ্বরের উপস্থিতির উপলব্ধি অন্তরে হলে পর যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রমাণ করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে, একথা ঠিক যে, একজন ক্যাথলিক হিসেবে মার্সেল বিশ্বাস ও যুক্তি উভয়কেই ঈশ্বরের দান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্বাস, আশা, সহমর্মিতা, ভালবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমেই, মার্সেল-এর মতে, আমরা একে অন্যের জীবনে অংশগ্রহণ করি, অন্যের সংগে একাত্মতা অনুভব করি।

এগুলির সংগে নিউ টেস্টামেন্টের ধারণার সাদৃশ্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'দ্য ফিলসফি অব্ এক্‌জিস্টেনস্', 'বীয়িং অ্যান্ড হ্যাভিং', মিস্ট্রি অব্ বীয়িং', 'হোমো ভিয়েটর', ,মেটাফিজিক্যাল জারনাল' 'ম্যান এ্যাগেন্‌স্ট্ হিউম্যানিটি' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতেও বিষয়বস্তু আলোচনা করতে গিয়ে মার্সেল অনেক জায়গায়ই নিউ টেস্টামেণ্টের সুরে কথা বলেছেন ; অবশ্য তাঁর পক্ষে সেটা খুবই স্বাভাবিক। আর, সেজন্যই তাঁর দর্শনের শেষ কথা আনন্দ ও প্রেম,-উদ্বেগ ও মনস্তাপ নয়।

## এডমুণ্ড হুসার্ল

**ব্যক্তি ও তাঁর সমকাল :**

বিশ শতকের শুরুতে পশ্চিমী দুনিয়ায় যে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব দর্শনজগতে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল মানসঘটনাবাদ বা 'ফেনোমেনোলজি' সেগুলির মধ্যে অন্যতম, আর এর প্রবর্তক হলেন জার্মান দার্শনিক এডমুণ্ড হুসার্ল। মানসঘটনাবাদী আন্দোলনের তিনিই প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র। দর্শন নয়, গণিত নিয়েই হুসার্ল তাঁর জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন, এবং ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। কয়েকবছর তিনি বিখ্যাত গণিতজ্ঞ কার্ল থিওডর ভাইয়ারস্ট্রাস্-এর সহকারী হিসেবে কাজও করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ভিয়েনায় চলে যান এবং ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দার্শনিক ফ্রানজ্ ব্রেনটানোর কাছে দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। তখনই হুসার্ল সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি দর্শনশাস্ত্রের চর্চায়তেই আত্মনিয়োগ করবেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হালে, গ্যয়টিনজেন্ এবং ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অবসর গ্রহণ করার পর বাকী জীবন তিনি ফ্রাইবুর্গেই অতিবাহিত করেন। ইহুদি উত্তরাধিকার বহন করার জন্য জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁকে সামাজিক ও রাজনৈতিক নানারকম চাপ সহ্য করতে হয়েছে।

উনিশ শতকের যুক্তিবাদী অধিবিদ্যা ও বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়েই হুসার্ল মানসঘটনাবাদের প্রবর্তন করেন। গাইগার, রাইনাখ্, শেলার, পেফান্ডের প্রমুখ চিন্তাবিদরা এ ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করেছেন। হুসার্ল যে মানসঘটনা বা 'ফেনোমেনা'-র কথা বলেছেন তা ঠিক কান্টীয় বা হেগেলীয় অর্থে নয়। তিনি পরমসত্তা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের আলোচনা করতে চান নি। তিনি অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন, কী করে আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞান সম্ভব হয়। তাই এক বিশেষ পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন যার ফলে তিনি আবিষ্কার করতে সচেষ্ট ছিলেন কী কী মূল, প্রত্যয়, সামান্য বা সারসত্তা (সারধর্ম) আমাদের জ্ঞানকে সম্ভব করে তোলে। এই মূল প্রত্যয় বা সামান্য চেতনা বা মনের কাছে ঘটনা বা 'ফেনোমেনা' হিসেবে প্রকাশিত হয়। হুসার্ল যে 'ফেনোমেনা'-র আলোচনা করেছেন সেগুলি কোন ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার অবভাস বা আভাসমাত্র নয়। সেগুলি বাস্তব ; চেতনার নিকট প্রকাশিত, চেতনার দ্বারা সৃষ্ট নয়। হুসার্ল-এর মানসঘটনাবাদ যুগপৎ একটি পদ্ধতি ও দর্শন। বিবিধ দার্শনিক মতবাদের অন্যতম রূপে এটি উপস্থাপিত হয় নি। এর দাবী হচ্ছে, এটিই সমস্ত প্রায়োগিক বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ এক অদ্বিতীয় জ্ঞানমূলান্বেষী বৈজ্ঞানিক দর্শন। হুসার্ল বলেছেন, এই অতিবিজ্ঞান দেবরাজ জুপিটারের মস্তক থেকে নির্গত পূর্ণকান্তি মিনার্ভার মতো তাঁর মস্তক থেকে নির্গত হয় নি। দেকার্তের যুগ থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য দর্শনের যতিহীন পরিক্রমা এর অভ্যুদয়ের সূচনা করেছে।

প্রমাপদ্ধতি হিসেবে মানসঘটনাবাদের অংকুর নিহিত ছিল উনিশ শতকের নানা দার্শনিকদের রচনায়, বিশেষ করে ব্রেনটানো ও মাইনঙ-এর রচনায়। হুসার্ল-এর ওপর প্লেটো, দেকার্ত এবং কান্টের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। গণিতশাস্ত্রের আবশ্যিক

সত্যতার দ্বারা হুসার্ল প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং দর্শনের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত প্রত্যয় কীভাবে লাভ করা যায় তার অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি দর্শনকে কতকগুলি সম্ভাব্য কাল্পনিক মতবাদের ক্ষেত্র না করে একটি সুকঠোর বিজ্ঞানরূপে ( Rigorous science ) প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ব্রেনটানোর অনুপ্রেরণায় হুসার্ল গণিতের দর্শন সংক্রান্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করেন এবং ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে 'ফিলসফি অব এরিথমেটিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে গণিতজ্ঞ গট্‌লব্ ফ্রেগে হুসার্লের সমালোচনা করেন। ফ্রেগের এই সমালোচনার জন্য হুসার্ল পরবর্তীকালে তাঁর নিজ মতবাদ পরিবর্তিত করেন এবং সকৃতজ্ঞচিত্তে ফ্রেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। ডিলথের ইতিহাসবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন হুসার্ল। 'প্রলেগমেনা টু পিওর লজিক' গ্রন্থে হুসার্ল ব্রাডলির মতোই মিলের নিন্দায় সরব হয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আইডিয়াজ'-এ হুসার্ল হিউমের প্রতি গোড়ায় খানিকটা প্রীতি দেখালেও হিউমের সমালোচনায় তিনি ছিলেন মুখর। আপেক্ষিকবাদ, মনোবৈজ্ঞানিকতাবাদ, সংশয়বাদ ও প্রকৃতিবাদ সম্বন্ধেও তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন বিস্তর এবং সেগুলি স্পষ্টই নির্দেশ করে যে, অপরিবর্তনীয় চরমসত্য লাভই ছিল হুসার্লের মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠার বাসনা নিয়ে তিনি দর্শনজগতে প্রবেশ করেন নি, খোলা মন নিয়েই তিনি যাত্রা শুরু করেছেন। হুসার্ল-এর পর মানসঘটনাবাদের অনেক পারিবর্তন ঘটেছে। মার্টিন হাইডেগার, জাঁ-পল সার্ত্র্, মরিস মার্লো পঁতি প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌রা মানস ঘটনাবাদের দ্বারা যেমন প্রভাবিত, তেমনি অস্তিবাদের প্রতিও অনুরাগী। তাঁদের হাতে মানসঘটনাবাদের রূপান্তর ঘটেছে নানাভাবে নানা সময়ে। হুসার্ল-এর মানসঘটনাবাদ থেকে তাঁরা অনেক দূরে সরে এসেছেন এবং এর ফলে আজকের দিনে মানসঘটনাবাদের কোন একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ।

**মানসঘটনাবাদের উৎপত্তির পটভূমিকা :**

মানসঘটনাবাদ বা ফেনোমেনোলজি দার্শনিক চিন্তার একটি সাম্প্রতিক ধারা। এই ধারা সাধারণভাবে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্লেষণরীতি প্রকাশ করে। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্লেষণরীতি নীতিগতভাবে কিছু দার্শনিক গ্রহণ করেছেন, অবশ্য বিশ্লেষণের বিশদ বৈশিষ্ট্য এবং নিজ নিজ বিশেষ আগ্রহের দিক থেকে এঁদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। দার্শনিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানসঘটনাবাদ একটি নতুন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রধান প্রধান প্রাচীন ধারাগুলি থেকে মানসঘটনাবাদী ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, পার্থক্য একেবারে আমূল। মানসঘটনাবাদী ধারার সূত্রপাতকারী ও মূল ব্যাখ্যাকার হুসার্ল ব্রেনটানোর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রেনটানো বিষয়মুখিনতার বা আভিমুখ্যতার ( Intentionality ) ধারণার ওপর ভিত্তি করে বর্ণনামূলক মনোবিদ্যার একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনাকে হুসার্ল মানস-ঘটনাবাদের উৎপত্তি বলে নির্দেশ করেছেন। এই পরিকল্পনায় ব্রেনটানো বলেছেন যে, দার্শনিকের মূল কাজ হলো মানস ঘটনার বর্ণনা, ভৌত ঘটনার নয়; আর, মানস ঘটনা সমূহের বৈশিষ্ট্য হলো তাদের আভিমুখ্যতা বা বস্তুনির্দেশ। হুসার্ল

মানস এবং ভৌত ঘটনার এই পার্থক্য বা বিরোধ স্বীকার করেন নি। তাঁর মতানুসারে, একটি মানসিক ক্রিয়া এবং তার নির্দেশিত বিষয় গঠনগতভাবে সমান্তরাল। অতএব, উভয়েই সমভাবে এবং একত্রে দার্শনিকের আলোচ্য বিষয়। দর্শনকে একটি সুকঠোর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে এই দাবী ঘোষণা করেছিলেন হুসার্ল। এই সুকঠোর বিজ্ঞানের ভিত্তি হবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নীতিসমূহ, আর এই বিজ্ঞান হবে সার্বিকভাবে বৈধ, এবং স্বতঃপ্রতীত। সমসাময়িক দর্শনের কয়েকজন চিন্তাবিদ্ হুসার্ল কর্তৃক নির্দেশিত দার্শনিক চিন্তাধারার অনুসরণ করেছেন; বিশেষত তাঁরা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন হুসার্ল-এর দৃষ্টিভংগী। হুসার্ল-এর তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত-সমূহকে তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেন নি। তাই আমরা দেখি মানসঘটনাবাদী দর্শনধারার বিস্তৃত পরিধির মধ্যে রয়েছেন নানা দার্শনিক। এঁদের মধ্যে রয়েছেন হাইডেগার, সার্ত্র্, মার্লো পঁতি, ম্যাক্স সেলার প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থায় এবং নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী ও দার্শনিক লক্ষ্য অনুযায়ী মানসঘটনাবাদী পদ্ধতিকে নিজ নিজ আধিবিদ্যক চিন্তাবিন্যাসের দিকে বিকশিত করেছেন।

একথা সত্য যে, সাম্প্রতিক দার্শনিক চিন্তাধারায় উদ্ভূত নব-অন্বেষণের দৃষ্টিভঙ্গী মানসঘটনাবাদে প্রকাশিত হয়েছে, আর এই দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ঘটেছে একদিকে বিমূর্ত আধিবিদ্যক চিন্তা থেকে মোহমুক্তির ফলে এবং অপরদিকে উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক জড়বাদের প্রভাবের ফলে। হেগেলীয় দর্শনের প্রভাবের প্রতি হুসার্ল সহানুভূতিশীল ছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে হুসার্ল গণিতের খুব নিষ্ঠাবান ছাত্র ছিলেন; দর্শনে তাঁর আগ্রহ এসেছে মূলতঃ গণিতের মাধ্যমে যুক্তি বিজ্ঞানের পথ ধরে, আর কিছুটা মনোবিজ্ঞানের পথ ধরে।

হুসার্ল-এর দর্শনের ওপর গাণিতিক বিজ্ঞানের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি দেকার্তের মতো হুসার্লও অন্ততঃ নিশ্চয়তার দিক থেকে দর্শনকে গণিতের আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। দর্শনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধন করে পরিশুদ্ধ এবং সুকঠোর বিজ্ঞানরূপে দর্শনকে প্রতিষ্ঠার যে কথা হুসার্ল বলেছেন তা মূলগতভাবে কার্তেজীয়। হুসার্লীয় প্রতিভার ওপর মূল ইউরোপ খণ্ডে উনিশ শতকী প্রত্যক্ষবাদের এবং ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাব মোটেই নগণ্য নয়। উনিশ শতকের জার্মান প্রত্যক্ষবাবাদী মাখ্ এবং এ্যাভেনেরিয়াসের চিন্তার মধ্যে হুসার্ল মানসঘটনাবাদী চিন্তার সুপ্ত রূপ আবিষ্কার করেছিলেন। ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদের কথা বলতে গেলে হিউমের সংগে হুসার্লের নিবিড় সম্পর্কের কথা এসে পড়ে। অবশ্য হুসার্ল হিউমের তত্ত্বের তীব্র সমালোচনাও করেছেন। হিউমের দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশকে হুসার্ল বলেছেন, 'সংবেদনবাদ থেকে কল্পনান্বিত জ্ঞানতত্ত্বে বিকাশ', আর এই বিকাশ সমস্ত বিষয়গততার প্রকাশসমূহকে কল্পনামাত্রে পর্যবসিত করার চেষ্টা করেছে। হুসার্লের মতে, হিউমের দর্শন সমস্ত বিষয়গত জ্ঞানের নিঃস্বতাকে নির্দেশ করে। হিউমের মতের মধ্যে রয়েছে আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধ, কারণ, এই মতবাদ সমস্ত প্রকার তথ্যবিষয়ক বিজ্ঞানকে আক্রমণ করেছে, অথচ নিজেই শেষ পর্যন্ত সার্বিক মনোবিজ্ঞানের সংগে অভিন্ন হয়ে পড়েছে, আর সার্বিক মনোবিজ্ঞান একটি তথ্যবিষয়ক বিজ্ঞান। হিউমের মতের ত্রুটি উল্লেখ করলেও হুসার্ল

দেখেছেন যে, হিউমের সংশয়বাদে রয়েছে নির্বিচারবাদী বিষয়গত মতবাদের ভিত্তি-সমূহকে সম্পূর্ণরূপে পরিহারের প্রচেষ্টা। হিউমের সংবেদনমূলক বিষয়গত মতবাদ জ্ঞাত-জগৎকে সংবেদন এবং ধারণায় পর্যবসিত করে এক বিশুদ্ধ অন্তঃবর্তী দর্শনের পথ প্রস্তুত করেছে। এই পটভূমিকায় বিচার করলে বলা যায় যে, হিউমের জ্ঞানতত্ত্ব অন্ততঃ সুপ্তভাবে যার ইংগিত দেয় এবং যে তত্ত্বকে গ্রহণ করে তা হলো অন্তঃবর্তী চেতনা, এক প্রকৃত স্বজ্ঞামুখী দর্শন। এইরূপ দর্শনের প্রচার করার চেষ্টা করে মানসঘটনাবাদ। অবশ্য মানসঘটনাবাদী দর্শনের বিশিষ্ট ধর্ম এবং দৃষ্টিভংগী গঠনে গভীরতর এবং অধিকতর স্থায়ী প্রভাব পড়ছে কাণ্টীয় দর্শনের। বিমূর্ত অধিবিদ্যার আলোচনায় আত্মনিয়োগ না করে, সত্তার নয়, বরং জ্ঞানের পূর্বস্বীকৃতি এবং শর্তের অনুসন্ধানে কাণ্টীয় আদর্শের দ্বারাই হুসার্ল উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। হুসার্লের কাছে কাণ্টীয় দর্শনই হলো সুকঠোর বিজ্ঞানরূপে একটি প্রকৃত সার্বিক এবং পূর্বশর্ত অনুসন্ধানকারী দর্শন রচনার প্রথম কার্যকরী প্রচেষ্টা। তাহলেও হুসার্ল কাণ্টের সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। তাঁর মতে, প্রত্যক্ষপূর্ব বা পূর্বতঃসিদ্ধ নীতি সমূহের কাণ্টীয় তত্ত্ব নৃতাত্ত্বিকতা এবং আপেক্ষিকতা দোষে দুষ্ট। এমন কি, যখন কাণ্ট পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের শর্তহীন আবশ্যিকতা এবং সার্বিকতার কথা বলেন তখনও তিনি মানুষের মনের সার্বিক গঠনের দিকেই নির্দেশ করেন। হুসার্লের মতে, হিউম এবং কাণ্ট উভয়েই বুদ্ধি বা বিচারশক্তিকে একটি তথ্য বা ঘটনামাত্রে পর্যবসিত করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যানুযায়ী বুদ্ধি বা বিচারশক্তি হলো মনুষ্যপ্রকৃতির একটি তথ্য বা ঘটনা। এর ফলে তাঁরা যথার্থ বুদ্ধি বা বিচারশক্তির সন্ধান পান নি।

পূর্বতন দর্শনের প্রভাব সত্ত্বেও মানসঘটনাবাদ স্বাধীনভাবে স্বয়ং-বিকশিত একটি দার্শনিক আন্দোলন বা চিন্তাধারা। এর উৎপত্তির ভিত্তিতে রয়েছে নিজেরই বিশিষ্ট পদ্ধতির যৌক্তিক প্রয়োজন। কার্তেজীয় বুদ্ধিবাদ থেকে ইংগিত গ্রহণ করে হুসার্ল দর্শনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দর্শনকে সম্পূর্ণরূপে সাক্ষাৎ নিদর্শনের ওপর নির্ভর করতে হবে। এই সাক্ষাৎ নিদর্শন বলতে বোঝায় তাই যা অনুব্যবসায়ী চেতনার কাছে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপিত। কারণ, কেবলমাত্র এমন দর্শনই জ্ঞানের সেই নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে যা যথার্থ বিজ্ঞানের থাকা উচিত। তাই মানসঘটনাবাদের লক্ষ্য হলো অভিজ্ঞতার পূর্ণ পুঙ্খাপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং সংগে সংগে আধিবিদ্যক পূর্বস্বীকৃতি এবং বিমূর্ত প্রত্যয় গঠন থেকে মুক্তি। এই দৃষ্টিভংগী থেকে দেখলে দর্শন সঠিক অর্থে একটি প্রণালী বা সম্প্রদায় হতে পারে না। দর্শন কেবলমাত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট পদ্ধতিভিত্তিক হতে পারে। কারণ, এক্ষেত্রে তার মধ্যে থাকবে উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতিগত ঐক্য।

তাহলে এখন আমরা মানসঘটনাবাদের বর্ণনায় বলতে পারি যে, এটি হলো চেতনা-বিজ্ঞান এবং এই নতুন শাস্ত্রটিকে মনোবিদ্যার সংগে অভিন্ন বলে মনে করলে ভুল হবে। মনোবিদ্যা হলো একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কিন্তু মানসঘটনাবাদ হলো ভিন্নতর বিজ্ঞান। মানসঘটনাবাদের লক্ষ্য হলো জ্ঞানের ভিত্তি বা পূর্বস্বীকৃতি-সমূহের অনুসন্ধান। জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার শর্ত অনুসন্ধানই হলো মানসঘটনাবাদের উদ্দেশ্য।

**দেকার্ত এবং হুসার্ল ঃ**

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে চিন্তাভাবনার বিবর্তনের ধারায় এমন মুহূর্ত এসেছে যখন পূর্বতন দর্শনের গোটা কাঠামোটাই এক আঘাতে বাতিল হয়ে গেছে। প্রাচীন গ্রীক দর্শন এবং মধ্যযুগীয় দর্শনের বিরুদ্ধে এইরকম আঘাত হেনেছিলেন দেকার্ত। অভিজ্ঞতার দর্শনের বিষয়ীকরণের জন্য সুনিশ্চিত ভিত্তিরূপে বিষয়ীগততার আবিষ্কার করেছিলেন দেকার্ত। দেকার্তের আমূল সংশয়ের পদ্ধতিকে মানসঘটনাবাদী পদ্ধতির পূর্ব সোপান বলা যেতে পারে, যদিও মানসঘটনাবাদ কোনক্রমেই কার্তেজীয় অধি-বিদ্যাকে সমর্থন করে না। মানসঘটনাবাদ দেহ-মনের যে কোন দ্বৈতবাদকে বর্জন করে এবং জগতের একটি সক্রিয় ঐক্যবদ্ধ জীবরূপে মানুষের ব্যবহারের ঐক্যবদ্ধ বৈশিষ্ট্যের ওপর মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে। মানসঘটনাবাদী ও পদ্ধতি রচনাকারী দেকার্ত গণিতজ্ঞ ও অধিবিদ্যাবিদ্ দেকার্ত অপেক্ষা বেশী অগ্রবর্তী, আর দেকার্ত ও হুসার্লের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য হলো এই যে, দেকার্তের মতোই হুসার্ল-ও একটি বাস্তব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। তবে, দেকার্ত অপেক্ষা হুসার্ল সময়-ঐতিহাসিকতা এবং জীবন-জগতের আন্তর-বিষয়ীগত গঠন সম্পর্কে বেশী সচেতন ছিলেন।

মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ পদ্ধতির (Transcendental Reduction) মাধ্যমে হুসার্ল উপনীত হয়েছেন অহং-এর সুনিশ্চিত প্রমাণে। তিনি উপনীত হয়েছেন আত্মার চেতনায় অতীন্দ্রিয় চেতনা কর্তৃক আকাঙ্খিত বিশ্বে। আর, সর্বোপরি তিনি পেয়েছেন সম্পূর্ণ প্রাথমিক এবং সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতা-উর্ধ্ব চেতনার অভিমুখ্যতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দেকার্তের চেতনার মতো এই চেতনা এক চিন্তাশীল সত্তার নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান নয়। এই চেতনা সন্দেহজনক বিশ্বে নিঃসন্দিগ্ধ চিন্তনশীল অহংমাত্র নয়। হুসার্লের ভাষায় এই চেতনা হলো বিশ্বের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী জীবন।

দেকার্ত এবং হুসার্ল উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে, দর্শনের কাজ হলো যথার্থ বিজ্ঞানের চরম ও সুনিশ্চিত ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পটভূমিকা এত ভিন্ন যে, এই সাধারণ অনুসন্ধান এবং এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী নিতান্তই ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়েছে। দেকার্ত বিরোধিতা করেছিলেন স্কলাস্টিক দর্শন এবং নবজাগরণের প্রায়-শেষ স্তরের দর্শনের; অপরপক্ষে, হুসার্ল বিরোধিতা করেছেন আপেক্ষিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যক্ষবাদ ও উনিশ শতকের শেষভাগে নব্য-কান্টীয় মতবাদের। দার্শনিক চরম মতবাদে অভিপ্রায় এই দুই দর্শনের ক্ষেত্রে অভিন্ন নয়, কারণ, বিজ্ঞানের সংকট, ভিত্তির সংকট, যা এই প্রকার দর্শনের উৎস তা কিন্তু দেকার্ত এবং হুসার্লের কাছে একই তাৎপর্য বহন করে আনে না। এক অনিশ্চিত বিজ্ঞান এবং দর্শনের পটভূমিতে দেকার্ত তাঁর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করেছেন আর প্রাথমিক ভাবে তাঁর সংস্কারের লক্ষ্য ছিল একেবারে শূন্য থেকে শুরু করা এবং তারপর বিজ্ঞানের নবরূপ দান। তাঁর চরম দার্শনিক আলোচনার মূল কথা হলো প্রাথমিক সত্য থেকে শুরু করে যথার্থ অহং-এর আবিষ্কার। অপরপক্ষে, হুসার্ল এক সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মধ্যে নিজেকে দেখেছিলেন : সঙ্গে ছিল বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং বিজ্ঞানের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত সমূহ। তাঁর চরম বা আমূল দার্শনিক

পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো ইতিমধ্যে যা আছে এবং সব সময়ই থাকবে তাকে এক নতুন স্তরে অধিকতর মৌলিকরূপে অনুধাবন করা।

আমূল বা চরম দার্শনিক পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার দিক থেকেও দেকার্ত ও হুসার্লের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য বর্তমান। দেকার্ত তাঁর সংশয় পদ্ধতি দিয়ে শুরু করেছেন এবং যা অনিশ্চিত এবং বিচারবিযুক্ত তা বর্জনের দ্বারা পূর্বতন তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছেন : কিন্তু হুসার্লের কাছে বর্জন বা অপসারণের কিছু ছিল না। তাঁর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যা আবশ্যিক তা হলো আমাদের মত বা দৃষ্টিভঙ্গীর যুক্তিসাধন, আমাদের মত থেকে সাসত্তা স্বজ্ঞা ও ভিত্তির বিচ্ছিন্নকরণ। এই ভিত্তি হবে সেই বাস্তবতার ভিত্তি যা ইতিমধ্যেই আছে এবং থাকবে। দেকার্ত এবং হুসার্ল উভয়ের ক্ষেত্রেই দার্শনিক চিন্তার আমূল সংস্কারের রূপ হলো যা স্বতঃসিদ্ধ বা স্বতঃপ্রতীত তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দুজনের কাছেই সাক্ষ্য বা প্রমাণ চেতনার গঠন এবং যুক্তি উভয়ই, আর সংগ্রামে প্রয়োজন আছে কারণ, সাক্ষ্য বা প্রমাণ তাৎক্ষণিকভাবে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সমর্থক নয়। এই সাক্ষ্য বা প্রমাণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে চরম বা আমূল সূচনার জন্য নতুন করে সাক্ষ্য বা প্রমাণের অনুধাবন করতে হবে। তাহলেও চরম অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেকার্ত এবং হুসার্লের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দেকার্ত তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা যা লাভ করেছেন তা হলো এক অধিবিদ্যা। কিন্তু হুসার্ল পেয়েছেন অভিজ্ঞতা-উত্তর বা অতীন্দ্রিয় সীমিতকরণ। দেকার্ত ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়গত প্রমাণ, এমন কি বুদ্ধির প্রমাণকেও বর্জন করে শেষ পর্যন্ত "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি" এই সুনিশ্চিত সত্যে উপনীত হলেন। কিন্তু হুসার্লীয় পদ্ধতি ভ্রম-প্রত্যক্ষের অপসারণের পদ্ধতি নয়, বরং এর দ্বারা তিনি জগৎ সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাসকে পক্ষপাত-শূন্য করেছেন। এর দ্বারা আমরা সত্তা থেকে আমাদের দূরত্ব রচনা করি। তাঁর পদ্ধতি আমার সংগে অহং-এর সম্বন্ধের কথা বলে না, বরং এক্ষেত্রে জগতের সংগে আমার সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চেতনার গঠন বা কাঠামো সম্পর্কেও দেকার্ত এবং হুসার্ল ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। দেকার্তের মতানুসারে, চিন্তা কেবলমাত্র তার বিষয়ের চেতনা নয়, বরং সবসময়ই তা নিজের সম্পর্কে চেতনা। অপরপক্ষে, হুসার্লের কাছে চেতনা হলো সম্পূর্ণরূপে আভিমুখ্যতা যুক্ত। আভিমুখ্যতার পরিবর্তন ছাড়া ব্যক্তি অহং বা আত্মার চেতনাকে বুঝতে পারে না।

তবে একথাও উল্লেখ করতে হবে যে, দেকার্ত এবং হুসার্ল উভয়ের ক্ষেত্রেই চরম দার্শনিক সত্যের শুরু যখনই হলো তখনই সেই সত্যটি গৌণ হয়ে গেল, আর প্রাথমিক সত্যটি আবশ্যিকতা বা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার ওপর আপতিকতার ছাপ পড়ে গেল। কার্তেজীয় অহং নিজের সীমিত সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল, পরমসত্তা বা অনন্ত ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীলতার কথা এসে পড়ল। অনুরূপভাবে হুসার্লের অতীন্দ্রিয় বা অভিজ্ঞতা-উত্তর অহং ক্রমশঃ উপলব্ধি করল যে, জীবনে জগতের আপতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সে গৌণ। অর্থাৎ, জীবনের জগৎ বা বেঁচে থাকার জগৎই হয়ে উঠল মুখ্য।

হুসার্ল কখনই তাঁর আমূল সূত্রপাতের অনুসন্ধান ক্রিয়ার ছেদ টানেন নি। তাঁর কাছে আমূল ভিত্তির সমস্যাই হলো মূল সমস্যা। তিনি যেন শেষ করার জন্য শুরু করেননি। কিন্তু দেকার্ত শুরু করেছিলেন শেষ করার জন্যই। দেকার্ত অনুসন্ধান করেছিলেন যা ইতিমধ্যে নেই তারই যথার্থ সূচনার, অপরপক্ষে যা ইতিমধ্যেই আছে তার যথার্থ ভিত্তি বা সূচনার অনুসন্ধান করেছেন হুসার্ল। আবার, সময় বা কালের ধারণার ক্ষেত্রেও দেকার্ত এবং হুসার্লের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। দেকার্তের কাছে 'আগে বা পূর্ববর্তী সময়' বলে কিছু নেই, কিন্তু হুসার্লের কাছে 'আগে বা পূর্ববর্তী সময়' বলে কিছু আছে, যার আবরণ উন্মোচন, পুনরাবিষ্কারই হলো সর্বশেষ প্রয়োজন। হুসার্ল তাঁর প্রশ্নকে ক্রমশঃ অতীত এবং ইতিহাসের দিকে ফিরিয়েছেন।

যদিও হুসার্ল নিজে দেকার্তের সংগে তাঁর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও তিনি নিজেকে কার্তেজীয় ধারার মধ্যেই উপস্থাপিত করেছেন এবং যদিও কার্তেজীয় পরিকল্পনাকে দেকার্ত অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্তরূপে বিকাশের চেষ্টা করেছেন, তবু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু সম্পূর্ণ বিরোধী। দেকার্তের দর্শনের চরম পরিণতি হিসেবে হুসার্লের দর্শনে আমরা উপনীত হই না, কারণ, দেকার্তের পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা হুসার্লের অতীন্দ্রিয় বা অভিজ্ঞতার-ঊর্ধ্ব অহং-এ উপনীত হই না।

**মানসঘটনাবাদের স্বরূপ বা প্রকৃতি ঃ**

দার্শনিক আলোচনার একটি সাম্প্রতিক ধারা হিসেবে মানসঘটনাবাদকে 'ফেনোমেনা'র বিজ্ঞানরূপে বর্ণনা করা যায়, আর সাম্প্রতিককালে 'ফেনোমেনোলজি' বা মানসঘটনাবাদ কথাটি ব্যবহার করা হয় মূলতঃ এডমুণ্ড হুসার্ল যে দর্শনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তাকে নির্দেশ করার জন্য। এক্ষেত্রে 'ফেনোমেনা' কথাটি কান্টীয় অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ, এখানে 'ফেনোমেনা' বলতে অবভাস বা বস্তুর প্রতীয়মান সত্তাকে নির্দেশ করা হয় না। এক্ষেত্রে 'ফেনোমেনা' বলতে তাই বোঝায় যা চেতনায় নিজেকে তাৎক্ষণিকরূপে প্রকাশিত করে। এই 'ফেনোমেনা' স্বজ্ঞার দ্বারা জ্ঞাত হয় এবং তা সর্বপ্রকার অনুচিন্তন কিংবা অবধারণের পূর্বগামী। তাহলে এখানকার 'ফেনোমেনা' হলো স্বয়ং-সৎ-বস্তু বা বাস্তবতা। এখানকার বক্তব্য হলো এই যে, যদি কোন বিষয় যথাযথ প্রকারের অভিজ্ঞতায় নিজেকে উপস্থাপিত করতে পারে বা প্রকাশিত করতে পারে, তাহলে তার প্রকৃত সত্তা প্রকাশ না করে সে পারে না। অতএব, 'ফেনোমেনা'-কে বিশুদ্ধ এবং আদর্শ সারধর্ম বলা হয়। এগুলি কেবলমাত্র ভাবজ সত্তা নয়, আবার মানস সত্তাও নয়; এগুলির তাৎপর্য হলো চেতনার ভাবজ আকাঙ্খা বা লক্ষ্য। এই অর্থে 'ফেনোমেনা' বা বিশুদ্ধ সারধর্মই হলো মানস-ঘটনাবাদের বিষয়বস্তু। আবার, যেহেতু এক্ষেত্রে 'ফেনোমেনা' বলতে চেতনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রদত্ত সত্তাকে বোঝায়, সেহেতু 'ফেনোমেনোলজি' হলো ঐ প্রদত্তের বিজ্ঞান। 'ফেনোমেনা' হলো প্রদত্ত, আর সেগুলির মধ্য দিয়েই সারধর্ম প্রকাশিত অতএব, 'ফেনোমেনা'-কে বর্ণনা করার অর্থই হলো 'ফেনোমেনা'-র যা সারধর্ম হয়

তারই বর্ণনা দেওয়া। অতএব, 'ফেনোমেনা' হলো প্রদত্ত, একথা বলার অর্থ হলো সারধর্ম সমূহ প্রদত্ত। এই সারধর্ম সমূহ অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত নয়, স্বজ্ঞায় প্রদত্ত।

মানসঘটনাবাদের আলোচ্য বিষয় হলো শুদ্ধ চেতনা। চেতনাকে মানসক্রিয়ারূপে নয়, বরং বস্তুসমূহ কর্তৃক প্রকাশিত একপ্রকার সত্তারূপেই চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করেন মানসঘটনাবাদী। অতএব, যখন বলা হয় শুদ্ধরূপে চেতনার বিশ্লেষণই হলো মানসঘটনাবাদ, তখন তার অর্থ হলো সত্তার পরিধি বা ক্ষেত্র নিয়েই মানসঘটনাবাদের কাজ। বিশুদ্ধ চেতনার বিশ্লেষণ রূপে মানসঘটনাবাদকে একটি পদ্ধতি এবং একটি দর্শন উভয়রূপেই দেখা যেতে পারে। পদ্ধতি হিসেবে মানসঘটনাবাদ সেই স্তরগুলির নির্দেশ দেয় যেগুলি নিশ্চিতভাবে অনুসরণ করতে হবে বিশুদ্ধ 'ফেনোমেনা'য় উত্তরণের জন্য। এই 'ফেনোমেনা'-র মধ্যেই প্রকাশিত সারধর্ম বা সারসত্তা। আর দর্শন হিসেবে মানসঘটনাবাদ দাবী করে প্রকৃত সত্তার আবশ্যিক এবং মৌলিক জ্ঞান দান। কারণ, বুদ্ধি বা যুক্তি তার বিষয়ের সারধর্মরূপে তাকে বুঝে নিয়েছে। আপতিক অস্তিত্ব তার পরিবর্তন সাধন করতে পারে না।

মানসঘটনাবাদকে 'বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন'-রূপে বর্ণনা করা যায়। এই প্রত্যাবর্তন কোন অলীক মানসকল্পনার দিকে নয়, কারণ, এক্ষেত্রে 'বস্তু' হলো বিশুদ্ধ চেতনার সাক্ষাৎ বিষয়। তাই বলা হয়, মানসঘটনাবাদের আলোচ্য বিষয় হলো আভিমুখ্যতাযুক্ত। হুসার্লের মতে, চেতনার ক্রিয়া এবং তার বিষয় অবিচ্ছেদ্য। এগুলি একই জিনিসের বিষয়িগত এবং বিষয়গত দিক। অতএব, কোন চেতনক্রিয়ার সারধর্মকে জানার অর্থ হলো ঐ চেতনার বিষয়ের সারধর্মকে জানা, আর এটাই হলো ঐ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। হুসার্লের কাছে চেতনার বিষয় হলো ভাবাত্মক বিষয়। তাই তিনি প্রকৃতিবাদ এবং মনস্তাত্ত্বিকতাবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্বোক্ত মতবাদগুলির সমালোচনা করে হুসার্ল ভাবাত্মক বিষয়ের স্থান সংরক্ষিত করেছেন, আর এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য হলো অস্তিত্বের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া। ভাবাত্মক বিষয়ের অস্তিত্ব নেই। যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তাই আপতিক। ভাবাত্মক বিষয়সমূহ যেহেতু অস্তিত্বশীল নয়, সেহেতু সেগুলি আপতিকও নয়। এগুলি হলো আবশ্যিক ও মৌলিক। অতএব, ভাবাত্মক বিষয়সমূহ সারধর্মেরই প্রকাশক। মানসঘটনাবাদ আসলে হলো সারসত্তাবাদ। এক্ষেত্রে চেতনার আলোচনা এবং সারসত্তার তত্ত্ব একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। কারণ, সারধর্মসমূহ চেতনায় উপস্থাপিত, আর এই চেতনা হলো ক্রিয়াবিশেষ—এই চেতনা হলো আভিমুখ্যতাযুক্ত। চেতনা সব সময় 'কোন কিছু' অভিমুখী। চেতনা কখনও বিষয়হীন অবস্থায় থাকতে পারে না। চেতনা আছে, অথচ কোন কিছু সম্বন্ধে এই চেতনা নয়—এরকম হতে পারে না। চেতনার বিষয়বস্তু অবাস্তব হতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তু একটা থাকবেই। যখনই চেতনা আছে তখনই তা কোন কিছুর অভিমুখে, কোন কিছুর দিকে। চেতনার একদিকে আছে বিষয়ী বা অহং, আর অন্যদিকে আছে বিষয় বা বস্তু। নিরাশ্রয়া, নির্বিষয়া চেতনার অস্তিত্ব হুসার্ল স্বীকার করেন নি।

যে মূল প্রত্যয় বা সারসত্তা সমূহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা মানসঘটনাবাদের

কাজ সেগুলি শুদ্ধ চেতনায় উপস্থাপিত। কিন্তু তাই বলে সেগুলি ব্যক্তিমন বা চেতনার দ্বারা সৃষ্ট নয়। সেগুলি সার্বিক এবং স্বতঃপ্রদত্ত। চেতনা এগুলির স্বরূপ নির্ণয় করতে পারে। কারণ চেতনা দেশ কালের অধীন নয়। এই সত্তাগুলি অধিবিদ্যার আলোচ্য কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা নয়, সেগুলি জ্ঞানবিদ্যার প্রধান এবং প্রথম সোপান। আমাদের বিবিধ অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান কিভাবে সম্ভব হয় তা এদের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায়। এই বিশেষ পদ্ধতিতে স্বজ্ঞা বা সাক্ষাৎ অনুভবের সাহায্যে এগুলিকে নিরূপণ করা যায়। এগুলি কোন প্রাকৃত বস্তু নয়। তথাকথিত বাহ্য প্রাকৃত বস্তু থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে এগুলিকে জানতে হবে। সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর বাস্তবতা আছে কিনা তা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন নেই। যেমন, আমরা কোন একটি জিনিষ প্রত্যক্ষ করছি; হয়তো আমরা যা দেখছি তা ভুল, মানসঘটনাবাদী তা নিয়ে চিন্তাকুল নন। তিনি আলোচনা করবেন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুরূপে জ্ঞান হবার জন্য বিষয়কে কি হতে হবে? যেমন, এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, এই বিষয়ের বিস্তৃতি, অধিকরণ বা আশ্রয় এবং রঙ ইত্যাদি থাকতে হবে। মানসঘটনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে অপর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক করে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, আমরা একটি পাহাড় দেখছি। এক্ষেত্রে মানসঘটনাবাদী পাহাড়ের বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলবেন না। তিনি শুধু বর্ণনা করবেন পাহাড় সম্বন্ধে আমাদের চেতনা কেমন করে সম্ভব হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক। প্রত্যক্ষবাদী বলবেন যে, বাহ্যজগতে পাহাড় আছে, এবং পাহাড়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগ হওয়ার ফলে যে সকল ইন্দ্রিয়-উপাত্ত প্রত্যক্ষকারী পেয়েছে তারই ফলে পাহাড়ের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়েছে। এরকম ব্যাখ্যায় মানসঘটনাবাদীর কোন আগ্রহ নেই। ভূবিজ্ঞানী পাহাড়ের যে বিশ্লেষণ করবেন সেইরূপ বিশ্লেষণও মানসঘটনাবাদীর কাজ নয়। তেমনি আবার মনোবিদ আলোচনা করবেন একটি মানসকার্য হিসেবে পাহাড়ের প্রত্যক্ষটি কি ভাবে সাধিত হল? কিন্তু মানসিক ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করা মানসঘটনাবাদীর কাজ নয়। আবার অধিবিদ্যাবিদের ন্যায় কোন তাত্ত্বিক মতবাদ গঠনেও মানসঘটনাবাদী উৎসাহী নন। মানসঘটনাবাদীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো শুদ্ধ চিন্তনের মাধ্যমে জ্ঞানের ভিত্তি আবিষ্কার করা এবং এর দ্বারা সকল প্রকার অভিজ্ঞতারই মূল গঠনভঙ্গিমা স্থির করা। অতএব, মানসঘটনাবাদী যা রচনা করতে চেয়েছেন তা হলো জ্ঞানের সমালোচনা বিদ্যা। জ্ঞানের সমালোচনা করে মানসঘটনাবাদী বলেছেন যে, সকল জ্ঞানের মূলে আছে কতকগুলি সারসত্তা বা মূল প্রত্যয়, যেগুলিকে এক বিশেষ প্রকারের স্বজ্ঞা বা অন্তঃস্বজ্ঞা দ্বারা জানা যায়।

সুকঠোর বা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিজ্ঞানরূপে (Rigorous Science) দর্শনকে প্রতিষ্ঠার জন্য হুসার্ল যে পদ্ধতি রচনা করেছেন, মানসঘটনাবাদকে মূলতঃ সেই পদ্ধতিরূপেই দেখা যায়, যদিও অবশ্য মানসঘটনাবাদ নিছক পদ্ধতি মাত্র নয়। মানসঘটনাবাদী পদ্ধতিকে বলা হয় মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ বা কেন্দ্রীকরণ। এই পদ্ধতি হলো স্বেচ্ছামূলক সন্দেহের দৃষ্টিভঙ্গী। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী কার্তেজীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক। মানসঘটনাবাদে সন্দেহ বা সংশয় আবশ্যিক ভাবে কোন সন্দেহাতীত আধিবিদ্যক

সত্যের তত্ত্ব বা প্রণালীতে আমাদের উপনীত করে না। বরং এই সন্দেহ দান করবে পদ্ধতিগত উপায় বা অস্ত্র যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট উপাদানের সম্ভাব্য পরিধিকে অনুচিন্তনের আলোকের কেন্দ্রে আনা যাবে। মানসঘটনাবাদ হলো একটি জ্ঞানের পদ্ধতি, যার প্রতিপাদ্য হলো বিষয়ের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ বা আলোচনা, আর এই অর্থে এই পদ্ধতির ভিত্তি হলো স্বজ্ঞা, এবং এই স্বজ্ঞা প্রদত্তের অভিমুখী। এই পদ্ধতির প্রধান নিয়মটিকে যে নীতিতে প্রকাশ করা যায় তা হলো, "বস্তু সমূহের নিজের দিকে ফিরে যাও"। এক্ষেত্রে বস্তু বলতে 'প্রদত্তকেই' (given) বুঝতে হবে। আর প্রদত্তের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রয়োজন দ্বিমুখী বিচ্ছিন্নকরণ বা বন্ধনীভুক্তি।

মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ বা কেন্দ্রীকরণের প্রথম পর্যায়ে যা কিছু বিষয়ীগত, ব্যক্তিগত, মনস্তত্ত্বগত তাকেই বিচ্ছিন্ন করতে হবে, আর তাহলে প্রয়োজন শুদ্ধ বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী। তারপর প্রয়োজন যা কিছু তত্ত্বগত, যেমন, প্রকল্প, প্রমাণ ইত্যাদি সবকিছুর বিচ্ছিন্নকরণ। তা ছাড়া সমস্তপ্রকার পূর্বতন ঐতিহ্য বা দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ। অতএব মানসঘটনাবদী সীমিতকরণ বা কেন্দ্রীকরণ একথা ইঙ্গিত করে যে, মানসঘটনাবাদ হলো "পূর্বস্বীকৃত তত্ত্ব নিরপেক্ষ (Pre-suppositionless)"। আর যেহেতু এটি পূর্বস্বীকৃত তত্ত্ব নিরপেক্ষ, সেহেতু এটি অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান নয়। এটি পূর্বতসিদ্ধ বিজ্ঞান। হুসার্লের ভাষায়, মানসঘটনাবাদ হলো যথার্থ বিজ্ঞান। একটি স্বনিষ্ঠ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিজ্ঞান।

**পূর্বস্বীকৃতিবিহীন দর্শন হিসেবে মানসঘটনাবাদ ঃ**

সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য দর্শনের ধারায় মানসঘটনাবাদ বা ফেনোমেনোলজি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দর্শন। আর ফেনোমেনোলজি নামটি ব্যবহার করা হয় এডমুণ্ড হুসার্ল যে দর্শনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তাকে নির্দেশ করার জন্য। হুসার্ল দর্শনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা সুকঠোর বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। হুসার্লের মত অনুযায়ী বিজ্ঞানের সংকট বলতে বোঝায় বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অস্পষ্টীকৃত অবস্থা। আর অস্পষ্টীকৃত বিজ্ঞান বলতে বোঝায় সেই বিজ্ঞান যা নিজের অর্থের আধিবিদ্যক এবং জ্ঞানীয় ভিত্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। অনেকের কাছে মানসঘটনাবাদ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলে মনে হয়েছে, এর কারণ হলো তাঁরা প্রকৃতিবাদের অধিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য রচনায় ব্যর্থ হয়েছেন। মানসঘটনাবাদ বিজ্ঞানকে অনুপ্রাণিত করে। এর কাজ হলো বিজ্ঞানের পরিধিকে অতিক্রম করে তার অভিজ্ঞতামূলক ভিত্তিতে উপনীত হওয়া, তার ভিত্তিভূমিতে চলে যাওয়া, যে ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায় বাস্তব তত্ত্বের সংগে অধিকতর মৌলিক অর্থ-নির্ধারণকারী সংস্পর্শের মাধ্যমে। হুসার্ল দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের জগৎ প্রকৃতপক্ষে তার নিজের দাবীর জগৎ নয়, এটা গৌণভাবে প্রাপ্ত সংগঠনমাত্র, এই বিমূর্তকরণ জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতার প্রাথমিক জগৎ থেকে বহুদূরে অপসারিত। হুসার্লের কাছে দর্শন একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিজ্ঞান এই অর্থে যে, তা হলো সচেতন অভিজ্ঞতার সর্বাপেক্ষা চরম, মৌলিক, আদিম এবং মুখ্য ও প্রাথমিক নিদর্শনের অনুসন্ধান। বিজ্ঞান এবং লৌকিক জ্ঞানের সংগঠনের অতলে অভিজ্ঞতায় তাদের ভিত্তি-

ভূমিতে চলে যায় দর্শন। সমস্ত বিশেষ বিজ্ঞান এবং আমরা দৈনন্দিন স্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় যা কিছুকে সত্য বলে ধরে নিই সেগুলির আলোচনা করে দর্শন। আর এক্ষেত্রেই হুসার্ল যে দর্শনের জনক সেই মানসঘটনাবাদের পূর্বস্বীকৃতিবিহীনতার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্বস্বীকৃতিবিহীন দর্শন বলতে সেই দর্শন বোঝায় যা উপনীত হয় এমন বিষয়ে যা অভিজ্ঞতায় সর্বাপেক্ষা চরম, প্রাথমিক এবং সবচেয়ে বেশী মৌলিক।

হুসার্লীয় মানসঘটনাবাদ যে প্রকার দর্শনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে তাকে চরম বা আমূল প্রত্যক্ষবাদ বলা যেতে পারে। লক্ থেকে রাসেল পর্যন্ত যে প্রচলিত প্রত্যক্ষবাদের সন্ধান আমরা পাই তার ত্রুটি হলো, তার যৌক্তিক ভিত্তিহীন এবং অস্পষ্টীকৃত আধিবিদ্যক পূর্বস্বীকৃতিসমূহ, প্রচ্ছন্ন দেহ-মনের দ্বৈতবাদ, চেতনার আধার হিসেবে মন সম্পর্কীয় মতবাদ এবং বহির্জগৎ থেকে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন, সরল আনবিক সংবেদনসমূহের নিষ্ক্রিয় গ্রাহক হিসেবে জ্ঞানের বিষয়ী সম্পর্কীয় মতবাদ। হুসার্লের মতে, এই ধরনের প্রত্যক্ষবাদকে খুবই ন্যূনতম অর্থে প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়। কারণ, তাদের আধিবিদ্যক পূর্বস্বীকৃতি হলো এই যে, দর্শন বিষয় সমূহের, সত্তাসমূহের বিজ্ঞান, আর অভিজ্ঞতার বিষয় নিজেই অন্যান্য বিষয়ের মতো একটি বিষয়। এই প্রকারের অভিজ্ঞতাবাদের পরিণতি হলো এক প্রকারের সরল, নির্বিচার, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ। মানসঘটনাবাদ বিষয়ের বিজ্ঞান নয়, বিষয়ীর বিজ্ঞানও নয়, এটি অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান। এর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার বিষয় নয়, অথবা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার বিষয়ীও নয়। মানসঘটনাবাদ মনোযোগ নিবদ্ধ করে সেই বিন্দুতে যেখানে সত্তা এবং চেতনা মিলিত হয়। তাই বলা হয়, মানসঘটনাবাদ হলো অভিমুখ্যতা যুক্তরূপে চেতনার আলোচনা, যে চেতনা বস্তুর অভিমুখী, যে চেতনা অভিমুখ্যতার দ্বারা সংগঠিত জগতে স্থিত বা জীবন্ত। এক্ষেত্রে বিষয় এবং বিষয়ীকে অভিজ্ঞতার প্রতিটি স্তরে তাদের সুকঠোর পরস্পর সাপেক্ষতায় আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা অতীন্দ্রিয় বা অতিক্রমণকারী এই অর্থে যে, এর লক্ষ্য হলো চেতনারূপে চেতনার, অভিজ্ঞতারূপে অভিজ্ঞতার গঠন বা কাঠামোর উন্মোচন। এর লক্ষ্য হলো বিষয়-বিষয়ী অর্থনির্ধারণকারী অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত কাঠামোর রূপ উন্মোচন, যে কাঠামো বিষয়-বিষয়ীর সেই রহস্যময় সম্পর্ককে গঠন করে। মানসঘটনাবাদ চেতন অভিজ্ঞতার মৌলিক গঠন বা কাঠামোয় চলে যায়, যে কাঠামো সমস্ত প্রকার চেতন অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার শর্ত রচনা করে।

মানসঘটনাবাদী চিন্তাধারার সূত্রপাতকারী হিসাবে হুসার্ল পরিচিত। তাঁর মূল সমস্যা হলো মূল ভিত্তির সমস্যা। তিনি বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞান এবং জ্ঞানতত্ত্বের নতুন ভিত্তির অনুসন্ধান করেছেন। তিনি চেয়েছেন বিজ্ঞানসমূহকে এক চরম নিরপেক্ষ ভিত্তি প্রদান করতে। তিনি দেখেছেন যে, যদিও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে সবসময়েই অসম্পূর্ণ এবং শুদ্ধের দিকে অগ্রসরমান মাত্র, তথাপি অভিপ্রায়ের দিক থেকে সেগুলি চরম বিষয়গততারই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। বিজ্ঞানের তাৎপর্য তার সিদ্ধান্তে নয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপাদানের মধ্যেও

নয়, তার তাৎপর্য রয়েছে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের মধ্যে। এই পটভূমিকা বা দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিজ্ঞানের ভিত্তি বিষয়ক যে কোন অনুসন্ধানের সূত্রপাত হবে। তাই বৈজ্ঞানিকের অভিপ্রায়কেই চেতনার আভিমুখ্যতাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। বিষয়ীর দিক ছাড়া অন্য কোথাও বিজ্ঞানের ভিত্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই মানসঘটনাবাদ একই সংগে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিষয়গত ভিত্তির অনুসন্ধান এবং চেতনার বিষয়ীগততার বিশ্লেষণ। কিন্তু বিজ্ঞানের ধারণার মধ্যে অন্তঃস্যূত রয়েছে যে চরম বিষয়গততা তার ভিত্তির অনুসন্ধানে, এমনকি তার স্পষ্টীকরণে, মনোবিজ্ঞান অসমর্থ। প্রত্যেক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ঐ চরম বিষয়গততাকে ধ্বংস করে এবং সাপেক্ষ বিষয়গততার মধ্যে বিষয়গততাকে লীন করে দেয়।

অতএব, চেতনা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হুসার্ল এক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়। কারণ, তাঁর বিশ্লেষণের লক্ষ্য হলো যুক্তিবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের চরম ভিত্তির জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তরদান। এই বিশ্লেষণ হলো মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণ, যা যুক্তিবৈজ্ঞানিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে স্বতন্ত্র। যুক্তিবিজ্ঞানীর মত মানসঘটনাবাদী সত্য অবধারণের শর্তাবলী আলোচনা করেন না। আবার তিনি বৈজ্ঞানিকের মত কিছু পূর্বস্বীকৃতি অথবা প্রাকল্পিক বিবৃতির ভিত্তিতে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন না। আবার মনোবৈজ্ঞানিকের মত তিনি আলোচনা করেন না চেতনার মধ্যে কি কি ঘটে। বরং মানসঘটনাবাদী প্রশ্ন করেন ঃ 'যখন আমরা অবধারণ করি, ঘোষণা করি, স্বপ্ন দেখি, বাঁচি ইত্যাদি, তখন আমাদের মনের মধ্যে কি থাকে?' মানসঘটনাবাদ কখনই বাহ্য কিংবা আন্তর তথ্যের অনুসন্ধান নয়। বিপরীতপক্ষে, তা প্রাথমিকভাবে সমস্ত অভিজ্ঞতাকে স্তব্ধ করে দেয়, বিষয়গত বাস্তবতা আবার বাস্তব উপাদানের প্রশ্নকে পাশে সরিয়ে রাখে সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র চেতনায় যে বাস্তবতা তাতে মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য। মানসঘটনাবাদ মনোযোগ নিবদ্ধ করে সেই বাস্তবতায় চেতনা যার অভিমুখী। একেই হুসার্ল বলেছেন ভাবগত সারসত্তা। কিন্তু এই ভাবগত সারসত্তা বলতে বিষয়ীগত উপস্থাপনা বা ধারণাসমূহ কিংবা ভাবগত বাস্তবতত্ত্বকে বোঝা উচিৎ হবে না। বিপরীতপক্ষে, এই ভাবগত সারসত্তাই হল 'ফেনোমেনা'। তাহলেই এক্ষেত্রে বুঝতে হবে মানসঘটনাবাদী দৃষ্টিভংগীতে 'ফেনোমেনা' বলতে কি বোঝায়।

এক্ষেত্রে কাণ্টীয় অর্থে অবভাসকে নির্দেশ করা যাবে না। এখানে 'ফেনোমেনা' হলো তাই যা তাৎক্ষণিকভাবে চেতনায় নিজেকে প্রকাশিত করে। এই 'ফেনোমেনা' সকল প্রকার অন্তর্দর্শন কিংবা অবধারণ প্রক্রিয়ার পূর্বসূরী সাক্ষাৎ স্বজ্ঞায় ধৃত হয়। এই 'ফেনোমেনা' নিজেই নিজেকে প্রদর্শিত করে, নিজেই নিজেকে প্রকাশিত করে। আর তাই মানসঘটনাবাদী পদ্ধতি হলো জ্ঞানের বিষয় এবং উপাদান যে ভাবে নিজেদের উপস্থাপন করে, যে ভাবে তারা অর্থপূর্ণরূপে চেতনায় বিশুদ্ধ এবং সরল আকাঙ্ক্ষা বা আভিমুখ্যরূপে নিজেদের প্রকাশিত করে সেইভাবে তাদের বর্ণনা দান। আর এইভাবেই তারা প্রকাশিত হয়ে ওঠে। মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণে যে ভাবগত সত্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা ভাবগত বা ধারণাগত বাস্তবতা নয়, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাও নয়,

তারা হলো ভাবগত আভিমুখ্য, চেতনার আভিমুখ্যতাযুক্ত বিষয় যা চেতনার মধ্যেই অন্তঃস্যূত। মানসঘটনাবাদী দর্শনের ধারায় রয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন দার্শনিক। তাহলেও তাঁদের দার্শনিক ধারা অনুসরণ করলে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, সর্বোপরি মানসঘটনাবাদ হলো একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হলো, জগৎ সম্পর্কে আরো তীব্রভাবে সচেতন হওয়ার জন্য জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তনসাধন। আর তাই ঐ একই কারণে মানসঘটনাবাদ জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের একটি প্রতিন্যাস বা দৃষ্টিভঙ্গী। চেতনার পক্ষে জগতের সীমিতকরণ বা বন্ধনীকরণ হলো জগৎকে আরো পূর্ণভাবে গ্রহণ করার চক্রাকার পথ; আর এরই সঙ্গে গৃহীত হয় জগতের অর্থ। এই অর্থেই মানসঘটনাবাদ হলো চেতনার একপ্রকারের অভিযান, জগৎ সম্পর্কে কোন প্রণালী রচনা নয়। কিন্তু এর ফলে এই দর্শনে চরম বিষয়গত প্রকৃতির কোন হানি ঘটে না। মানসঘটনাবাদের মধ্যে যে স্বয়ং-সৎ-বস্তুর দিকে ফিরে যাওয়া সর্বাপেক্ষা মূল বাস্তবতাপূর্ণ অর্থ পুনরুদ্ধারের যে সুদীর্ঘ এবং বহুবিধ প্রচেষ্টা দেখা যায় তার মধ্যে ধারাবাহিক ভাবেই বিষয়গততার দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান। তাই মানসঘটনাবাদী পদ্ধতি অবিরাম ধারায় এগিয়ে চলে এবং একই গতিতে বিষয়ীগততার মূলে এবং বিষয়গত জগতের ভিত্তির দিকে অগ্রসর হয়। থেভেনাজ বলেন, মানসঘটনাবাদ বর্ণনার চেয়েও অনেক বেশী, মানসঘটনাবাদ ভিত্তিমূলের চরম অনুসন্ধান। মানসঘটনাবাদ নিজেকে দার্শনিক পদ্ধতিরূপে উপস্থাপিত করে, তথাপি এর থেকে আমরা পাই জগৎ সম্পর্কে একটি পূর্ণ মতবাদ। মানসঘটনাবাদ 'ফেনোমেনা' বা প্রদত্তের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শন বিষয়ীর দিকে প্রত্যাবর্তনের দর্শন। এর লক্ষ্য হলো সত্তা, কিন্তু এর শেষ হলো 'অস্তিত্বে'। এই দর্শন তথ্যগত বা বাস্তব এবং মনস্তাত্ত্বিক উপাত্তকে বন্ধনীভুক্ত করে; তথাপি শেষপর্যন্ত জীবিত হয়ে থাকার জগৎকে পুনরুদ্ধার করে।

**আভিমুখ্যতার মানসঘটনাবাদী প্রত্যয় বা ধারণা :**

সুকঠোর, কট্টর বা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিজ্ঞানরূপে যে দর্শনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এডমণ্ড হুসার্ল সেই মানসঘটনাবাদের আলোচ্য বিষয় হলো শুদ্ধ চেতনা। তবে চেতনার মানসঘটনাবাদী আলোচনা মনস্তাত্ত্বিক এবং যুক্তিবৈজ্ঞানিক আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শুদ্ধ চেতনার মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণের স্বরূপ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা হুসার্লীয় মানসঘটনাবাদে 'আভিমুখ্যতা' (Intentionality) প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা করি। হুসার্ল-এর মানসঘটনাবাদে চেতনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে চেতনা হল ক্রিয়া বিশেষ। চেতনার আভিমুখ্যতার কথা বলেছিলেন ব্রেনটানো। কিন্তু তিনি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই প্রত্যয়টির ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আভিমুখ্যতা সমস্ত মানসিক ঘটনা বা বিষয়ের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু হুসার্লের ব্যাখ্যায় আভিমুখ্যতা প্রত্যয়টির প্রথম থেকেই রয়েছে জ্ঞানতাত্ত্বিক তাৎপর্য; তারপর সেটি ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা-উত্তর, এমনকি শুদ্ধ সাত্ত্বিক, তাৎপর্য যুক্ত হয়েছিল। আভিমুখ্যতা হলো চিন্তা এবং সত্তা, বিষয়ী এবং বিষয়ের এক নতুন সম্বন্ধের সূচক। এই সম্বন্ধ হলো এক মৌলিক সম্বন্ধ যে ক্ষেত্রে বিষয় এবং বিষয়ী,

চিন্তা এবং সত্তা, পরস্পর অবিচ্ছেদ্য, আর এই সম্বন্ধ ছাড়া চেতনা কিংবা জগৎ কোনটিকেই বোঝা যাবে না। ব্রেনটানোর প্রভাবে হুসার্ল প্রথমে আভিমুখ্যতা বলতে চেতনার বিষয়মুখীনতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি আভিমুখ্য ক্রিয়ার আরও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন। যেমন,—আভিমুখ্য ক্রিয়া চেতনা তরঙ্গের বিভিন্ন উপান্তের মধ্যে সংহতি এনে বিষয়রূপিতা দান করে, এই ক্রিয়া এদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেও ঐকাত্ম্যের ভাব আনে, তাদের মধ্যে সংযোগ আনে এবং বস্তুকে গঠন করে।

চেতনার আভিমুখ্যতার অর্থ হলো, সব চেতনাই কোন কিছুর চেতনা। তবে চেতনার আভিমুখ্যতা বলতে নিছক এই কথাই বলা হচ্ছে না যে, সব চেতনারই বিষয় বা উপাদান আছে। মানসঘটনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে চেতনার আভিমুখ্যতা ধর্মের দ্বারা স্বয়ং-সৎ-বস্তু বা চরম নিরপেক্ষ বস্তুর ধারণাকে যুক্তিহীন বলা হয়েছে, আর এমন বিষয় চিন্তারই অগম্য। আবার বিপরীত পক্ষে, কার্তেজীয় দর্শনে গৃহীত স্বয়ংসম্পূর্ণ যে চেতনার কথা বলা হয়েছে, সে নিজে জগৎকে প্রত্যক্ষ করে না, যার প্রাথমিক কাজ হলো এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। বাস্তবতাকে বা সত্যতাকে মূলরূপে প্রত্যক্ষ করে সেইরূপ চেতনাকেও মানসঘটনাবাদী পরিত্যাগ করেন। তাহলে মানসঘটনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দর্শনের কাজ বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক অস্তিত্বশীল জগৎ এবং প্রাকৃতিক চেতনার মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়। দর্শন কেবলমাত্র এক বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে এ কথাই দেখতে চাইবে না যে, বিষয়ী নিজে নিজেই বিষয়গততা লাভ করে কিনা, বিষয় বিষয়ীর দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত বা গঠিত হয় কিনা, কিংবা বাহ্যজগৎ প্রকৃত বাস্তব কিনা, সমস্ত প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক জ্ঞানের পটভূমিকায় দর্শন এক নতুন দিগন্তে উপস্থাপিত হলো। আর এই নতুন দিগন্ত বা মাত্রার অনুরূপ এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি প্রদত্ত হলো। এটি হলো মানসঘটনাবাদী পদ্ধতি। আর এই নতুন আবিষ্কারকে স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়ার জন্য আমাদের দেখতে হবে অভিজ্ঞতা-উত্তর আভিমুখ্যতায় কি ভাবে মৌলিকভাবে একত্রিত হলো কার্তেজীয় দর্শনের মূল কথা, অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রমাণ, স্বজ্ঞা, এবং কান্টীয় দর্শনের মূল বক্তব্যসমূহ (চেতনায় জ্ঞানের বিষয়ের গঠন)। অবশ্য দেকার্ত এবং কান্টের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হুসার্লের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য খুবই স্পষ্ট।

কান্টের মতোই হুসার্লও মনে করেন যে, বিষয় বিষয়ীকে নির্দেশ করে আর জ্ঞানের সমস্যা মূলতঃ গঠনেরই সমস্যা। হুসার্ল মনে করেন অভিজ্ঞাতা-উত্তর এবং অ-মনস্তাত্ত্বিক চেতনা থেকে আমরা চেতনার যে জগতের অভিমুখী সেই জগতের মূল কাঠামোকে আমরা আয়ত্ত করতে সমর্থ হই। আমরা বুঝতে পারি ঐ জগতের অর্থের (meaning) ঐক্য। হুসার্লের কাছে চেতনা জ্ঞানের আকারগত এবং ঐক্য রচনাকারী উপাদান মাত্র নয়, বিষয়ের সম্ভাব্যতার শর্ত মাত্র নয়, তাঁর কাছে চেতনা হলো এক মূর্ত্ত (অ-অভিজ্ঞতা মূলক) উপান্ত, যা চেতনারূপে তাৎক্ষণিক ভাবে জীবন্ত বা সক্রিয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিহার করতে হবে। বস্তু বা বিষয় এই চেতনার দ্বারা গঠিত নয়; বিষয় চেতনার কাছে নিজেকেই

উপস্থাপিত করে বা প্রকাশিত করে। আভিমুখ্যতাযুক্ত চেতনার যে প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা হুসার্ল দিয়েছেন তাতে কার্তেজীয় স্বজ্ঞা বা স্বতঃপ্রতীতি এবং কান্টীয় দর্শনের সংগঠন একত্রিত হয়েছে। মানসঘটনাবাদের লক্ষ্য হলো, এক অভিজ্ঞতা-উত্তর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতা-উত্তর অভিজ্ঞতা। সাক্ষাৎ প্রমাণের প্রতি এই যে প্রত্যাবর্তন, এক্ষেত্রে প্রথমেই লব্ধ হয় অবশ্যম্ভব প্রমাণ যার দ্বারা চেতনা চিন্তন-ক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে, আর জগতের অর্থের উৎস হিসেবে চেতনা নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে। আর সবশেষে এই দ্বিমুখী প্রমাণের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত হয় বিষয় বা জগৎ যা আভিমুখ্যতার দ্বারা চেতনার সঙ্গে মূলগতভাবে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ জগৎ নিজেকেই চেতনার কাছে প্রদান করে, আর তার উপর চেতনা আরোপ করে অর্থ। এই অভিজ্ঞতা-উত্তর সাক্ষ্য বা প্রমাণ বোধগম্য হয় মানসঘটনাবাদী কেন্দ্রীকরণের দ্বারা। মানসঘটনাবাদী কেন্দ্রীকরণ প্রকৃতপক্ষে আভিমুখ্যতাকে কেন্দ্র করে আবর্তন। চেতনা যে বিষয়ের অভিমুখী সেই বিষয়ের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে না ফেলে আমরা আভিমুখ্য ক্রিয়ার চিন্তা করি। আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে আমরা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করি। আর এইভাবে অভিজ্ঞতার এক নতুন রাজ্য উদ্ভাসিত হয়, এবং নতুন চেতনার স্বরূপ আমরা দেখি, কারণ এই অভিজ্ঞতা-উত্তর অহং এক শূন্য আকারগত অহং মাত্র নয়—এ হলো এক মূর্ত অহং। এক্ষেত্রে আমরা পাই অর্থের জগৎ। এই জগৎ হলো প্রকৃত বিচারযুক্ত এবং দার্শনিক সাক্ষ্য প্রমাণ, অবশ্যম্ভব ভিত্তির জগৎ। আর এই অবশ্যম্ভব ভিত্তির অনুসন্ধান করেছেন হুসার্ল। অতএব, হুসার্ল যে আভিমুখ্যতার কথা বলেছেন তা জড়িয়ে রয়েছে হুসার্ল রচিত পদ্ধতির সংগেই। এই আভিমুখ্যতার দ্বিমুখী অবদান; প্রথমতঃ, আভিমুখ্যতা ভাববাদকে খণ্ডন করে, চেতনাকে জগতের অভিমুখী করে, চেতনাকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের আপাতিক অভিজ্ঞতা আর এই অভিজ্ঞতার আবশ্যিক অর্থের সম্বন্ধকে সুনিশ্চিত করে।

**মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণের স্বরূপ বা প্রকৃতি :**

মানঘটনাবাদী বা প্রদত্ত বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক চিন্তাধারার সূচনাকারী এডমুন্ড হুসার্লের প্রধান সমস্যা ছিল ভিত্তির বা মূলের সমস্যা। তিনি বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বের নতুন ভিত্তির সন্ধান করেছেন। তাঁর লক্ষ্য হলো বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ এবং সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন। হুসার্ল একথা অনুভব করেছেন যে, বিজ্ঞানসমূহের প্রকৃত সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ এবং পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও সেগুলি চরম বিষয়গততার অভিমুখী। বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য লুকিয়ে আছে তার লক্ষ্যে, তার সিদ্ধান্ত সমূহে নয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপাদানেও নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিজ্ঞানের ভিত্তি সম্পর্কীয় অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। অতএব, বৈজ্ঞানিকের আকাঙ্ক্ষা বা আভিমুখ্য চেতনার আভিমুখ্যতাকেই বিশ্লেষণ করতে হবে। বিষয়ীর দিক ছাড়া অন্যত্র এই ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যাবে না। সুতরাং, মানসঘটনাবাদ একই সংগে এবং একই সময়ে চরম বিষয়গত ভিত্তির অনুসন্ধান এবং চেতনার বিষয়ীগততার বিশ্লেষণ। কিন্তু বিজ্ঞানের

ধারণার মধ্যে অন্তর্নিহিত চরম বিষয়গততার ভিত্তি রচনায়, এমন কি তার অর্থ পরিস্ফুট করার কাজে মনোবিজ্ঞান অসমর্থ। প্রত্যেক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রবণতা রয়েছে নিরপেক্ষ বিষয়কে ধ্বংস করার এবং বিষয়গততাকে আপেক্ষিক বিষয়ীগততায় পর্যবসিত করার।

এজন্যই হুসার্ল চেতনার বিশ্লেষণের এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলেন। এই বিশ্লেষণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, কারণ, এর লক্ষ্য হলো যুক্তিবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের চরমভিত্তির জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান। এই বিশ্লেষণ হলো মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ যুক্তিবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে ভিন্ন। যুক্তিবিজ্ঞানের মতো মানসঘটনাবাদী সত্য অবধারণের শর্তসমূহের আলোচনা করেন না। আবার বৈজ্ঞানিকের মতো তিনি কিছু পূর্বস্বীকৃতি বা কিছু প্রাকল্পিক বিবৃতির ভিত্তিতে বিষয় বা বস্তুর আলোচনা করেন না। আবার মানসঘটনাবাদী মনোবিদের ন্যায় চেতনার মধ্যে যে প্রক্রিয়াগুলি ঘটে সেগুলিরও আলোচনা করেন না। সাম্প্রতিক কালের বিশ্লেষণী দর্শনের যে বিশ্লেষণ পদ্ধতি তা থেকেও মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণ ভিন্ন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা ব্যাখ্যা বলতে যা বুঝি তা থেকেও মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণ পৃথক। অপরপক্ষে, মানসঘটনাবাদীর মূল কাজ হলো বর্ণনা। বাস্তবিক পক্ষে, মানসঘটনাবাদে বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা একই সাথে চলে। তাই মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনা বলা যেতে পারে। আর এক্ষেত্রে বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ এই দুটি কথাই অ-প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যবহার করা হয়। মানসঘটনাবাদী যে প্রশ্নটি তোলেন তা হলো, আমরা যখন অবধারণ করি, স্বীকার করি, স্বপ্ন দেখি, বেঁচে থাকি ইত্যাদি, তখন আমাদের মনের মধ্যে আমরা যা পাই সেগুলির অর্থ কি? মানসঘটনাবাদ কখনও বাহ্য এবং আন্তর তথ্য সমূহের অনুসন্ধান বা আলোচনা নয়। বিপরীতপক্ষে, মানসঘটনাবাদ সাময়িক ভাবে অভিজ্ঞতাকে নিস্তব্ধ করে দেয়, বস্তুগত বা বিষয়গত সত্তার বা বাস্তব সত্তার প্রশ্নটিকে পাশে সরিয়ে রাখে যাতে করে চেতনার বাস্তবতায় চেতনার আভিমুখ্যতাযুক্ত বিষয়ে (হুসার্লের ভাষায় ভাবজ সারসত্তা সমূহ) সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ প্রদান করা যায়। কিন্তু এই ভাবজ সারসত্তা বলতে বিষয়ীগত ধারণা বা উপস্থাপন সমূহকে বুঝলে চলবে না। এগুলি ভাবজ সত্তামাত্রও নয়, এগুলি হলো 'ফেনোমেনা,' আর এক্ষেত্রে 'ফেনোমেনা' বলতে আমরা তাকেই বুঝি, যা নিজেই নিজেকে চেতনায় উপস্থাপিত করে। চেতনার বিশুদ্ধ এবং সরল আভিমুখ্যরূপে, অর্থরূপে জ্ঞানের যে বিষয় এবং উপাদান নিজেদের উপস্থাপিত করে সেগুলির বর্ণনাই হলো মানসঘটনাবাদী পদ্ধতির মূল কথা। এই বিশ্লেষণের দ্বারা ঐ বিষয় সমূহ স্বরূপে দৃশ্য হয় এবং প্রকাশিত হয়।

তাহলে মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণের তাৎপর্য হলো একথা দেখানো যে, ব্যক্তির চেতনাপ্রবাহের উপাদান সমূহ যাদের স্বজ্ঞামূলকভাবে বা অন্তর্দর্শনে ধরা যায় তার অতীব জটিল গঠন বা কাঠামো রয়েছে। চেতনার গঠনে এই জটিল চরিত্র চেতনার আভিমুখ্যতার বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। আর এই অভিমুখী গঠন

অনুযায়ী আভিমুখ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গততার অর্থেরও জটিল জাল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণের নীতি অনুসরণ করে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মূল গঠনের দিকটা লক্ষ্য করতে পারি। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার বস্তুসমূহ উপস্থাপিত হয়। কিন্তু মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণে তা নিজেই উপস্থাপিত হয় ভাবজ বিষয়গত ঐক্য রূপে। আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের একটি সরল বিষয়েরও মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণ প্রদান করতে হলে অন্তর্নিহিত কালিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত ব্যক্তির চেতনা প্রবাহের জটিল গঠনকে সম্পূর্ণ-রূপে গ্রহণ করতে হবে। অতএব, মানসঘটনাবাদী দর্শনে যে বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা দৃষ্টিবাদী বিশ্লেষণী দর্শনের পদ্ধতি থেকে আলাদা। এই পদ্ধতি জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান রূপে ইন্দ্রিয়-উপাত্ত থেকে শুরু করে না, আবার মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণ ভাষার গঠন এবং ক্রিয়ার বিশ্লেষণও নয়, যদিও অবশ্য হুসার্ল নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভাষার বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের মানসঘটনাবাদী বিশ্লেষণের নির্দেশের বিন্দু হল চেতনার পরিধির মধ্যেই সারসত্তাসমূহরূপে প্রাপ্ত মৌলিক বিষয়। একেই মানসঘটনাবাদী বলেছেন 'ফেনোমেনা'।

**মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ বা কেন্দ্রীকরণ :**

হুসার্লের মূল সমস্যা ছিল বিজ্ঞানের চরম ভিত্তি রচনা। বিশেষ করে তিনি যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনাতেই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, এবং এইজন্যই তিনি চেতনার বিশ্লেষণের এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। তিনি যে বিশ্লেষণের কথা বলেন তা মনস্তাত্ত্বিক, যুক্তি বৈজ্ঞানিক এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে ভিন্ন। মানস-ঘটনাবাদী বিশ্লেষণ একাধারে বিশ্লেষণ করে এবং বর্ণনা করে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনার কেন্দ্রবিন্দু হলো ভাবজ সারসত্তা সমূহ। হুসার্ল তাঁর সমস্যা সমাধানে তাঁর উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করলেন। তিনি যুক্তিবৈজ্ঞানিকতা এবং মনোবৈজ্ঞানিকতার মধ্যে বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞানের পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করলেন। এর জন্য তিনি যুক্তি বৈজ্ঞানিক 'ফেনোমেনা' বা যুক্তিবৈজ্ঞানিক সার-সত্তাসমূহকে আলাদা করলেন। কিন্তু তাঁর পদ্ধতির দিগন্ত অসীম বলে মনে হলো। হুসার্ল আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর সমস্যা প্রকৃতপক্ষে দর্শনেরই নিজস্ব সমস্যা—এটি হলো দর্শনের প্রাথমিক এবং মূল বা চরম ভিত্তি রচনার সমস্যা। মানসঘটনাবাদকে নিশ্চিতরূপে হতে হবে চরম দর্শন (Radical philosophy)। মানসঘটনাবাদী পদ্ধতি আর বিষয়ের কেবলমাত্র উপস্থিতির বর্ণনা ব্যাখ্যার ব্যাপার রইল না। এর লক্ষ্য হবে সমগ্র দার্শনিক আলোচনার চরমভিত্তি রচনার সমস্যাটির নবরূপায়ণ। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হবে এমন এক চরম প্রমাণের বা ভিত্তির অনুসন্ধান যা 'ফেনোমেনা'-র মতোই নিজের নিজের যাথার্থ প্রমাণ করবে, যা প্রাথমিক এবং চরমরূপে নিজেকে উপস্থাপিত করবে, যা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের বাইরে অন্য কিছুর প্রয়োজন বোধ করবে না, অর্থাৎ এই পদ্ধতির লক্ষ্য হবে অবশ্যম্ভব সত্যতার এক চরম উৎস, যা বিজ্ঞান এবং

সাধারণভাবে যুক্তিকে প্রদান করবে তাদের প্রকৃত অর্থ। এই মানসঘটনাবাদী পদ্ধতি চেতনার আভিমুখ্যে নির্দেশিত সারসত্তাসমূহের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের উপযুক্ত। এই পদ্ধতির চরম রূপ প্রদান করতে হবে, আর এই স্তরেই হুসার্ল যে পদ্ধতির আবিষ্কার এবং সংযোজন ঘটালেন তার নাম হলো মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ বা কেন্দ্রীকরণ (Phenomenological Reduction)। এই স্তরে হুসার্ল চেতনার অ-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে অ-মনস্তাত্ত্বিক চেতনার বিশ্লেষণে অগ্রসর হলেন। এই চেতনা হলো অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তি রূপে চেতনা (Transendental conciousness)। এক্ষেত্রে সীমিতকরণ বা কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা, আমূল বা চরম নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার দ্বারা, সম্পূর্ণ আত্ম-নিযুক্তির দ্বারা, হুসার্ল মনোবৈজ্ঞানিকতার কৌশলী প্রলোভনকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। এইভাবে মানসঘটনাবাদ হয়ে উঠলো অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব দর্শন (Transendental philosophy)।

হুসার্লীয় পদ্ধতিকে বলা হয়েছে মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ বা কেন্দ্রীকরণ। প্রথম স্তরে এই কেন্দ্রীকরণের দ্বারা জগৎকে বোঝা যাবে 'ফেনোমেনা' হিসেবে—এক্ষেত্রে এই বোধ নিছক জগতের কোন না কোন বিষয়ের বোধ মাত্র নয়। এই স্তরের লক্ষ্য হলো জগৎকে চেতনার অন্তর্বর্তী তত্ত্বরূপে প্রকাশকরণ—তথ্যগত সত্তা বা অস্তিত্ব রূপে নয়, কারণ, এইরূপ অস্তিত্বকে তখন বন্ধনীভুক্ত করা (Bracketing) হয়েছে। এক্ষেত্রে যার কেন্দ্রীকরণ বা সীমিতকরণ হলো তা তথ্য নয় বা জ্ঞানের নির্দিষ্ট কোন পরিধিতে তথাকথিত বাস্তব কিছু নয়—এক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ হলো জগতের, যে জগৎ সমস্ত প্রত্যক্ষগত, বুদ্ধিগত, এমন কি প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক অবধারণের যোগফল। কেন্দ্রীকরণ বা সীমিতকরণের অর্থ বর্জন করা নয়, সংশয় করা নয়। দেকার্তের প্রারম্ভিক প্রণালীবদ্ধ সংশয়ের পদ্ধতির সঙ্গে হুসার্লীয় পদ্ধতির কোন মিল এই স্তরে নেই। জগৎকে বন্ধনীভুক্ত-করণ, তাকে শূন্যতা বা নিষেধের সহগরূপে চিহ্নিত-করণের (coefficient nullity) অর্থ এই নয় যে, হুসার্ল নিজ সত্তাকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষণিকের জন্য শূন্যতা বা অ-সত্তায় পর্যবসিত করেছেন। বিপরীত পক্ষে, মানসঘটনাবাদী কেন্দ্রীকরণ বা সীমিতকরণের প্রাথমিক এবং মৌলিক উদ্দেশ্য হলো চেতনা এবং জগতের মৌলিক আভিমুখ্যতাযুক্ত সম্বন্ধের প্রকাশ। এই সম্বন্ধ মানুষের প্রকৃতকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অপ্রকাশিত থাকে। হুসার্লের ব্যাখ্যানুযায়ী কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার জগৎ নিজের স্বরূপেই বর্তমান থাকে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ফলে মানুষ বুঝতে পারে যে, প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়া বাস্তবিক পক্ষে এক বিষয়ীকে, অভিজ্ঞতা উত্তর অহংকে নির্দেশ করে, তাকে এক চরম প্রাথমিক সত্তারূপে দেখে, যা প্রতিটি জ্ঞানের উৎস, তার অর্থের ভিত্তি বা আশ্রয়।

অতএব, মানসঘটনাবাদী কেন্দ্রীকরণ যুগপৎ দুটি সত্যের উৎঘাটন করে—আমরা পাই অহং সম্পর্কে অবশ্যম্ভব প্রমাণ, আর পাই অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব চেতনার দ্বারা উদ্দিষ্ট জগৎ। চেতনা এই জগতের আভিমুখ্যতাযুক্ত,—সবার উপরে আমরা পাই জগৎ এবং অভিজ্ঞতা-উত্তর চেতনার মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য সংযোগ—এটাই হলো অভিজ্ঞতা-উত্তর চেতনার আভিমুখ্যতা। এই

কেন্দ্রীকরণ কেবলমাত্র চিন্তার কর্তা অহংকে (cogito) প্রকাশ করে না। এই পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয় জগৎ সম্বন্ধীয় চেতনা—জগতের অর্থ গঠনকারী চেতনা, আর এই জগৎ কেবল অস্তিত্বমাত্র নয়। এটি হলো এক সরল 'ফেনোমেনা'। মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে বাস্তবতত্ত্ব দ্বিধাবিভক্ত হল না—জগৎ একটিই, আর অভিজ্ঞতা-উত্তর সত্তা হলো চেতনার সারধর্ম, তার আভিমুখ্যতা।

মানসঘটনাবাদী যে ব্যাখ্যা হুসার্ল দিয়েছেন, তার অনুসরণে আমরা দেখি এই পদ্ধতি হলো দ্বিপর্যায়ী পদ্ধতি। প্রথম পর্যায়টি হল নঞর্থক, দ্বিতীয়টি হল সদর্থক। প্রথমটির নাম দেওয়া হয়েছে এপোকি (epoche) বা অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব কেন্দ্রীকরণ (Transcendental Reduction), আর দ্বিতীয়টির নাম হলো সত্তাগত কেন্দ্রীকরণ (Eidetic Reduction)। এই পদ্ধতির প্রথম পর্যায়ে এর কাজ হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তু থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া এবং বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সকল বিশ্বাস, মতবাদ ও বিচার স্থগিত রাখা। একেই হুসার্ল বলেছেন বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সকল বিচার ও বিশ্বাসকে 'বন্ধনীকরণ' করা। তবে এক্ষেত্রে দেকার্তের পদ্ধতির সঙ্গে হুসার্লীয় পদ্ধতির পার্থক্য আছে। দেকার্ত যেখানে জগৎকে সন্দেহ করেছেন, হুসার্ল সেখানে নীরব থেকে জগৎকে বন্ধনীর মধ্যে রেখেছেন। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সারসত্তা অনুসন্ধানের শর্তবিশেষ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে সত্তাগত কেন্দ্রীকরণ বা সারসত্তা নিরাকরণ পদ্ধতি। এই পর্যায়ে পরিবর্তনশীল বিশেষ এবং আপতিক বস্তুসমূহের জ্ঞান ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে আমরা সাক্ষাৎ অবলোকন করতে পারি এমন কতকগুলি সারসত্তা যেগুলি নিত্য, সার্বিক এবং আত্মনির্ভরশীল। এগুলি আবিষ্কারের সংগে সংগেই আমাদের অভিজ্ঞতার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে চরম ব্যাখ্যা দিতে আমরা সমর্থ হই, অভিজ্ঞতার চরম ভিত্তি আমরা খুঁজে পাই। তাহলে হুসার্লীয় পদ্ধতির মূল কথা হলো,—প্রথমে জগৎ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য বা তাত্ত্বিক বিচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এইরকম বিরতি তথা বিচার স্থগিতকরণের ফলে বাকি থাকবে—(১) শুদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং (২) অভিজ্ঞতার বিষয় বা বস্তুসমূহের শুদ্ধ রূপ। হুসার্ল প্রথমটিকে বলেছেন অভিজ্ঞতার অর্থনির্ধারণকারী ক্রিয়া ('Noetic' side of experience), আর দ্বিতীয়টিকে বলেছেন অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ ('Noematic' side of experience)। এই প্রসংগে আরও উল্লেখ করতে হবে যে, মানসঘটনাবাদের দৃষ্টিভংগী থেকে বিষয়কে শুদ্ধ রূপে পাওয়াই যথেষ্ট নয়। বিষয়ী বা অহংকেও শুদ্ধ রূপে পেতে হবে। এই শুদ্ধ অহং হলো অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব অহং, যাকে পাওয়া যায় মানসঘটনাবাদী কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে।

মানস-মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাবাদের দ্বিমুখী কর্তব্য ঃ

(১) এই পদ্ধতি মনস্তাত্ত্বিক চেতনার পৌণঃপুনিক প্রলোভনকে সুনির্দিষ্ট ভাবে পাশে সরিয়ে রেখে তার অ-দূরীকরণীয় আপতিকতা এবং বিভিন্ন প্রকারের আপেক্ষিকতা, যা অর্থ এবং ভিত্তির অনুসন্ধানকে নষ্ট করে দেয়, সেগুলিকে অতিক্রম করে যেতে আমাদের সহায়তা করে এবং এইভাবে চরম ভিত্তির অবশ্যম্ভব প্রমাণের কাছে আমাদের এনে দেয়।

(২) যে কোন প্রকার সরল বা লৌকিক বস্তুবাদ কিংবা প্রকৃতিবাদ থেকে এই পদ্ধতি আমাদের রক্ষা করে। বাস্তবিক পক্ষে, সমস্ত কেন্দ্রীকরণ সত্ত্বেও, সমস্ত কিছুকে বন্ধনীভুক্ত করা সত্ত্বেও, যে অভিজ্ঞতায় আমরা বেঁচে থাকি, যে অভিজ্ঞতায় আমরা জীবনযাপন করি, তা অপরিবর্তিত থাকে এবং শেষপর্যন্ত তা বর্তমান থাকে। কেন্দ্রীকরণের পথ বেয়ে আমরা ফিরে যাই সেই অভিজ্ঞতায়, আমরা বাঁচি সেই অভিজ্ঞতায়—এমন কথাও বলা যায়। কারণ আমরা কখনও ঐ অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে যাই নি। কিন্তু কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির দ্বারা আমাদের লাভ হলো এই যে, আমরা এখন ঐ অভিজ্ঞতায় বাঁচি এবং তাকে তার অর্থে, তার অবশ্যম্ভবতায়, তার মৌলিক বিচারধর্মে দেখতে শিখে তাকে ভিন্নরূপে বুঝি।

**মনোবৈজ্ঞানিকতাবাদ ঃ**

মনোবৈজ্ঞানিকতাবাদীর মতে, যুক্তিবিজ্ঞানের মূলতাত্ত্বিক ভিত্তি হলো মনোবিজ্ঞান। যুক্তিবিজ্ঞানের বিশিষ্টতা-রচনাকারী বচনসমূহ মনোবিজ্ঞানের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত। মনোবৈজ্ঞানিকতাবাদীর যুক্তিরীতি উপস্থাপিত করতে গিয়ে হুসার্ল যুক্তিবিজ্ঞান বলতে যা বুঝেছেন তা হলো, নিছক অভিমত বা আন্দাজ থেকে স্বতন্ত্ররূপে জ্ঞান আমরা কী ভাবে লাভ করি সে-সম্পর্কে একটি ব্যবহারিক শাস্ত্র। মনোবৈজ্ঞানিকতাবাদ (Psychologism) বা মনোবিজ্ঞাননির্ভরতাবাদ অনুযায়ী মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে মনোবিজ্ঞান। এই সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বা ফল সংক্রান্ত বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান থেকে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে সংশ্লিষ্ট ও প্রাসংগিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যসমূহের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। এইভাবে যুক্তিবিজ্ঞানরূপ ব্যবহারিক শাস্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করে মনোবিজ্ঞান। সত্যতা-মিথ্যাত্ব, স্বীকৃতি-নিষেধ, সামান্য-বিশেষ, হেতু-সিদ্ধান্ত বা অনুগ ইত্যাদি যে-সমস্ত প্রত্যয় বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়ম গঠনকারী উপাদান সেগুলির মধ্যেই নিহিত আছে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান। অবশ্য এই যুক্তির বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বলা হয় যে, মনোবিজ্ঞান চিন্তার প্রাকৃতিক বা স্বরূপের নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করে, আর যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো চিন্তার আদর্শমূলক নিয়মাবলী। এর উত্তরে মনোবৈজ্ঞানিকতাবাদী যুক্তিবিজ্ঞানী বলবেন, চিন্তা যেরূপ হওয়া উচিত তা চিন্তা বাস্তবিক যা তারই একটা বিশেষ অবস্থামাত্র। যে সমস্ত নিয়ম ব্যাপকতম সামান্যতায় সকল প্রকার অবধারণকে নির্দেশ করে মাত্র, সেগুলিকে মনোবিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং একই সংগে অবধারণক্রিয়ার বিশেষ নিয়মাবলী, যেমন, শুদ্ধ অবধারণের নিয়মাবলীকে মনোবিজ্ঞানের পরিধি থেকে বহিষ্কার নিতান্তই যুক্তিহীন। মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতার প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভংগী থেকে বলা যেতে পারে যে, মনোবিজ্ঞানের কাজ হলো চেতনার প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যস্থিত বাস্তব সম্পর্কসমূহ, সম্পর্করচনাকারী নিয়মসমূহ এবং তৎসহ মানস ও দৈহিক অবস্থাসমূহের অনুসন্ধান। যুক্তিবিজ্ঞান বৌদ্ধিক ক্রিয়াসমূহের কারণগত উৎপত্তি এবং ফলের অনুসন্ধান করে না, বরং তার কাজ হলো বৌদ্ধিক ক্রিয়াসমূহের সত্যতা-উপাদানের অনুসন্ধান। সত্য অবধারণে উপনীত হওয়ার জন্য উক্ত ক্রিয়াসমূহ কী ভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত, তাই যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

যুক্তিবিজ্ঞান এমন আদর্শগত সম্বন্ধের অনুসন্ধান করে যেগুলিকে সব সময় সে বাস্তব চিন্তন প্রক্রিয়ায় রূপায়িত দেখে না। মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদী বলবেন, বাস্তব সম্বন্ধ সমূহের অনুধাবন না করে যুক্তিবিজ্ঞান আদর্শ সম্বন্ধের অনুসন্ধান করতে পারে না। মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদীর বিরুদ্ধে বলা যায় যে, প্রতিটি বিজ্ঞানই যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মের বৈধতার পূর্বস্বীকৃতি করে নেয়, তাই মনোবিজ্ঞানের ওপর যুক্তিবিজ্ঞানের প্রচেষ্টা হবে চক্রক দোষযুক্ত। কিন্তু এরূপ যুক্তি সকল প্রকার যুক্তিবিজ্ঞানের অসম্ভবতা প্রমাণ করে, কারণ, বিজ্ঞান হিসেবে যুক্তিবিজ্ঞান যৌক্তিকভাবেই অগ্রসর হবে, আর তাহলে সেক্ষেত্রেও চক্রক দোষ হবে। কিন্তু এরূপ যুক্তির মূলে রয়েছে 'পূর্বস্বীকৃতি' কথাটির দ্ব্যর্থক প্রয়োগ। এই দুটি অর্থ হলো: (১) আশ্রয়বাক্য থেকে যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুযায়ী অনুমান করা এবং (২) যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিকেই আশ্রয়বাক্য রূপে গ্রহণ করে সেগুলি থেকে অনুমান করা। মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতা বিরোধীরা এই দুটি অর্থকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। কিন্তু চক্রক দোষের উৎপত্তি মাত্র তখনই হয় যখন যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিকে আশ্রয়বাক্য রূপে গ্রহণ করে অনুমান করা হয়। যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়েই প্রমাণ গঠন করা যায়। অতএব, যৌক্তিক নিয়মসমূহ প্রমাণের আশ্রয়বাক্য হতে পারে না। মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতা-বাদীর এই যুক্তি বড় জোর এটুকুই বলে যে, যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনায় মনোবিজ্ঞানের কিছু ভূমিকা আছে, কিন্তু তার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, মনোবিজ্ঞান যুক্তিবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। হুসার্লের মতে, যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনায় 'বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞান'-এর অবদান অতুলনীয়ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, আর এই 'বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞান' সকল প্রকার মনোবিজ্ঞান থেকে স্বাধীন। কাণ্ট এবং হার্বার্ট 'বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞান'-এর আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের সেই শাস্ত্র প্রকৃত অর্থে 'বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞান' হয়ে ওঠেনি। তাঁদের তথাকথিত 'বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞান' তাত্ত্বিকও নয়, আবার মনোবিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্রও নয়।

হুসার্ল মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গীর কতকগুলি পরিণতির খণ্ডন করেছেন। প্রথমতঃ, মনোবিজ্ঞান যেহেতু অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞান, তাই তার নিয়মগুলি মূল্যবান হলেও অস্পষ্ট অভিজ্ঞতাভিত্তিক সামান্যীকরণ মাত্র। অতএব, মনোবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে যদি যৌক্তিক নিয়মসমূহ রচিত হয় তবে সেগুলি সঠিক নিশ্চয়তাযুক্ত হবে না। দ্বিতীয়তঃ, বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়ম-গুলি পূর্বতঃসিদ্ধরূপে বৈধ। সকল প্রকার যুক্তিবিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্য গঠনকারী নিয়মগুলি অবশ্যম্ভব সত্যরূপে প্রতীত, অভিজ্ঞতা-উত্তর এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিত। মনোবিজ্ঞানের পক্ষে এরূপ নিয়মপ্রদান সম্ভব নয়।

অনেকে বলতে পারেন, চিন্তার নিয়মগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম। কেবল এই নিয়ম-গুলি যখন চিন্তাকে প্রভাবিত করে, তখন এগুলি কারণরূপে যুক্তিপূর্ণ চিন্তার উৎপত্তি ঘটায়। এর বিরুদ্ধে হুসার্ল বলেন, কারণগত নিয়মরূপে চিন্তার নিয়মানুযায়ী যদি চিন্তনক্রিয়া চলে, তাহলে চিন্তার নিয়ম কেবলমাত্র সম্ভাব্যতার

আকারেই প্রদান করা যাবে। ফলে সব জ্ঞানই সম্ভাব্য হয়ে যাবে। চিন্তার নিয়মগুলিকে অন্তর্দৃষ্টিমূলকভাবে ( Insightfully ) বা সাক্ষাৎভাবে প্রদত্ত বলে গ্রহণ করে পূর্বোক্ত অসুবিধা পরিহারের চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কার্য-কারণ নিয়মসমূহ সম্পর্কে সাক্ষাৎ বা অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞান আমরা কীভাবে পাই? হুসার্ল আরো বলেন, এই তথাকথিত নিয়মগুলির বিশুদ্ধ ক্রিয়াকারিত্ব থেকে কীভাবে যে সঠিক চিন্তনক্রিয়ার উদ্ভব হয় তা কখনও প্রদর্শিত হয় নি। যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মের ভিত্তিতে চিন্তনক্রিয়ার মূল্যায়ন এবং প্রাকৃতিক নিয়মরূপে উক্ত নিয়ম অনুসারে চিন্তনক্রিয়ার কারণগত উৎপত্তির প্রমাণ সমার্থক নয়। হুসার্ল মনে করেন, মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদের ত্রুটি-সমূহের উৎপত্তি হয় কতকগুলি বিভ্রান্তির জন্য। প্রথমতঃ, যে সমস্ত অবধারণ-ক্রিয়ায় যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে জানা যায় সেগুলি থেকে যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, কার্য-কারণ সম্বন্ধের সম্বন্ধীরূপে যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়ম এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের একটি নীতিরূপে যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদী ব্যর্থ হয়েছেন। হুসার্লের মতে, অভ্যাস, আবেগ এবং অন্যান্য প্রেষণা থেকেই উক্ত বিভ্রান্তিসমূহের উৎপত্তি ঘটেছে। আদর্শ বা ভাবগত নিয়ম এবং বাস্তব নিয়ম, যৌক্তিক আবশ্যিকতা এবং বাস্তব আবশ্যিকতা, যৌক্তিক ভিত্তি এবং বাস্তব ভিত্তির মৌলিক ও অদূরীকরণীয় পার্থক্য মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদী যুক্তি-বিজ্ঞানীগণ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। তৃতীয়তঃ, মনস্তাত্ত্বিক তথ্য যদি আমাদের যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়মের জ্ঞানের উৎস হয়, তাহলে ঐ নিয়মগুলির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান থাকবে ; সেই নিয়মগুলি হবে মানসিক ঘটনাসংক্রান্ত নিয়ম এবং একই সঙ্গে সেগুলির পূর্বস্বীকৃতি হবে মানসিক ঘটনার অস্তিত্ব। এর বিরুদ্ধে হুসার্ল বলেন, কোন যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়মই মানসিক জীবনের তথ্য সম্পর্কীয় নিয়ম নয়। স্বাভাবিকরূপে যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়মসমূহ তাদের প্রমাণ কিংবা উপাদানে মনস্তাত্ত্বিক কোন কিছুকে ভিত্তি করে না। মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদ যদি সঠিক হতো, তাহলে একটি বচনে যা ঘোষিত হয় তাকে ঐ বচনটি থেকে বৈধ অনুমানের সাহায্যে নিষ্কাশিত করা যেতো। কিন্তু এমন কোন বৈধ অনুমান বা যুক্তির আকার নেই যার ভিত্তিতে একটি বিশুদ্ধ নিয়ম থেকে কোন তথ্যের নিষ্কাশন করা যায়। যৌক্তিক নিয়মের অর্থবোধ এবং ঘোষণা থেকে তথ্যের নিষ্কাশন হতে পারে, নিয়মটি থেকে নয়। তা ছাড়া, একটি নিয়মের ঘোষণার মনস্তাত্ত্বিক পূর্বস্বীকৃতি বা উপাদান এবং ঐ নিয়মটির উপাদানের যৌক্তিক দিকের পার্থক্যও মনে রাখা প্রয়োজন।

হুসার্লের মতানুসারে, তথ্যগত জ্ঞানের রাজ্যে যথার্থ অর্থে নিয়মপূর্ণতা নিছক আদর্শরূপেই থেকে যায়। জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচারে তথ্যবিষয়ক সমস্ত বিজ্ঞানের নিয়মগুলি আদর্শায়িত কল্পনামাত্র। বিপরীতপক্ষে, যথার্থ নিয়মপূর্ণতা বিশুদ্ধ প্রত্যয়গত জ্ঞানের রাজ্যেই বাস্তবায়িত হয়। আর চিন্তার বিশুদ্ধ নিয়মসমূহ শেষোক্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই নিয়মসমূহের ন্যায্যতার প্রমাণ আরোহ-ভিত্তিক

নয় ; এই নিয়ম অন্তর্দৃষ্টিতেই প্রমাণিত হয়। উপাদান এবং প্রমাণ উভয় দিক থেকেই এই নিয়ম তথ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ।

মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদের সপক্ষে বলা যেতে পারে যে, যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অভিজ্ঞতামূলক, কিন্তু সেগুলি আরোহভিত্তিক নিয়ম নয়। মানসিক ঘটনাসমূহের অভিজ্ঞতায় আমরা যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ এবং সেগুলির সঙ্গে প্রদত্ত বিশুদ্ধ প্রত্যয়গত সম্বন্ধসমূহের বিমূর্তকরণ করি। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের নিয়মবদ্ধতার বা নিয়মপূর্ণতার সাক্ষাৎ চেতনা লাভ করি। এই জ্ঞান অবশ্যম্ভব এবং এক্ষেত্রে অস্তিত্ববিষয়ক কোন ঘোষণা থাকে না। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে হুসার্ল বলেন, মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ারূপে যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের ভিত্তিতে রয়েছে বিশেষ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা, কিন্তু নিয়মের মনস্তাত্ত্বিক পূর্বস্বীকৃতি ও ভিত্তিসমূহ থেকে তার যৌক্তিক পূর্বস্বীকৃতি, ভিত্তি বা আশ্রয়-বাক্যকে পৃথক করতে হবে। অনুরূপভাবে, মনস্তাত্ত্বিক নির্ভরশীলতা ও যৌক্তিক প্রমাণ এবং ন্যায্যতা প্রদর্শনকে অভিন্ন বলে মনে করলে ভুল করা হবে। কারণ, যৌক্তিক প্রমাণ অন্তর্দৃষ্টিমূলকভাবে হেতু এবং সিদ্ধান্তের বিষয়গত সম্বন্ধকে অনুসরণ করে, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক নির্ভরশীলতা কেবলমাত্র সহাস্তিত্ব ও পারম্পর্যের মনস্তাত্ত্বিক সম্বন্ধের সঙ্গে জড়িত। হুসার্ল আরো বলেন, কোন সত্যতার অর্থ হতে পারে যে, কোন কিছু অস্তিত্বশীল, কিন্তু সত্যতাটি নিজে সকল কালগততার ঊর্ধ্বে। সত্যতার নিয়মসমূহকে তথ্যের নিয়ম বলে মনে করলে সেগুলি হবে 'সত্যতা' নামক কিছু তথ্যের আসা-যাওয়ার নির্দেশাত্মক নিয়ম। এটা নিতান্তই যুক্তিহীন। সত্যতার নিয়মকে সহ-অস্তিত্বের নিয়মরূপে ব্যাখ্যা করার অর্থ হলো ঐ নিয়মকে একই সঙ্গে একটি কালগত বিশিষ্ট বিষয় এবং প্রতিটি কালগত অস্তিত্বশীল বিষয়ের আদর্শের সাধারণ নিয়মরূপে নির্দেশ করা। এক্ষেত্রে যুক্তিহীনতা খুবই স্পষ্ট। বাস্তব বিষয় ও ভাবগত বিষয় এবং তাদের অনুরূপ বাস্তব ও ভাবগত ( আদর্শগত ) নিয়মের মৌলিক পার্থক্য অনুধাবনের ব্যর্থতা থেকে অনিবার্যভাবে উক্ত পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়।

আবার, মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদের হুসার্লীয় সমালোচনার পরিপূরক আপেক্ষিকতাবাদের সমালোচনা। তাঁর মতে, বিভিন্ন আকারে মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদ আপেক্ষিকতাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আপেক্ষিকতাবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে হুসার্ল দু-প্রকার আপেক্ষিকতাবাদের উল্লেখ করেছেন—ব্যক্তিসাপেক্ষ আপেক্ষিকতাবাদ ও অ-ব্যক্তিসাপেক্ষ বা প্রজাতিসাপেক্ষ আপেক্ষিকতাবাদ। প্রথম প্রকার আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী সমস্ত সত্যতা এবং জ্ঞান অবধারণকারী ব্যক্তিসাপেক্ষ, আর দ্বিতীয় প্রকার আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী সমস্ত মানবীয় সত্যতার মানদণ্ড অবধারণ রচনাকরী সমগ্র মানুষ প্রজাতি। একে নৃতত্ত্ব-নির্ভরতাবাদও বলা হয়। যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মগুলির বিষয়গতত্তা সম্বন্ধে অন্তদৃষ্টি থাকলে অতি সহজেই ব্যক্তিসাপেক্ষ আপেক্ষিকতাবাদ খণ্ডন করা যায়। বিরোধের নিয়মের মতো স্বতঃসিদ্ধ সত্য সত্যতার নিজস্ব প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। তাই আপেক্ষিক সত্যতা কথাটি এ প্রসঙ্গে নিতান্তই যুক্তিহীন।

তাছাড়া, স্বীয় তত্ত্ব ঘোষণার প্রচেষ্টায় ব্যক্তিসাপেক্ষ আপেক্ষিকতাবাদের সমর্থক অপরের কাছে প্রমাণের দাবী করেন, আর সেক্ষেত্রে সত্যতার বিষয়গততা স্বীকৃত হয়। আবার সংশয়বাদী তত্ত্ব হিসেবে প্রজাতিগত আপেক্ষিকতাবাদের বক্তব্য হলো, একই বচন মানুষ প্রজাতির জ্ঞাতার কাছে সত্য হতে পারে, আবার মানুষ ভিন্ন অন্য প্রজাতির জ্ঞাতার কাছে মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' শব্দগুলির অর্থ থেকেই একথা অনুসৃত হয় যে, একই বচন সত্য এবং মিথ্যা উভয়ই হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আপেক্ষিকতাবাদী বলতে পারেন, মনুষ্য ভিন্ন অপর জ্ঞাতার অবধারণ ক্রিয়ায় এমন বচন ও সত্যতা থাকতে পারে যা আমাদের যুক্তিবৈজ্ঞানিক নীতিসমূহের অনুসারী নয়। হুসার্লের প্রত্যুত্তর : উক্ত জ্ঞাতারা 'সত্য' ও 'মিথ্যা' শব্দগুলিকে ভিন্নতর অর্থে বোঝে অথবা তারা ঐ শব্দগুলিকে ভিন্নতর অর্থে ব্যবহার করে। প্রথম বিকল্প সঠিক বলে ধরে নিলে ঐ জ্ঞাতাদের অবধারণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক নিয়মসমূহ খাটে না বা সত্য নয় একথা বলা অর্থহীন, আর দ্বিতীয় বিকল্প সঠিক বলে ধরে নিলে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিতর্ক নিতান্তই শব্দগত বা ভাষাগত বিতর্কে পর্যবসিত হয়। তৃতীয়তঃ, প্রজাতির গঠনগত উপাদানের সম্বন্ধে সত্যতার ভিত্তি রচনা করে আপেক্ষিকতাবাদ সত্যতাকে তথ্যের চরিত্র দান করেছে। সত্যতাকে কারণ ও কার্যরূপে দেখা নিতান্তই যুক্তিহীন। অবধারণের উপাদান অর্থাৎ ধারণাগত ঐক্যের সঙ্গে বিশেষ বাস্তব অবধারণ-ক্রিয়াকে মিলিয়ে ফেললে চলবে না। নিয়মানুসারে রচিত সঠিক অবধারণক্রিয়া-রূপে সত্য অবধারণ এবং ঐ অবধারণের সত্যতা বা অবধারণ-উপাদানের পার্থক্যও অনুধাবন করতে হবে। চতুর্থতঃ, সাধারণ মনুষ্য-স্বভাবই সমস্ত সত্যের সম্পূর্ণ উৎস হলে যদি ঐরূপ কোন গঠন বা স্বভাব না থাকে, তাহলে কোন সত্যই থাকবে না। কিন্তু, কোন সত্যতার অস্তিত্ব নেই—এই বচনটি যে বচনের সমার্থক তা হলো, কোন সত্যতার অস্তিত্ব নেই—এই বচনটির অস্তিত্ব নেই। এটা স্পষ্টতই অসংগতিপূর্ণ বা আত্মবিরোধিতাপূর্ণ। পঞ্চমতঃ, আপেক্ষিকতা-বাদ অনুযায়ী একটি প্রজাতির গঠনের ( Constitution ) ভিত্তিতে এই সত্যের উৎপত্তি হতে পারে যে, ঐ প্রজাতির গঠনের অস্তিত্ব নেই, আর এ কথা ঐ প্রজাতির ক্ষেত্রে সত্য। কিন্তু কোন বিশেষ প্রজাতির অনস্তিত্বের ভিত্তি ঐ গঠনই —এ কথা স্পষ্টতই স্ববিরোধিতাযুক্ত। সত্যতার আপেক্ষিকতা বলতে বোঝায়, আমরা যাকে সত্যতা বলি তা মনুষ্য প্রজাতির গঠনের এবং প্রজাতির নিয়ন্ত্রক নিয়মাবলীর ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতাকে কারণগত নির্ভরশীলতা বলে বুঝতে হবে। অতএব, ঐ গঠনকাঠামো এবং ঐ নিয়মগুলি যে অস্তিত্বশীল সেই সত্যতার ব্যাখ্যার ভিত্তি হলো তাদের অস্তিত্ব। সেক্ষেত্রে নিয়মগুলি এবং তাদের ব্যাখ্যার নীতি অভিন্ন হয়ে পড়বে। ষষ্ঠতঃ, সাক্ষাৎ স্বজ্ঞালব্ধ তথ্যের সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদ স্পষ্টতই বিরোধিতাযুক্ত। স্বজ্ঞার ভিত্তিতে রচিত অবধারণের সপক্ষে নিদর্শনসমূহের ন্যায্যতা অপ্রমাণিত, কারণ, তাদের তাৎপর্য চেতনার বাস্তব উপাত্তকে অতিক্রম করে যায়। অবধারণ তখনই প্রকৃতপক্ষে স্বতঃপ্রতীত

হয় যখন তাদের তাৎপর্য বা দ্যোতনা ঐ উপাদান অনুযায়ী রচিত হয় এবং তাতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, হুসার্ল আপেক্ষিকতাবাদকে ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী আপেক্ষিকতাবাদ হলো সেই মতবাদ যা কোনভাবে বিশুদ্ধ যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মসমূহকে তথ্য থেকে নিষ্কাশিত করে। যুক্তিবিজ্ঞানের বিশুদ্ধ নিয়ম বলতে হুসার্ল বুঝেছেন সমস্ত ভাবগত নিয়মকে, যেগুলির একমাত্র ভিত্তি হলো বচনের সত্যতা, বিষয়, যৌক্তিক ধর্ম, সম্বন্ধ, নিয়ম, তথ্য ইত্যাদি প্রত্যয়সমূহের অর্থ। আপেক্ষিকতাবাদের বিরুদ্ধে হুসার্ল কেবলমাত্র যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের অবশ্যম্ভব নিশ্চয়তার উল্লেখ করেন নি, তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, আপেক্ষিকতাবাদ আত্মবিরোধিতাপূর্ণ, কারণ, এই মতবাদ প্রত্যয়সমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ, কেবলমাত্র প্রত্যয়সমূহের উপাদানের ভিত্তিতে রচিত সত্যতা এবং ব্যক্তি-অস্তিত্বের সত্যতার সঙ্গে বিরোধিতা-যুক্ত। হুসার্লের মতে, বিভিন্ন রূপে মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদ আপেক্ষিকতাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আপেক্ষিকতাবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সব যুক্তিই মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। সমস্ত আকারেই মনোবিজ্ঞান-নির্ভরতাবাদ আত্মবিরোধিতাপূর্ণ, কারণ, প্রতি ক্ষেত্রেই রয়েছে বাস্তব থেকে ভাবজ সত্যের নিষ্কাশনের প্রচেষ্টা।

## মার্টিন হাইডেগার

**ব্যক্তি ও তাঁর সমকাল :**

বাডেন-ভুয়েরটেনবার্গের ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলের এক গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারে মার্টিন হাইডেগারের জন্ম হয়। জন্মস্থান মেস্‌কির্খ (Messkirch), সময় ১৮৮৯-এর ২৬শে সেপ্টেম্বর। পিতা ছিলেন ক্যাথলিক গীর্জার কর্মচারী। ১৯০৩ থেকে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হাইডেগার জিম্‌নাসিয়ামে শিক্ষালাভ করেন—প্রথমে কন্‌স্টান্‌জের এবং পরে ফ্রাইবুর্গের জিম্‌নাসিয়ামে। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধর্মবিজ্ঞান ও দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। যৌবনেই এই দুটি বিষয়ে দেখা যায় তাঁর আত্যন্তিক আগ্রহ। ফ্রাইবুর্গে তাঁর শিক্ষক ছিলেন হেনরিখ্ রিকার্ট ও এডমুণ্ড হুসার্ল। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার জন্য পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এ ব্যাপারে তাঁর রচনার বিষয় ছিল 'ডক্টরিন্ অব্ ক্যাটিগরিজ্ ইন্ ডান্স্ স্কটাস্'। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কৈশোরেই হাইডেগার ক্যাথলিক চিন্তাবিদ ফ্রান্‌জ্ ব্রেন্‌টানোর কাছ থেকে এমন একটি বই লাভ করেছিলেন যা তাঁর পরবর্তী বৌদ্ধিক জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। বইটির নাম 'অন্ দ্য ম্যানিফোল্ড মিনিং অব্ বিয়িং অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টটল্'। ১৮৬২-তে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে হাইডেগার এলফ্রিডি পেট্রির সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসঘটনাবাদের (ফেনোমেনোলজি) জনক হুসার্লের সহকারী নিযুক্ত হন এবং কয়েক বছর ধরে হুসার্লের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ্য লাভ করার সুযোগ পান। হুসার্লের সংগে ব্যক্তিগত ও ভাবগত সম্পর্ক তখনই স্থাপিত হয়, এবং জার্মান বুদ্ধিজীবী মহলে তখনই এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, একদিন হাইডেগারই তাঁর মন্ত্রগুরু হুসার্লের স্থলাভিষিক্ত হবেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হাইডেগার মার্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সফল। এর ফলে অচিরেই তিনি মার্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিয়িং অ্যাণ্ড টাইম' প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর শিক্ষক হুসার্ল অবসর গ্রহণ করলে হাইডেগার ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ডাভস্-এ (Davos) তিনি 'কান্ট ও ভাববাদ' বিষয়ক এক বিতর্কে আর্নস্ট্ ক্যাজিরার-এর তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হাইডেগার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নিযুক্ত হন। তখন নাৎসীপ্রধান হিটলার জার্মানির সর্বময় কর্তা। ১৯৩৪-এর ফ্রেব্রুয়ারী মাসে হাইডেগার রেক্টর পদ থেকে ইস্তফা দেন, কিন্তু অধ্যাপনা

করেন ১৯৪৪-এর নভেম্বর পর্যন্ত। ফ্যাসীবাদকে সমর্থন করার জন্য ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে মিত্রপক্ষের নির্দেশে তাঁকে অধ্যাপকের পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়। এরপর আবার তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছরগুলি তিনি ফ্রাইবুর্গের পার্শ্ববর্তী ব্ল্যাক ফরেস্টের টট্‌নাউবার্গ অঞ্চলে নিঃসংগ জীবন অতিবাহিত করেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রথমবার ফ্রান্স পরিভ্রমণ করেন। তারপর ১৯৬৬, ১৯৬৮ ও ১৯৬৯-এ আবার আলোচনাচক্রে যোগদানের জন্য সেখানে যান। বন্ধু এবং প্রীতিভাজন অনুগামী কবি রেনে শার এবং চিত্রকর জর্জ ব্রাক্ হাইডেগারের ফরাসী অনুগামী ও ভক্তদের জন্য ঐ সব আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৬২-র এপ্রিল মাসে হাইডেগার প্রথমবার গ্রীস পরিভ্রমণ করেন। কান্টের মতো হাইডেগারও নিজ জায়গা ছেড়ে দেশভ্রমণ করতে উৎসাহী ছিলেন না। নীরবে নিঃসংগ অবস্থায় চিন্তা করতেই ভালবাসতেন। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মে হাইডেগার তাঁর জন্মস্থান মেস্‌কির্খেই মারা যান।

ফরাসী এবং জার্মান ভাষাভাষী দর্শন-জগতে অন্য কোন অস্তিবাদী চিন্তাবিদ্‌কে নিয়ে এতো উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নি যতোটা হয়েছে হাইডেগারকে নিয়ে। ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে হাইডেগার গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তাঁর রাজনৈতিক মনোভাব এর একমাত্র কারণ নয়। উনিশ শতকের দার্শনিক প্রবণতা যেমন হেগেলের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল 'দুর্বোধ্য ও অন্ধকারাচ্ছন্ন' একটি দিক, তেমনি হাইডেগারের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল 'অনুদারতা ও অহেতুক অস্পর্ধাপ্রবণতা'। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল নির্লজ্জভাবে শোধনবাদী। কম্যুনিস্টরা তাঁকে অপছন্দ করতেন এবং তাঁর রাজনৈতিক মনোভাবের জন্য সার্ত্র্ প্রমুখ অস্তিবাদীদেরও অবিশ্বাস করতেন। অনেকে তাঁকে 'দার্শনিক' বলেই গণ্য করতেন না। ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল তো তাঁর 'হিস্ট্রি অব্ ওয়েস্টার্ন ফিলসফি'-তে হাইডেগারের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। কোন কোন দার্শনিক হাইডেগারকে 'ভাষা-রহস্যবাদী' বলে চিহ্নিত করেছেন; আবার কেউ কেউ হাইডেগারের চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনাকে 'পণ্ডশ্রম' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর দর্শনকে 'শব্দ-চাতুর্যের খেলা' বলেও অনেকে নিন্দা করেছেন। এমন কি, কেউ কেউ এ মন্তব্যও করেছেন যে, তাঁর চিন্তাভাবনা 'অর্থহীন'। অথচ, হাইডেগার সম্পর্কে বিপরীত মতও রয়েছে। তাঁকে কেউ কেউ 'বিখ্যাত দার্শনিক', 'অধিবিদ্যার সমালোচক' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছেন, এমন কি, প্লেটো, অ্যারিস্টটল্, দেকার্ত, লাইব্‌নিৎস্, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের মতোই তাঁকে একজন মৌলিক দার্শনিক বলে চিহ্নিত করেছেন। হাইডেগারের বহুমুখী প্রতিভার ওপর রচনা আজ চার হাজারেরও বেশী।

হাইডেগারের দর্শন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক-ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবহিত ও গর্বিত। হিরাক্লিটাস, অ্যানাক্সিমেণ্ডার, পারমিনাইড্‌স্, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা গ্রীক চিন্তা ও সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের সম্যক পরিচয় বহন করে। জার্মান পূর্বসূরীদের

কাছে তাঁর ঋণ ছিল সর্বাধিক। কাণ্ট ও হেগেলের কাছে তাঁর ঋণের কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্ত্য অধিবিদ্যায় নীৎসের স্থান ছিল হাইডেগারের কাছে অনেক উঁচুতে। গীতিকবি হ্যোল্ডার্লিনের দ্বারা তিনি প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর কবিতার প্রশংসায় হাইডেগার ছিলেন উচ্ছ্বসিত। হ্যোল্ডার্লিন ছিলেন দৈনন্দিন জীবনের কবি, দ্রষ্টা। হাইডেগার তাঁকে 'কবির কবি' বলে উল্লেখ করেছেন। ভাষা সম্পর্কে হাইডেগারের নিজস্ব একটি তত্ত্ব ছিল, যা আজকে 'হাইডেগারীয় ভাষাতত্ত্ব' নামে পরিচিত। জার্মানী, ফ্রান্স এবং আমেরিকায় কবিতার স্বরূপ (বা প্রকৃতি) এবং ভাষা সম্পর্কে হাইডেগারের মত নিয়ে আলোচনা চলছে। জার্মানি এবং ফ্রান্সের গাদামার, দেরিদা, রেনে শার, পল্ সেলাঁ প্রমুখ লেখক ও কবিরা হাইডেগারের সাহিত্যতত্ত্বের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছেন, বিতর্ক করছেন। হাইডেগারের মৃত্যুতে কয়েকজন ফরাসী দার্শনিক মন্তব্য করেছিলেন যে, 'সপ্তদশ শতাব্দী যেমন দেকার্ত ও নিউটনের যুগ, তেমনি আমাদের যুগ হাইডেগারের যুগ'। হান্না আরেন্ট্ হাইডেগার সম্পর্কে বলেছেন, "বিশ শতকের দার্শনিক অনুভূতিতে মার্টিন হাইডেগার চিন্তার এক গোপন রাজা"। অস্তিবাদের মহানায়ক জাঁ পল সার্ত্র্ হাইডেগারের প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

হাইডেগার সম্পর্কে বৈপরীত্যের এত সংমিশ্রণ ঘটেছে যে তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা খুবই শক্ত। তাঁর ভাষা দুরূহ, কখনও বা অস্পষ্ট ও রহস্যময়। তাঁর দার্শনিক রচনা ও তার ভাষা এবং রাজনৈতিক মতবাদের *ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের মধ্যে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর মন্ত্রগুরু ও পৃষ্ঠপোষক হুসার্লের মানসঘটনাবাদ সম্পর্কে হাইডেগারের মনোভাবও সুস্পষ্ট নয় বলে অভিযোগ উঠেছে। নাৎসীবাদ সম্পর্কে ১৯৪৫-এর পর থেকে তিনি মুখ খোলেন নি। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁর সমস্ত রচনার এক তৃতীয়াংশও পাঠকদের কাছে অধিগম্য নয়। অধিকাংশ রচনাবলীই অপ্রকাশিত। ৫৭ খণ্ডে প্রকাশিতব্য হাইডেগারের সমগ্র রচনাবলীর মাত্র দুটি খণ্ড এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। স্বভাবতই এটা আশা করা যায় না যে, হাইডেগার সম্পর্কে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হবে। যে তাঁর সম্পর্কে কোন আলোচনাই তাই সাময়িক বা প্রাথমিক পর্যায়ের হবে— এটা মেনে নিতেই হবে। এটা মেনে নিয়েই বিভিন্ন দেশে হাইডেগার-কে নিয়ে আলোচনা চলছে।

তাঁর প্রধান রচনাগুলির মধ্যে হোয়াট ইজ্ ফিলসফি, দ্য কোশ্চেন অব্ বিয়িং, ইনট্রডাকশন্ টু মেটাফিজিকস্, বিয়িং অ্যান্ড টাইম, কাণ্ট অ্যান্ড দ্য প্রব্লেম্ অব্ মেটাফিজিকস্, একজিস্টেনস্ অ্যান্ড বিয়িং, আইডেন্টিটি অ্যান্ড ডিফারেন্স, পোয়েট্রি, ল্যাংগুয়েজ, থট, দ্য এন্ড অব্ ফিলসফি, ডিসকোর্স অন্ থিংকিং, দ্য কোশ্চেন কনসার্নিং টেকনলজি প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য।

* National Socialism

**হাইডেগার—মানসঘটনাবাদ থেকে সত্তাবিজ্ঞান :**

গোড়াপত্তনের সময় মানসঘটনাবাদ ছিল অধিবিদ্যা-বিরোধী। হুসার্ল মানসঘটনাবাদকে এক সুকঠোর বিজ্ঞানরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানসঘটনাবাদ অবভাসতত্ত্বের দিকে এগিয়ে ছিল। হুসার্লের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'ফেনোমেনা' সত্তাবিরোধী নয়। এই সত্তাবস্তু স্বরূপতঃ যা তা থেকে ভিন্ন, আমাদের কাছে প্রতীয়মান বস্তু মাত্র নয়। সমস্ত জ্ঞানের চরম বা আমূল এবং প্রাথমিক ভিত্তির অনুসন্ধানকে হুসার্ল এক অতীন্দ্রিয় বা অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তাই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানসঘটনাবাদ যে দর্শনের কথা বলেছে তার জন্য প্রয়োজন একটি সাধারণ সত্তাবিজ্ঞান ( Ontology ), আর শুরু থেকেই সত্তাসম্পর্কীয় আলোচনার অনুপ্রেরণা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। ক্রমাগত ভিত্তির দিকে অগ্রসর হয়ে এবং উত্তরোত্তর ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানসঘটনাবাদ স্বভাবতই এক সত্তাবিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং আবরণ উন্মোচন করেছিল, যে সত্তাবিজ্ঞানের ধারক হয়েছে, আর এর দিকেই সে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছে। এই সত্য হুসার্লের মধ্যেই প্রতীয়মান হয়েছিল। তিনি তাঁর চিন্তাধারার এক পর্যায়ে বলেছিলেন—কট্টর বিজ্ঞানরূপে দর্শন! এই স্বপ্ন ভেঙে গেছে। থেভেনাজ বলেন, মানসঘটনাবাদী সত্তাবিজ্ঞান কোন অস্বাভাবিক মিলনের ফল নয়। মানসঘটনাবাদী পদ্ধতির মৌলিকতা এবং গভীরতার প্রকাশ করে এই সত্য।

সত্তাবিজ্ঞান হলো সত্তা সম্পর্কীয় আলোচনা। কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্কলাস্টিক দর্শন কিংবা হেগেলীয় দর্শনের সত্তার কথা বলা হয় না। হাইডেগারের প্রশ্ন হলো : সত্তার অর্থ কী? প্রকৃত মানসঘটনাবাদী হিসাবে হাইডেগার একথা স্বীকার করবেন না যে, 'সত্তা' শব্দটির অর্থ স্বতঃপ্রতীত, কিন্তু তা লঙ্ঘনের অতীত। 'সত্তা' শব্দটির অর্থ কি? — এই প্রশ্নের উত্তর দান যদি কঠিন হয়, তবে তার কারণ হলো এই যে, ঐ প্রশ্নটির অর্থই অস্পষ্ট। মানসঘটনাবাদের কাজই হলো এই প্রশ্নের অর্থটি স্পষ্ট করা। হাইডেগারের সত্তাবিজ্ঞানে মানসঘটনাবাদী পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমরা দেখি হুসার্লীয় অভিজ্ঞতা-উত্তর মানসঘটনাবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব। হাইডেগারের সমস্যা হলো সত্তার মৌলিক কাঠামোকে আলাদা করা, যে কাঠামো অভিজ্ঞতামূলক জগতের সম্ভাবনার শর্ত, যে কাঠামো যা কিছু আছে তা সবেরই গঠনগত ভিত্তি। হাইডেগার তাঁর 'বিয়িং অ্যান্ড টাইম' গ্রন্থে অস্তিমান ( Ontic ) এবং সত্তা বা যা আছে তার অর্থ ( Ontological )—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রচনা করেছেন। হাইডেগারের মধ্যে আমরা দেখি শুধুমাত্র জ্ঞানের নয়, যা কিছু আছে তা সবেরই, সত্তার বৈশিষ্ট্যের চরম ভিত্তির তীব্রতর এবং গভীরতর অনুসন্ধান। হাইডেগার অনুসন্ধান করেছেন প্রকৃত অর্থের, তাঁর সত্তা-বিজ্ঞান হল মৌলিক সত্তাবিজ্ঞান ( **Fundamental ontology** )।

চরম বা আমূল ভিত্তির অনুসন্ধানে হুসার্ল উপনীত হয়েছেন অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব বা গঠনকারী-চেতনায়—এই ভিত্তি হলো চেতনার আভিমুখ্যতার দ্বারা

আকাঙ্খিত সব কিছুর গঠনগত উৎস। হাইডেগার এই অনুসন্ধানকে আরো গভীরে ঠেলে নিয়ে গেছেন। তিনি অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব চেতনারও ভিত্তিতে পৌঁছেছেন। এই ভিত্তি হলো প্রকৃত চরম ভিত্তি। চরম বা আমূল ভিত্তির এই গভীরতর অনুসন্ধান আমাদের যেখানে নিয়ে যায় তাকে বলা যেতে পারে এক প্রকার ভিত্তিবিহীন শূন্যতা, এই শূন্যতা যে কোন প্রকার সত্তা বা ভিত্তির চেয়ে আরো বেশী চরম বা আমূল। এই মৌলিক বা চরম সত্তাবিজ্ঞান শূন্যতা বা অ-সত্তার ( Non-being ) তত্ত্বের দিকেই নিয়ে যায়। হাইডেগারের মতে, হুসার্লের অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব চেতনা নিতান্তই ভাববাদী এবং বিষয়ীগত, হুসার্লীয় বক্তব্যের ভিত্তি হলো আরো অধিকতর সত্তাগত কাঠামো, যা রয়েছে চেতনার স্তরেরও গভীরে। একেই বলা হয় 'ডাজাইন' ( Dasein )। এর ওপর ভিত্তি করেই চেতনা বা অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব অহং-এর সম্ভাবনা এবং অর্থ আমরা বুঝতে সমর্থ হই।

এখন প্রশ্ন হলো, হাইডেগার 'ডাজাইন' বলতে কি বুঝেছেন? একে 'মনুষ্য সত্তা' রূপে অনুবাদ করা উচিৎ হবে না বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন থেভেনাজ। কারণ, এইরূপ অনুবাদ করলে আমরা নৃতত্ত্বের দিকে, অস্তিত্বশীল মূর্ত মানবের দিকে, অগ্রসর হই। কিন্তু হাইডেগার যে অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করেছেন তা উক্ত অর্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাগত এবং মানসিক বিষয়কে অতিক্রম করে অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হন নি, বরং চেতনাকেও অতিক্রম করে তিনি এমন কিছুর দিকে অগ্রসর হয়েছেন যা কম ব্যক্তিগত এবং অধিকতর মাত্রায় সত্তাগত। তাই থেভেনাজ মনে করেন 'ডাজাইন' কথাটির অধিকতর সুষ্ঠু অনুবাদ হবে বিমূর্ত-তত্র-অস্তি (To-be-there)। এখানে তত্র-অস্তি কথাটির 'তত্র' ( there )-এর অর্থ সরল ব্যাপারগত বা তথ্যগত অস্তিত্বকে নির্দেশ করে না। কোন স্থানকেও নির্দেশ করে না। এটি অভিজ্ঞতাগত উপাদানের স্তরের ভিত্তিতে সেই বিষয়কে নির্দেশ করে যা প্রত্যেকটি বিষয়ের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তোলে—অর্থাৎ এটি হলো সমস্ত কিছুর অস্তিত্বের সম্ভাবনার মূল ভিত্তি। 'তত্র' বা 'সেখানে' কথাটি হলো একটি মৌলিক কাঠামো যার মাধ্যমে মানুষ কোন কিছুর কাছে উন্মুক্ত হয়, আর এই চরম সত্তাগত স্তরে উন্মুক্ত হয়ে 'ডাজাইন' এবং মানুষ ক্রমশঃ বোধগম্য হয়ে উঠবে। হাইডেগার তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'Da' হল প্রকাশন যোগ্যতার একটি পরিধি, উন্মোচনের একটি পরিধি যে ক্ষেত্রে কোন কিছু 'ফেনোমেনন' রূপে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে। হাইডেগারের সত্তাবিজ্ঞানে প্রাথমিক পদ্ধতি হলো, উন্মোচনের সম্ভাবনার বিকাশের পদ্ধতি। এর দ্বারা সুপ্ত এবং বিস্মৃত সত্তাকে বুঝে নেওয়ার পথ পরিষ্কৃত হয়। আর এর পরবর্তী স্তরে আসে চরম প্রশ্ন। হাইডেগার তাঁর 'বিয়িং এবং টাইম' গ্রন্থে প্রথম স্তরে অগ্রসর হয়েছেন মানব থেকে সত্তায় এবং মনুষ্য উদ্বেগ-এ। কারণ, সত্তাই হলো প্রাথমিক উপায় যা আমাদের জন্য সত্তাকে উন্মোচিত করে।

'বিয়িং অ্যান্ড টাইম' গ্রন্থে হাইডেগার সত্তার নিজের সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু বলেন নি, তিনি মনুষ্য-অস্তিত্বের সত্তাবিজ্ঞানগত কাঠামোর সম্পূর্ণ ক্ষেত্র

উন্মোচিত করেছেন। এই পর্যায়ে তিনি যেগুলির ব্যাখ্যা করেছেন সেগুলি হলো বিশ্ব-মধ্যে-সত্তা, উদ্বেগ, কালিকতা, ঐতিহাসিকতা ইত্যাদি। আর এ ক্ষেত্রে হাইডেগারের ওপর কিয়ের্কেগার্দের প্রভাব লক্ষণীয়। তবে হাইডেগার অস্তিত্বগত বিষয়গুলিকে অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব এক সত্তাবিজ্ঞানগত আকারে রূপান্তরিত করেছেন। হাইডেগারের ব্যাখ্যায় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সম্ভাবনা, পুনরাবৃত্তি, মনস্থিরকরণ বা সিদ্ধান্তকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি 'ডাজাইন'-এর অস্তিত্বগত কাঠামোরই প্রকাশ। 'ডাজাইন' কিন্তু মূলতঃ সত্তাগত কাঠামো। যে অস্তিত্বের দর্শন জীবন-অভিজ্ঞতার স্তরে মূর্ত অস্তিত্বশীল মানুষের বিশ্লেষণের দর্শন তার স্পষ্ট বিরোধী হাইডেগারের মানস-ঘটনাবাদী অতীন্দ্রিয়বাদ। শুরু থেকেই তাঁর অস্তিবাদী মাসনঘটনাবাদের বৈশিষ্ট্য হলো মূর্ত মানুষের বন্ধনীকরণ, ঠিক যেমন হুর্সাল মনস্তাত্ত্বিক চেতনার বন্ধনীকরণ করেছিলেন। একথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, সত্তা সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ হাইডেগার করেছেন সেক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্ন হলো, সত্তার অর্থ সম্পর্কীয়, পূর্বতন প্রাচীন দর্শনের আধিবিদ্যক তত্ত্ব তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়।

প্রকৃত মানসঘটনাবাদী হিসেবে হাইডেগার মানুষ থেকে শুরু করে সত্তার উন্মোচন করেছেন, ঠিক যেমন হুসার্ল অভিমুখী-চেতনা থেকে জগতের উন্মোচন করেছিলেন। হাইডেগারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষ সত্তাকে প্রকাশিত করে না; বরং সত্তাই নিজেকে উন্মোচিত করে, উপস্থাপিত করে। আর 'ডাজাইন' হলো মানুষের কাছে সত্তার উন্মোচন।

প্রাথমিক পর্যায়ে সীমিত সত্তা ( be ) থেকে প্রকৃত সত্তায় ( Be ) অগ্রগমন সীমিত সত্তাসমূহের জগৎকে বন্ধনীভুক্ত করার প্রক্রিয়ারূপে দেখা গিয়েছে। আর এই প্রক্রিয়াই ক্রমশঃ প্রকৃত সত্তাকে আরো স্পষ্টরূপে বুঝে নেওয়ার পথ প্রস্তুত করেছে। কিন্তু এখন পরবর্তী স্তরে সত্তা-মানুষ সম্পর্কের মূল কথা আর মানুষের প্রশ্ন নয়। এখন এটা হলো আভিমুখ্যতা বা ডাজাইন-এর পরিকল্পনা। হাইডেগার উপরের স্তর থেকে শুরু করলেন। সত্তাকে অস্পষ্ট এবং নিহিত শক্তি রূপে বুঝে নেওয়া থেকেই ঐ সত্তা নিজেকে প্রকাশিত করে—তা আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। এখন যদি সত্তা নিজেকেই মানুষের কাছে প্রকাশিত করে তাহলে মানুষের নিজের পক্ষে আর কিছু করার প্রয়োজন থাকে না। আর তাহলে মানসঘটনাবাদী অনুসন্ধানের প্রলম্বিত প্রস্তাবনা সীমিত হয়ে যায়। হুসার্লীয় চেতনাকে উচ্ছেদ করা হলে, আর হাইডেগারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সত্তা যদি মানুষের আভিমুখ্যতার বিষয় হয়, তাহলে সেটি হবে নিতান্তই গৌণরূপে। এই সত্তা প্রথমে নিজেকেই আভিমুখ্যতাযুক্ত মনুষ্যচেতনারূপে প্রতিভাসিত করবে। সত্তা তাহলে আর অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব ভিত্তি হবে না, কারণ, জগতে গঠনকারী অর্থের উৎস যে চেতনা তাছাড়া অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব বা অভিজ্ঞতার ভিত্তি বলে আর কিছু থাকে না। এই সত্তা অতিক্রমণকারী বা অতিবর্তী তত্ত্ব মাত্র হয়ে যায়। একথা বলা যেতে পারে যে, হাইডেগারের সত্তা এবং অর্থের জগৎ আর সেই মনুষ্য-জগৎ থাকে না, যার সঙ্গে মানসঘটনাবাদ প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের পরিচিত করেছিল। আর যেহেতু সত্তা নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশিত

করে, সেহেতু সত্তা—মানুষ সম্বন্ধের কেন্দ্রবিন্দু হয় ভাষা। ভাষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে হাইডেগার মানসঘটনাবাদী অনুপ্রেরণারই প্রকাশ দেখিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও হাইডেগার এবং হুসার্ল-এর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। হুসার্ল ভাবজ সত্তা বা বাস্তবতারূপে চেতনার আভিমুখ্যতার মধ্যেই অর্থের অনুসন্ধান করেছিলেন (নিছক ভাষা আলোচনাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল না)। তিনি মনুষ্য আচরণের প্রকাশকরূপে ভাষার এবং ফেনোমেনারূপে অর্থের আলোচনা করেছেন। অপরপক্ষে, হাইডেগার এক প্রকারের শব্দের মানসঘটনাবাদ রচনা করেছেন। তিনি এক অভিনব ধারায় শব্দের ব্যুৎপত্তির বিশ্লেষণ করেছেন, শব্দের দৈনন্দিন অর্থের সীমিতকরণ করেছেন এবং এইভাবেই তিনি তাদের নিহিত অর্থের উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভাষা মানুষের নিজেকে ব্যবহারের উপায় নয়, তা সত্তার প্রকাশ। ভাষা মানুষের সম্পদ নয়, বরং ভাষাই মানুষকে অধিকার করে। মানুষের চিন্তা এবং কথা বলার পূর্বেই সত্তা মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে, আর এইভাবেই ভাষা যুক্তিবিজ্ঞান এবং চিন্তাকে সম্ভব করে। এই ভাষা সাধারণ ভাষা নয়। এটি রহস্যময় প্রতীকে পরিপূর্ণ এক পবিত্র ভাষা। এই ভাষা তথাকথিত দার্শনিকের ভাষা নয়। দার্শনিকের স্থান গ্রহণ করবে কবি এবং এই নতুন ভাষায় চিন্তাশীল ব্যক্তি।

হুসার্ল সমস্ত পূর্ব-স্বীকৃতিকে অতিক্রম করে অবিরাম ধারায় চরম ভিত্তির দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছেন। আর হাইডেগারের দর্শনে দেখা গেল মানসঘটনাবাদই অতিক্রান্ত হয়েছে। হাইডেগারের এই সত্তাবিজ্ঞানকে 'মৌলিক সত্তাবিজ্ঞান' বলা হয়েছে। এই সত্তাবিজ্ঞান অধিবিদ্যাকে অতিক্রম করে। এখানে শুধু অধিবিদ্যাকে বন্ধনীভুক্ত করা হয় নি, বরং অধিবিদ্যার আলোচনার সম্পূর্ণ উদ্যোগকে নস্যাৎ করা হয়েছে। অধিবিদ্যার ভিত্তিরও পেছনে গিয়ে চিন্তা প্রকৃত চিন্তা হয়ে উঠবে। হাইডেগারের নব অধিবিদ্যায় সত্তা নিজেকেই মানুষের কাছে প্রকাশিত করে; তবে মনে রাখতে হবে, হাইডেগারের সত্তা ঈশ্বর নয়। ঈশ্বর সম্পর্কে হাইডেগার উদাসীন ছিলেন।

হুসার্ল মানসঘটনাবাদকে এক গম্ভীর বিষয়গত আলোচনা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। হাইডেগার তার সত্তা থেকে যা কিছু মানবিক এবং অস্তিত্বশীল তাকে আলাদা করে দিয়েছেন, আর এই সত্তাকে কেন্দ্র করে অনেক কাব্যিক এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উদ্রেক ঘটিয়েছেন। হুসার্ল চেয়েছিলেন সাবলীল নমনীয় চেতনার কাছে অর্থের সম্পূর্ণতার প্রকাশ, যা প্রকৃত পক্ষে বিচারবুদ্ধি নিজেই; কিন্তু হাইডেগার এক অতীন্দ্রিয় শূন্যতায় আমাদের নিমজ্জিত করেছেন। সত্তার অর্থের বিচার-বুদ্ধির ভিত্তি এক বিমূর্ত চিন্তায় পর্যবসিত হয়েছে, যা যুক্তির চেয়ে বেশী চরম।

### হাইডেগারের দর্শনে 'জগৎ-মধ্যে-সত্তা' হিসেবে 'ডাজাইন'-এর ধারণা ঃ

হাইডেগারের দর্শনে মূল সমস্যা হলো সত্তার (Being) সমস্যা। আর তাঁর দর্শনে সত্তার বিশ্লেষণ শুরুই হয়েছে 'ডাজাইন'-এর (Dasein) বিশ্লেষণ দিয়ে।

'ডাজাইন' একটি জার্মান শব্দ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'তত্র সত্তা' ( Being there )। 'ডাজাইন' বলতে কোন কার্য-কারণ অর্থে সত্তা বোঝায় না। এটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় নয়। এ হলো শুদ্ধ সত্তার প্রকাশক। সত্তার বোধই হলো 'ডাজাইন'-এর একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। 'ডাজাইন' হলো সেইরূপ সত্তা যা প্রশ্ন তুলতে পারে 'আমি কে'? 'ডাজাইন' ছাড়া আর কোন সত্তা এ প্রশ্ন তুলতে পারে না। 'ডাজাইন' এমনভাবেই সত্তাযুক্ত যে আমরা সেজন্যই সত্তার বোধ লাভ করি। এই বোধ লাভ হয় 'ডাজাইন'-এর সংগে সত্তার মৌল সম্বন্ধের জন্য। তাই হাইডেগারের বক্তব্য হলো, সত্তার সমস্যাকে 'ডাজাইন'-এর বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

'ডাজাইন'-এর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে হাইডেগার সত্তার যে বিশ্লেষণ করেছেন তাকে দেকার্ত, কাণ্ট এবং হুসার্লকৃত বিশ্লেষণের সংগে সাদৃশ্যযুক্ত বলে মনে করলে ভুল করা হবে। হাইডেগারের কাছে 'ডাজাইন'-এর বিশ্লেষণের অর্থ কোন বিষয়ী বা অহং বা চেতনার বিশ্লেষণ নয়। 'ডাজাইন'-এর বিশ্লেষণ হাইডেগারের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিয়িং অ্যাণ্ড টাইম'-এর কেন্দ্রবিন্দু। 'ডাজাইন'-এর বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তিনি সত্তার বিশ্লেষণ শুরু করেছেন, হুসার্লের মানসঘটনাবাদকে আক্রমণ করেছেন এবং গতানুগতিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনকে 'বিপথে চালিত' বলে চিহ্নিত করেছেন। হাইডেগার দার্শনিক তথা অভিজ্ঞতা-উর্ধ্ব বিষয়ীর ধারণাকে একেবারেই বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত আত্মা হলো 'ডাজাইন'।

হাইডেগারের পরিভাষায় 'ডাজাইন'-এর অর্থ হলো সত্তারূপে সেই মানুষ যে তাৎক্ষণিকভাবেই জগতে উপস্থাপিত এবং যাকে জগতের সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য সম্বন্ধেই বেঁচে থাকতে হবে। 'ডাজাইন'-এর কাঠামোগত বিশ্লেষণের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের কথা হাইডেগার উল্লেখ করেছেন। প্রথম পার্থক্যটি হলো সত্তা বিষয়ক ( ontic ) এবং সত্তাবিজ্ঞান বিষয়ক ( ontological )-এর মধ্যে। সত্তাবিষয়ক হলো অস্তিত্বের একটি বিশেষণ—আকার ( adjectival form , যা অস্তিত্ববিষয়ক সব কিছুকেই নির্দেশ করে। তাহলে সত্তাবিষয়ক বা 'অনটিক্' শব্দের অর্থ হলো অস্তিত্বশীল ( existent )। অপরপক্ষে, সত্তাবিজ্ঞান বিষয়ক বলতে বোঝায় সত্তা সম্পর্কীয় আলোচনার বিষয়। সত্তাবিজ্ঞান বিষয়ক অনুসন্ধান সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। 'ডাজাইন' মূলতঃ সত্তাবিষয়ক, কেননা, 'ডাজাইন' সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। হাইডেগার বলেন, অস্তিত্বশীলতার দিক থেকে ( ontically ) আমরা প্রত্যেকেই 'ডাজাইন,' কিন্তু সত্তাবিজ্ঞান বিষয়ক দিক থেকে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজ সত্তা থেকে বহু দূরে, অর্থাৎ, আমরা কেউই আমাদের নিজেদের সম্পর্কে যথাযথ বিশ্লেষণ প্রদান করতে পারি না।

সত্তাবিষয়ক এবং সত্তাবিজ্ঞান বিষয়ক-এর পার্থক্যের পাশাপাশি হাইডেগার যে আর একটি পার্থক্যের কথা বলেছেন তা হলো একজিস্টেনসিয়েলি ( existentielle ) এবং একজিস্টেনসিয়াল (existential)-এর মধ্যে। প্রথমটি 'ডাজাইন'-এর সত্তাবিষয়ক কাঠামোর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। 'ডাজাইন'-এর ওপর প্রযুক্ত একজিস্টেনসিয়েলি ( existentielle ) 'ডাজাইন'-এর অ-সারসত্তাগত কাঠামোকে নির্দেশ করে। অপরপক্ষে, একজিস্টেনসিয়াল

( existential ) 'ডাজাইন'-এর ওপর সুনির্দিষ্টভাবে আরোপিত সত্তাবিজ্ঞান বিষয়ক বিষয়কেই নির্দেশ করে। 'ডাজাইন'-এর অস্তিত্বমূলক গঠন হলো তার মৌলিক গঠন। হাইডেগারের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মূলগত সত্তায় 'ডাজাইন'-এর বিশ্লেষণ ; আর মূলগত সত্তায় 'ডাজাইন'-কে হাইডেগার যে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন তা হলো 'বিশ্ব-মধ্যে-সত্তা' (Being-in-the-world)। এমন কি যুক্তিবিজ্ঞানের দিক থেকেও 'ডাজাইন'-কে জগতে তার অস্তিত্ব থেকে আলাদা করা যায় না। 'ডাজাইন' এবং জগৎ আসলে একটি বিষয়কে প্রকাশ করে। হাইডেগার তাই বলেছেন, "বিশ্ব-মধ্যে-সত্তা একটি মাত্র ঘটনা ( Phenomenon )। বিশ্ব বা জগৎ এবং 'ডাজাইন' বা সত্তা—এ দুয়ের মধ্যে বোধগম্য কোন পার্থক্য করা যায় না।" হাইডেগার 'ডাজাইন'-এর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মানসঘটনাবাদমূলক বর্ণনা এবং এই বর্ণনা প্রচলিত দর্শন এবং হুসার্ল-এর দ্বিবিধ ত্রুটির উল্লেখ করে, যথা, (১) অহং ও চেতনার অভিন্নতা রচনা, এবং (২) জগৎ এবং জগৎ-মধ্যে-বিষয় ( object-in-the-world )-এর পার্থক্যের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগের অভাব।

হাইডেগার কর্তৃক ব্যবহৃত 'জগৎ-মধ্যে-সত্তা' কথাটির বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব বা জগৎ বলতে বোঝায় 'ডাজাইন'-একটি মূলগত বৈশিষ্ট্য বা গঠন। জগৎ বলতে এক্ষেত্রে সমস্ত বস্তুসমূহের সমষ্টিকে বোঝায় না—এই জগৎ হলো এক গঠনগত সমগ্র। হাইডেগারের অনুসরণে বলা যায় যে, এ হলো বিশ্বের বিশ্বত্ব ( Worldhood of the world )। আমরা এই জগতের যে কোন বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারি বা বন্ধনীভূক্ত করতে পারি। কিন্তু জগৎকে সন্দেহ করতে পারি না। 'বিশ্ব-মধ্যে' শব্দটিতে 'মধ্যে' ( in ) শব্দটি 'ডাজাইন'-এর দেশগত কাঠামোকে নির্দেশ করে। একজন বন্দী যে অর্থে জেলের 'মধ্যে', 'ডাজাইন' সেই অর্থে জগতের 'মধ্যে' নয়। জগতের মতো দেশও ( space ) 'ডাজাইন'-এরই একটি গঠন। হাইডেগারের মতে, দেশ জগতের দেশগত কাঠামো গঠনকারী বিষয় নয়। বরং, দেশ হলো 'ডাজাইন' কর্তৃক গঠিত কাঠামো বা গঠন। অতএব, জগৎ, ও 'ডাজাইন' যৌক্তিকভাবে অবিচ্ছেদ্য এবং বিশ্ব-মধ্যে-সত্তার এককগঠন। বিশ্ব-মধ্যে-সত্তা থেকে আলাদা করে আমরা 'ডাজাইন'-এর কথা বলতে পারি না।

হাইডেগার 'ডাজাইন'-এর যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা ভাববাদ এবং বুদ্ধিবাদ উভয়কেই খণ্ডন করে। এই বিশ্লেষণ ভাববাদকে পরিহার করে এজন্য যে, এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী এমন কোন অহং বা চেতনা নেই যার মধ্যে সমস্ত বাস্তবতা নিহিত। আর এক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদও খণ্ডিত হয়েছে, কারণ, হাইডেগার 'ডাজাইন' থেকে আলাদা করে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

হাইডেগার তাঁর দর্শনে মধ্যে-সত্তার ( Being-in ) তিনটি মূল গঠন বা ক্রিয়ার কথা বলেছেন। প্রথমটি হলো 'নিজের মুখোমুখি হওয়া' (Self in Countering)। এই গঠন বলতে হাইডেগার সেই অবস্থাকে বুঝিয়েছেন যে ক্ষেত্রে 'ডাজাইন' নিজেরই মুখোমুখি উপস্থাপিত হয়। দ্বিতীয় গঠনটি হলো 'নিক্ষিপ্ত হওয়া' ( Thrownness )। নিক্ষিপ্ত হওয়া বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিশ্ব-মধ্যে-সত্তার অবস্থাকে বোঝায়। 'ডাজাইন' সব সময়ই নিজেকে নিজের মধ্য থেকেই অভিক্ষেপণ-

রূপে বুঝে নেয়। এই অভিক্ষেপণ সম্ভব হয়, কারণ, অস্তিত্বশীলতাই 'ডাজাইন'-এর মূলধর্ম। তবে, এক্ষেত্রে অস্তিত্ব বিশুদ্ধ জগতের দিকে নয়। এই অস্তিত্ব হলো 'ডাজাইন'-এর নিজের সম্ভাবনাসমূহের দিকে। তাই 'ডাজাইন'-কে বলা হয়েছে 'সম্ভাব্য শক্তি' ( **Power-to-be** ), যার আত্মবোধ নিজের সম্ভাবনাসমূহকে ভবিষ্যতের মধ্যে অভিক্ষেপণ করে ; আর 'ডাজাইন'-এর স্বাধীনতা বলতে বোঝায় 'ডাজাইন' হলো সত্তা বা ভবিষ্যৎ শক্তির সর্বাপেক্ষা যথার্থ অনুশীলন। 'ডাজাইন'-এর ঐক্যের অপর গঠনটি হলো তার 'পতন' ( **Fallenness** )। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার জগৎ সম্পর্কে তার ভাবনার জগতের মধ্যে লীন হয়। এ ক্ষেত্রে 'পতন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তির নিজের স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জগৎ সম্পর্কে ভাবনাকে নির্দেশ করার জন্য।

সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভয়ংকর বা ভয়ের অভিজ্ঞতা 'ডাজাইন'-এর একক গঠনভঙ্গিমা প্রকাশ করে। এই ভয়ের অভিজ্ঞতা হলো জগৎ-মধ্যে এবং জগতের মুখোমুখি উপস্থাপিত ব্যক্তির উৎকণ্ঠা। এই উৎকণ্ঠার সমগ্র কাঠামোই জগৎ-মধ্যে-সত্তার মূল কাঠামো।

**যথার্থ বা প্রকৃত অস্তিত্ব :**

যথার্থ বা প্রকৃত জীবন হলো মনুষ্য-পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে রচিত জীবন। মনুষ্যত্ব এবং অমনুষ্যত্বের চরম দ্বৈততার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন হাইডেগার। তিনি এবং সার্ত্র্-ও একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই 'অস্তিত্ব' শব্দের ব্যবহার করতে চান। হাইডেগারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী একমাত্র মানুষই অস্তিত্বশীল। পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, গরু-ঘোড়া, দেবদূত, ইত্যাদি আছে, কিন্তু এগুলি অস্তিত্বশীল নয়। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। চৈতন্য অন্যান্য সব বস্তু থেকে মানুষের আমূল পার্থক্য রচনা করে। মানুষ যে বস্তুসমূহের উপস্থাপনা করতে পারে, সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, তার কারণ হলো মানুষের অস্তিত্বমূলক প্রকৃতি। মানুষ যদিও সম্পূর্ণরূপে ভৌতবিষয়সমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তথাপি সে জগতে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত। মানুষকে যে পারিভাষিক শব্দের দ্বারা হাইডেগার বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো 'ডাজাইন' ( **Dasein** )। এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'তত্র-সত্তা' ( **Being-there** )। মানুষ হলো সেই সত্তা যে তাৎক্ষণিকভাবে জগতে উপস্থিত এবং যাকে এই জগতের সঙ্গে অলঙ্ঘনীয় সম্বন্ধের মধ্যেই তার জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

মানুষের জগৎ-মধ্যে-সত্তা ( **Being-in-the-world** ) এবং জগৎ-পরিবৃত-সত্তার ( **Being-in-the-midst-of-the-world** ) মধ্যে, তার সত্তার সত্তাবৈজ্ঞানিক এবং আধিবিদ্যক দিকের মধ্যে পার্থক্য রচনা করেছেন হাইডেগার ( এবং সার্ত্র্-ও )। মানুষ আবশ্যিকভাবেই জগতে উপস্থিত। এই জগৎ থেকে মানুষ নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বা গুটিয়ে নিয়ে এমন কোন সত্তার স্বয়ং-সম্পূর্ণ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না, যা বিশুদ্ধভাবে তার নিজেরই। অবশ্য এর জন্য এই জগতেই তার নিজেকে হারিয়ে ফেলে স্থূল ভৌত বিষয়সমূহের মধ্যেই ডুবে

যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। ভৌত বিষয়সমূহ আক্ষরিক অর্থেই জগতের মধ্যে আছে—এগুলি দেশগত সত্তা। কিন্তু মানুষ আক্ষরিক অর্থে জগতের 'মধ্যে' নেই। তার জগৎ-মধ্যে-সত্তা জগতের কাছে নিছক উপস্থিতি। জগৎ-পরিবৃত-সত্তার অবস্থাকে হাইডেগার 'পতন' (**fallenness**) বলেও নির্দেশ করেছেন। এই অবস্থা বলতে হাইডেগার তাকেই বুঝেছেন যখন আমরা সবাই আমাদের চেতনার ঊষার আলো-কে দেখি। কোন আদিম স্বর্গ বা সত্তার মূল অবস্থা নেই যেখান থেকে আমরা পতিত হয়েছি—আছে কেবলমাত্র এক শ্রেষ্ঠতর 'অবস্থা যেখানে আমাদের উন্নীত হতে হবে। 'পতন', 'জগৎ-পরিবৃত-সত্তা', 'অযথার্থ' বা অপ্রকৃত অস্তিত্ব'—এগুলি হাইডেগারের বক্তব্যে সমার্থক হয়ে উঠেছে।

পতিত হওয়ার এই যে অপ্রকৃত অবস্থা বা জগৎ-পরিবৃত-সত্তার দুটি প্রান্ত আছে—বিষয়ীগত ও বিষয়গত। বিষয়ীগত প্রান্তটিকে হাইডেগার বলেছেন '**das Man**', যার অর্থ হলো একক সত্তা (**the One**)। পতিত হওয়ার অবস্থায় এক প্রকারের মিথ্যা-বিষয়ীগততা (**Pseudo-Subjectivity**) ব্যক্তি চেতনাকে চালিত করে। ব্যক্তি নিরন্তর এমন নির্দেশ ও নিষেধ মেনে চলে যেগুলির উৎস অজ্ঞাত এবং সনাক্তকরণের অযোগ্য (**Unidentifiable**)। এগুলির ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য ব্যক্তি মোটেই আগ্রহী নয়। পতিত হওয়ার বিষয়গত প্রান্তটি হলো মানুষের তৈরি জগৎ; মানুষের প্রযুক্তির দ্বারা পরিবর্তিত জগৎ। এই জগতে বস্তুসমূহ প্রায় পুরোপুরি সাধারণের (**Public**) সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র বা উপায়রূপে অস্তিত্বশীল। সত্তার যে রাজত্বের এক প্রান্ত বা দিক হলো '**das Man**'-এর মিথ্যা বিষয়ীগততা আর এক দিক হলো মিথ্যা বিষয়গততা বা কৃত্রিম মনুষ্য-পরিবেশ সেখানে আমরা আমাদের সত্তার সত্তা-বৈজ্ঞানিক (**Ontological**) উৎসের কথা ভুলে যাই। পতিত অবস্থায় বা অপ্রকৃত সত্তায় আমাদের কোন গভীর অনুভূতি থাকে না, থাকে শুধু তুচ্ছ ভীতি ও উদ্বায়ুগত (**Neurotic**) উদ্বেগ। এই জগৎ-পরিবৃত-সত্তা, পতিত অবস্থা বা অপ্রকৃত অস্তিত্ব থেকে এবং তার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে আমরা কীভাবে মুক্তি পেতে পারি? স্পষ্টতই, এই অবস্থা থেকে মুক্তি আমরা পেতে পারি উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে মানবিক ও অমানবিকের আমূল দ্বৈততা সম্পর্কে সচেতন হয়ে এবং জগৎ-মধ্যে-সত্তা ও জগৎ-পরিবৃত-সত্তার পার্থক্য বুঝে নিয়ে।

হাইডেগারের কাছে চরম বাস্তব জগৎ বিবমিষা উদ্রেককারী বিরাট অবিচ্ছিন্ন বা অবিশেষীকৃত স্ব-স্থিত বিষয় নয়; বরং তা হলো শিল্পী ও কবির জগৎ—মানুষের আবিষ্কৃত ইস্পাত ও কাঁচের জগতের চেয়ে সমৃদ্ধতর এবং উজ্জ্বলতর। বায়ু, জল, অগ্নি, ক্ষিতি ইত্যাদি স্থূল উপাদানে তৈরি এই জগৎ মানুষের সঙ্গে যেন আদেশের ভাষায় কথা বলে,—এই ভাষা হয়ত দুর্বোধ্য, তাহলেও তা অনুপ্রেরণাদায়ক। বিপরীতপক্ষে, চেতনার যে স্তরের দ্বারা মানুষ বাস্তব জগতের জ্ঞান লাভ করে তা নিজের অর্থ রচনাকারী বিশুদ্ধ শূন্যতা নয়; বরং তা হলো চেতনার সেই স্তর যা পরমসত্তার বার্তা শ্রবণ করে এবং সেই আদেশ পালনে সম্মতি প্রদান করে।

হাইডেগারের মূল আগ্রহ হলো পরমসত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণে। তিনি মানুষের অস্তিত্বের বিশ্লেষণ করেছেন, যেহেতু তা পরমসত্তার বিশ্লেষণের প্রাক্‌শর্ত। মানুষ অর্থ এবং সত্যতা আবিষ্কার করে, এ কথা হাইডেগার বিশ্বাস করেন না। মানুষ যা আবিষ্কার করতে পারে তা হলো প্রায়োগিক সত্যতা, যা প্রকৃতপক্ষে সত্যতা পদবাচ্য নয়। সত্যতাকে তার স্বরূপে বা প্রকৃত সত্যতাকে মানুষ মাত্র ততোটুকু জানতে পারে যতোটুকু সে পরমসত্তার দ্বারা আলোকিত হতে সম্মত হয়। হাইডেগারের মতে, পরমসত্তা কোন বিশেষ সত্তাও নয়, আর বিশেষ সত্তাসমূহের সমগ্রও নয়; এমন কি দৈনন্দিন জীবনের যান্ত্রিক জটিলতার জগৎ এবং জগৎ-পরিবৃত-সত্তা বা একক মানবের পরপারে অবস্থিত কোন চেতনার কাছে প্রকাশিত বিশেষ সত্তা কিংবা বিশেষ সত্তাসমূহের সমগ্র নয়। এই সত্তা হলো তাই যা জগৎকে ঘটায় এবং সংগে সংগে মানুষের কাছে এই জগতের প্রকাশ ঘটায়। যথার্থ বা প্রকৃত অস্তিত্ববান মানুষ হলো সেই ব্যক্তি যে পরমসত্তার দ্বারা আলোকিত এবং যে নিজেকে পরমসত্তার অধীনস্থ করেছে।

'বিয়িং অ্যান্ড টাইম' গ্রন্থে হাইডেগার যথার্থ অস্তিত্ববান মানুষের লক্ষণ দিয়েছেন সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুর প্রতি ব্যক্তির দৃষ্টিভংগীর পরিপ্রেক্ষিতে। যথার্থ অস্তিত্ববান মানুষ হলো সেই যে নিজের সসীমত্বকে স্বীকার করে এবং সাহসিকতার সংগে মৃত্যু নামক তথ্যের মুখোমুখি হয়ে দৈনন্দিন অস্তিত্বের অকিঞ্চিৎকরতা বা অর্থহীনতা থেকে মুক্তি পায়। ব্যক্তিসত্তার বিশিষ্টতা রচনাকারী অনিবার্য মৃত্যু ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার কাছে দৈনন্দিন জীবনের সব কাজ, সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়—সবই অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য বলে প্রমাণিত হয়।

## জাঁ-পল সার্ত্র্*

**ব্যক্তি ও তাঁর সমকাল :**

একালের অন্যতম বিতর্কিত ও বিস্ময়কর প্রতিভা জাঁ-পল সাত্র্ ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ৭৫ বছর বয়সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যে নিঃশব্দ দর্শনের জগৎ, সেই জগতের অধিবাসী হয়েও সার্ত্র্ নিঃশব্দ ছিলেন না। দার্শনিক চিন্তার মৈনাকচূড়া থেকে বারবার নেমে এসেছেন মাটির পৃথিবীতে। সারা বিশ্বকে চমকিত করেছেন সোচ্চার প্রতিবাদে।

বুদ্ধিজীবী হিসেবে সার্ত্র্-এর অসাধারণত্ব এবং মনীষার পরিচয় বহন করে তাঁর রচনাসম্ভার, আর বিরল প্রতিভার অধিকারী নিষ্ঠবান কর্মী হিসেবে তাঁর পরিচয় রয়েছে তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে। তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনা, তাঁর অস্তিবাদ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে, আত্মচরিতে, রাজনৈতিক ভাষ্যে এবং সাক্ষাৎকারে। শুধুমাত্র দার্শনিকদের মধ্যে তাঁর চিন্তাভাবনা সীমিত না রেখে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি অস্তিবাদের মূল বক্তব্যকে জনমানসে বিকীর্ণ করেছেন। যথার্থ অর্থেই সার্ত্র্-কে বোধহয় অস্তিবাদের 'প্রচার সচিব' হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে জাঁ-ব্যাপ্তিস্ত্ সার্ত্র্ এবং এনি মেরী সুইটজার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ২১ শে জুন এঁদেরই সন্তান জাঁ-পল সার্ত্র্-এর জন্ম হয়। পরের বছরই সার্ত্র্ পিতৃহারা হন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সার্ত্র্ মাতামহ চার্লস্ সুইটজারের অভিভাবকত্বে তাঁর আশ্রয়েই মায়ের সংগে দিন যাপন করেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে এনি মেরী আবার বিয়ে করেন এবং সার্ত্র্-কে তাঁর কাছে নিয়ে যান। সার্ত্র্-এর আত্মচরিত থেকে জানা যায় যে, সেখানে তাঁর দিন কেটেছে দারুণ অস্বস্তি আর অশান্তিতে। ইতিমধ্যে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে সিমন দ্য বোভয়র এবং ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে আলবের্ ক্যামু জন্মগ্রহণ করেছেন।

সার্ত্র্-এর শিক্ষাজীবন শুরু হয় স্থানীয় রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভর্তি হন রাষ্ট্রীয় উচ্চতর নর্মাল বিদ্যালয়ে। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে সেখানে থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে সাত্র্ স্নাতক হন। ঐ বছরেই ঐ পরীক্ষাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্নাতক হন সিমন দ্য বোভয়র, পরে যিনি সার্ত্র্-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও জীবন-সঙ্গিনী এবং অস্তিবাদী সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সার্ত্র বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেনাবিভাগে শিক্ষা সমাপ্তির পর অধ্যাপক হিসেবে সার্ত্র্ কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে বার্লিনের ফরাসী ইনস্টিট্যুটে

---

* জাঁ পল সার্ত্র্-এর চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক নিয়ে সঞ্জীব ঘোষ সম্প্রতি-প্রকাশিত তাঁর "জাঁ-পল সার্ত্র : জীবন ও দর্শন" বইখানিতে আলোচনা করেছেন। উৎসাহী পাঠকরা ঐ বইটি দেখতে পারেন।

রেমঁ আরোঁর জায়গায় সার্ত্র্ 'ফেলো' নির্বাচিত হন এবং এডমুণ্ড হুসার্ল ও মার্টিন হাইডেগারের কাছে সমকালীন জার্মান দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তিনি কাফ্কা, ফক্নার এবং হেমিংওয়ের রচনার সংগে পরিচিত হন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ খৃীস্টাব্দের মধ্যে সার্ত্র্ রচনা করেন 'দ্য ট্রান্সেনডেন্স্ অব্ দ্য ইগো', 'দ্য ইমাজিনেশন', 'নসিয়া', 'ইন্টিমেসি', 'দ্য ওয়াল', 'স্কেচ্ ফর এ থিওরী অব্ ইমোশন্স্' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে তিনি ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বন্দী হন। বন্দীশিবিরে অত্যাচারিত অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু সেই অবস্থায়ও সার্ত্র্ তাঁর সহবন্দীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ করার দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৪১ খৃীস্টাব্দে মুক্তিলাভ করলে সার্ত্র্ আবার অধ্যাপনায় ফিরে আসেন। ঐ বছরই আলবেতো জাকোমেত্তির সংগে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। ১৯৪২ খৃীস্টাব্দে সার্ত্র্ জাতীয় লেখক সংঘে যোগদান করেন। ১৯৪৪ খৃীস্টাব্দে ক্যামু, সালাক্রু, ভিলার, ককতো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের সংগে সার্ত্র্ নাটক সম্পর্কিত বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। ঐ বছরই তিনি ফরাসী জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনকারী কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত সার্ত্র্ ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং লে লেতর ফ্রাঁসে, কঁবা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সংগে যুক্ত ছিলেন। ফ্যাসীবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐ সব পত্র-পত্রিকায় তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ সময় সার্ত্র্ সমকালীন ফরাসী দর্শনের অন্যতম পুরোধা মরিস মার্লো পঁতি এবং আরো কয়েকজনের সংগে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধ সংস্থা 'সমাজবাদ এবং মুক্তি' প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও তা খুব একটা সফল হয় নি এবং কয়েকমাস পর তা ভেঙ্গে যায়। ১৯৪৪ খৃীস্টাব্দে সার্ত্র্ অধ্যাপক পদে ইস্তফা দেন,—উদ্দেশ্য ছিল সারাক্ষণ লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করা। ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী এবং বন্ধুবান্ধবদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সার্ত্র্ মত পরিবর্তনে রাজি হন নি। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ খৃীস্টাব্দের মধ্যে তিনি রচনা করেছেন 'দ্য ফ্লাইজ', 'দ্য ইমাজিনারী', 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থগুলি।

১৯৪৫ খৃীস্টাব্দে সার্ত্র্ কঁবা ও ফিগারো পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি লেভি স্ট্রাউস, আঁদ্রে মার্সো, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রতোঁ প্রমুখ চিন্তাবিদ্দের সংগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে হেমিংওয়ে ও জাঁ জনের সংগে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। ১৯৪৫ খৃীস্টাব্দে তিনি ফরাসী সরকারী খেতাব 'লেজিয়োঁ দ্য নর' প্রত্যাখ্যান করেন এবং 'রোডস টু ফ্রিডম্' গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। ঐ বছরেই প্যারিসে তাঁর 'এক্জিস্টেন্সিয়েলিজম্ অ্যান্ড হিউম্যানিজম্' শীর্ষক বক্তৃতা অস্তিবাদের প্রভাব অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। ১৯৪৫-এর ১৫ই অক্টোবর সার্ত্র্ তাঁর সাধের 'লে তঁ মদার্ন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ খৃীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'এক্জিস্টেন্সিয়েলিজম্ অ্যান্ড হিউম্যানিজম্',

'রিফ্লেকশন্ অন্ দ্য জ্যুইস্ কোশ্চেন', 'ডেথ্স্ উইদাউট সেপ্লেচার', 'দ্য রেসপেক্টেবল্ প্রস্টিট্যুট' প্রভৃতি গ্রন্থ। ঐ বছরই তিনি সংবিধান সম্পর্কিত রেফারেণ্ডাম-এ ভোটদানে বিরত থাকেন এবং য়ুনেস্কো-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 'লেখকের দায়িত্ব' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ক্যামুর সংগে প্রথম বিরোধের সূত্রপাত ঐ বছরেই।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন 'সিচুয়েশন-১', 'বোদলের', 'দ্য গেম্স্ আর ওভার' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং মৃত বন্ধু পল নিজ' সম্পর্কে কম্যুনিস্টদের অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। রুশ পত্রিকা 'প্রাভদা'-র আক্রমণের উত্তরও তিনি দেন ঐ বছরেই। রেম' আরোঁ এবং আর্থার কোয়েস্লারের সংগে তাঁর বিচ্ছেদও ঘটে ঐ সময়ে। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্-এর যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ইন দ্য মেস্', 'দ্য ডার্টি হ্যাণ্ড্স্' এবং 'সিচুয়েশন-২'। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ 'দ্য ডার্টি হ্যাণ্ড্স্' নাটকটিকে সোভিয়েত-বিরোধী বলে চিহ্নিত করলে সার্ত্র্ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ঐ সময় ইজরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে তিনি খোলাখুলি সমর্থন জানান। ভ্যাটিকান শহরের পোপের দপ্তর থেকে সার্ত্র্-এর সমস্ত রচনাকে বর্জনের আদেশ জারি করা হয় ঐ বছরেই। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ মার্লো পঁতির সংগে সোভিয়েত কন্সেন্ট্রেশন্ ক্যাম্পের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ইতিমধ্যে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন 'রোড্স্ টু ফ্রিডম' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড, 'ডেথ ইন্ দ্য সোল', 'সিচুয়েশন-৩', 'দ্য ডেভিল অ্যাণ্ড দ্য গুড গড' 'সেণ্ট জেনে', 'কমেডিয়ান অ্যাণ্ড মার্টিয়ার' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ সার্ত্র্-এর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্যামুর সংগে তাঁর ঐ বছরেই রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এর পর আর কোনদিনই দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে নি। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে সার্ত্র্ এক সান্ধ্য ভোজে মিলিত হন পিকাসো ও চ্যাপলিনের সংগে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর বিরুদ্ধে ঘোষণা-পত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন ঐ বছর এবং ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে বার্লিনে বিশ্বশান্তি কমিটির অধিবেশনে এবং ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে হেল্সিংকির বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সম্মেলনে সার্ত্র্ যোগদান করেন। ১৯৫৪-তে তিনি ফরাসী-সোভিয়েত সংঘের সহ-সভাপতি মনোনীত হন এবং প্রথম সোভিয়েত রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে হাঙ্গেরীতে সোভিয়েতের হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেন·সার্ত্র্, ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরাসী-সোভিয়েত সংঘের সংগে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। ঐ বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর 'নেক্রাসভ্' নাটকটি। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে আলজিরিয়ায় ফরাসী সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান সার্ত্র্। শুধু তাই নয়, আলজিরিয়ার মুক্তিসংগ্রামকে দমন করা থেকে বিরত থাকার জন্য ফরাসী সৈন্যদের কাছে আবেদন জানান। তাঁর ঐ কাজের জন্য দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসবাদীরা দু'দু'বার তাঁর ফ্ল্যাটে বোমা ফেলে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। তদানীন্তন ফরাসী রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য'গলকে তাঁর উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যরা এবং প্রাক্তন যোদ্ধারা সার্ত্র্-এর ঐ ধরনের

'রাষ্ট্রবিরোধী' কাজের জন্য তাঁকে কারাদণ্ডে বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার দাবী জানালে রাষ্ট্রপতি দ্য'গল ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনে সার্ত্র্-এর গৌরবজনক ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন—"বুদ্ধিজীবীদের কথা বাদ দাও…, ভলতেয়ারকে কখনও গ্রেপ্তার করা হয় না"।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সার্ত্রের্-এর 'অ্যালটোনা' এবং বহু বিতর্কিত গ্রন্থ 'ক্রিটিক অব্ ডায়েলেকটিক্যাল রীজন'। ঐ বছরে সার্ত্র্ তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের জন্য লাভ করেন ওমেগা পুরস্কার (ইতালি)। কিউবা ও যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণ করেন তিনি ঐ বছরে এবং ফিদেল কাস্ত্রো, চে গুয়েভারা, মার্শাল টিটো প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদদের সংগে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ রোমে গ্রামচি ইন্স্টিট্যুটে 'রহস্যবাদ এবং মার্ক্স্‌বাদ' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং গারোদির সংগে 'দ্বন্দ্ববাদ' সম্পর্কে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ সিমন দ্য বোভয়রের সংগে রাশিয়া ভ্রমণে যান একং সোভিয়েত লেখকদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় ক্রুশ্চেভ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ঐ বছরই তিনি শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আবার রাশিয়া যান।

১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'দ্য ওয়ার্ডস্', এবং 'সিচুয়েশন-৪,৫,৬'। 'নীতি ও সমাজ' সম্পর্কে সার্ত্র রোমে গ্রামচি ইন্স্টিট্যুটে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন এবং নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন ঐ বছরই। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সিচুয়েশন-৭' গ্রন্থটি। ঐ বছর তিনি ভিয়েতনামের মানুষের ওপর মার্কিন সৈন্যদের বর্বর অত্যাচার ও আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য পরিদর্শক-অধ্যাপক হিসেবে আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। দীর্ঘদিনের পরিচিতা ইহুদী মেয়ে আরলেত্ এল· কাইমকে দত্তক-কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেন সার্ত্র্ ঐ সময়েই। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত শান্তিবাদী ও মানবপ্রেমিক দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার ক্রাইম্স্ ট্রাইব্যুনাল'-এর সভাপতি হিসেবে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন "ভিয়েতনাম : ইম্পিরিয়্যালিজম্ অ্যাণ্ড জেনোসাইড" নামক চাঞ্চল্যকর তথ্যপুস্তিকাটি। ঐ পুস্তিকায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভিয়েতনামের গণহত্যার জন্য আমেরিকাকেই দায়ী করেছেন।

১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ মে-মাসের ছাত্র-বিদ্রোহকে সমর্থন করেন এবং পুলিশের দমননীতির নিন্দা করেন। চরমপন্থী এবং মাওবাদী ছাত্রসংস্থা কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপত্রে তাঁর নাম ব্যবহার হতে দেখেও তিনি কোন আপত্তি জানান নি। এমন কি, সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্রোহী চরমপন্থী ছাত্রদের সংগে তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এক বেতারভাষণে সার্ত্র্ ঐ সময় বলেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে ছাত্রদের একমাত্র যে সম্পর্ক হতে পারে তা হলো এটাকে ভাঙ্গার, আর তা করতে হলে একমাত্র উপায় হলো তাদের রাস্তায় নেমে পড়া।"

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ হারিয়েছিলেন তাঁর বিপিতা জোসেফ মঁসি-কে এবং

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী হারালেন তাঁর মাকে। ঐ বছর তিনি বিপ্লবী রেজিস্ দব্রে-র মুক্তির দাবী জানান এবং চেকোশ্লোভিয়ায় সোভিয়েত দমননীতি ও সল্জেনিৎসিন্কে সোভিয়েত লেখক সংঘ থেকে বহিষ্কারের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন "ফ্লোবের্ ঃ দ্য ইডিয়ট অব্ দ্য ফ্যামিলি'-র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ঐ বছরেই তিনি যে তিনটি পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেই তিনটি পত্রিকা হলো 'লা কোজ দ্যু প্যপ্ল্', 'তু' এবং 'রেভল্যুসিয়োঁ'। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সিচুয়েশন-৮ ও ৯' এবং 'দ্য ইডিয়ট অব্ দ্য ফ্যামিলি'-র তৃতীয় খণ্ড। পরের বছর এক প্রবন্ধের মাধ্যমে সার্ত্র্ প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে মার্চ মাসের নির্বাচন থেকে দূরে থাকার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন 'ওয়ান ইজ রাইট ইন্ রিভল্টিং' নামক একটি বিতর্কমূলক রাজনৈতিক রচনা। ১৯৬৯-এ প্রকাশিত হয় তাঁর 'সিচুয়েশন-১০'। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে দত্তক-কন্যা আরলেত্-কে নিয়ে সার্ত্র্ জেরুজালেম ভ্রমণে যান। সেখানে ইজরায়েল অধিকৃত অঞ্চলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্যালেস্টানীয় নেতাদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। এর আগের বছরেই তিনি 'আমার ইজরায়েলীয় বন্ধুদের প্রতি' শীর্ষক আবেদনপত্রে ইজরায়েলীয়দের প্যালেস্টনীয়দের সংগে আলোচনায় বসতে আহ্বান জানান।

বয়স বাড়ার সংগে সংগে সার্ত্র্-এর শরীরও খারাপ হতে থাকে। ১৯৬৯-এর আগেই দু'বার হার্ট স্ট্রোক্ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৮-তে হয়েছিল আর্থারাইটিস্-এর আক্রমণ। দৃষ্টিশক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন। অবসাদ আর বিষণ্ণতা প্রায়ই সার্ত্র্-কে আচ্ছন্ন করে রাখত। কিন্তু বিশ্রাম নিতে তিনি জানতেন না। সারাক্ষণ কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখাই ছিল তাঁর ধর্ম। যখন বুঝতে পারতেন কাজ করতে শরীরে কুলোচ্ছে না তখনই নানা উত্তেজক দিয়ে শরীরটাকে চাঙা রাখার চেষ্টা করতেন। ফলে বাতি নেবার দিন এগিয়ে এলো। অসুস্থ অবস্থায় সার্ত্র্-কে ব্রুসেই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ১১ দিন বাদে ঐ হাসপাতালেই সার্ত্র্ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ যখন মারা গেলেন তখন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শোক প্রকাশ করতে এসেছিলেন হাজার হাজার লোক। বিরাট এক শোকমিছিল শবযানকে ঘিরে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল মোঁপারনস সেমিট্রি-তে। সার্ত্র্-এর দেহ ঐ সেমিট্রি-তে সমাধিস্থ করা হয়। মানবদরদী ঐ মানুষটির জন্য প্রতিদিন ঐ সমাধিতে অসংখ্য তাজা ফুলের স্তবক পড়ে আজও।

**সার্ত্র্—মানসঘটনাবাদ থেকে অস্তিবাদ ঃ**

মানসঘটনাবাদের জনক হুসার্লের মন্ত্রশিষ্য সার্ত্র্ হুসার্লের পথ অনুসরণ করেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। উৎপত্তির সময়ে মানসঘটনাবাদ ছিল সারসত্তাসমূহের (Essences) দর্শন। সমস্ত রকম অস্তিত্ব এবং তথ্যগত উপাত্তকে বন্ধনীভুক্ত (Bracketing) করে মানসঘটনাবাদ ভাবজ সারসত্তাসমূহকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। কিন্তু

মানসঘটনাবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত হুসার্ল 'জীবনের জগৎ' বা 'বেঁচে থাকার জগৎ'-এ উপনীত হয়েছিলেন। জগতের মধ্যে চেতনার উপস্থাপনা ক্রমশঃ অধিকতর আবশ্যিক এবং অবিনশ্বর হয়ে উঠেছিল। মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ চেতনার আভিমুখ্যতাকে প্রকাশের পথ করে দিয়েছিল, আর এই আভিমুখ্যতাই চেতনাকে বস্তু এবং জগতের সংগে সম্পর্কযুক্ত করেছিল। অতএব, বলা যায়, অস্তিবাদীর জগৎ-মধ্যে-সত্তা (Being-in-the-world) ইতিমধ্যেই মানসঘটনাবাদী পদ্ধতির মধ্যে সুপ্ত ছিল,—হুসার্ল থেকে হাইডেগারের মধ্য দিয়ে সার্ত্র্ পর্যন্ত অবিরাম ধারায় তার অগ্রগতি ঘটেছে। এটা স্বীকার্য যে, সার্ত্র্ তাঁর পূর্বসূরীদের চিন্তাভাবনাকে বিস্তৃত করেছেন এবং মানসঘটনাবাদকে নতুন দিকে নিয়ে গেছেন। তাই বোধহয় অনেক সমালোচক বলেন যে, সার্ত্র্ যতো না হাইডেগার-পন্থী তার চেয়ে বেশী হুসার্ল-পন্থী। হাইডেগারের মতো সার্ত্র্ও প্রথম থেকেই হুসার্লীয় পরিকল্পনাকে আরো চরমরূপে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি হাইডেগারের বিপরীত-পন্থী। সার্ত্র্-এর দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি হুসার্লের অতীন্দ্রিয় বা অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব অহং-কে (Transcendental ego) আক্রমণ করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল অহং-এর চেতনা-বৈশিষ্ট্যকে আরো গুরুত্ব প্রদান। সার্ত্র্ হুসার্লের মানসঘটনাবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করলেও হুসার্লের অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব অহং-এর ধারণা বর্জন করেছেন এই কারণে যে, ঐ ধারণা আত্মকেন্দ্রিকতাবাদকেই সূচিত করে। সত্তা নয়, বরং অস্তিত্বকে প্রকাশিত করাই ছিল সার্ত্র্-এর মূল উদ্দেশ্য। হাইডেগারের সংগে তাঁর পার্থক্য হলো এই যে, তিনি নিজেকে মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন। সার্ত্র্ মনে করেন যে, যেহেতু মানসঘটনাবাদ আভিমুখ্যতারূপী চেতনার সংজ্ঞা দেয়, সেহেতু একটি অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব বা অতীন্দ্রিয় 'আমি'-র সংযোজন বাহুল্য মাত্র। এই সংযোজন শুধু বাহুল্যমাত্রই নয়, তা অনিষ্টকরও বটে। অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব অহং-এর সংযোজনের ফলে চেতনার মৃত্যু ঘটে। সার্ত্র্-এর কথায়, "অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব অহং-এর ধারণা চেতনার মৃত্যুতুল্য"; সার্ত্র্-এর মতানুসারে, চেতনার প্রকৃতি উন্মোচনের জন্য 'আমি'-কে জগতের দিকেই উপস্থাপিত করতে হবে, কেননা, অন্যসব বিষয়ের মতো 'আমি'ও চেতনারই একটি বিষয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে, চেতনার আভিমুখ্যতা আরো বেশী চরমনীতি হয়ে গেল। চেতনার আর কোন উপাদান রইল না, সব কিছুই চেতনার বহির্ভূত হয়ে গেল।

সার্ত্র্ মানঘটনাবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করেই চেতনার আকারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অহং-মুক্ত বা অহং-বিহীন (Non-Egological)। এর দ্বারা তিনি মানসঘটনাবাদকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর মতে, 'আমি' বস্তুতপক্ষে বিশ্ব মধ্যেই অবস্থিত। আমাদের এইটুকুই বলা উচিত যে, চেতনা আছে। হাইডেগার 'ডাজাইন্' (Dasein)-এর প্রতিষ্ঠার জন্য হুসার্লের অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব অহং-চেতনাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, আর সার্ত্র্ হুসার্লের বিরুদ্ধেই অহং-কে পরিত্যাগ করলেন। এই ভাবে সার্ত্র্ হাইডেগারের বিরুদ্ধে হুসার্লীয় চেতনাকে সুরক্ষিত করলেন, মানসঘটনাবাদী চেতনার বিশুদ্ধ প্রত্যয়ের পুনরাবিষ্কার করলেন।

এ ক্ষেত্রে তিনি সুগভীরভাবেই হুসার্লীয় অভিপ্রায়ের বিশ্বস্ত অনুগামী হয়েছেন।

এ প্রসংগে আমরা সংক্ষেপে সার্ত্র্-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে পারি। যদি সব কিছুই চেতনার বহির্বর্তী হয়, তা হলে চেতনা কোন কিছু নয় ; চেতনা হলো শূন্যতা। চেতনা হলো স্ব-হেতু-সত্তা (Being-for-itself) এবং বস্তুসমূহ হলো স্ব-স্থিত-সত্তা (Being-in-itself)। চেতনা হলো আত্মার চেতনা। সার্ত্র্ আরো বলেছেন যে, চেতনা হলো স্বাধীনতা। চেতনার যা এখনও আয়ত্ত নয় তা আয়ত্ত করার চিরন্তন সম্ভাবনা রয়েছে, এবং চেতনা এখন যা আছে তা থেকেই এখনও যা নয় তাই হতে পারে। এই ভবিষ্যতের দিকেই চেতনার যাত্রা। এটাই হলো স্বাধীনতা। চেতনা নিজেই নিজের আভিমুখ্যতার উৎস। চেতনা হলো একটি পরিকল্পনা। চেতনা হলো বিশুদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ততা। চেতনা নিজেই নিজের ভিত্তি। সার্ত্র্-এর মতে, মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ জগতের নাস্তিকরণ করে, জগৎকে ধ্বংস করে না। সার্ত্র চেতনাকে নেতিবাচক বর্ণনায় আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। চেতনার কাঠামোটাই, তাঁর মতে, শূন্যতা। চেতনার যে অভাববোধ তার নামই শূন্যতা। যা ব্যক্তি নয় তাকে এড়িয়ে চেতনার অস্তিত্বই অসম্ভব। চেতনার প্রকৃতিই শূন্যতা বা স্বাধীনতা। আসলে, সার্ত্র্-এর দর্শনে স্ব-হেতু-সত্তা, চেতনা, শূন্যতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি শব্দ প্রায় সমার্থক শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

চেতনা বা স্ব-হেতু-সত্তা, সার্ত্র্-এর মতে, স্ব-স্থিত-সত্তাকে আড়াল করে দেয় না ; বরং বলা যায়, স্ব-স্থিত-সত্তাই চেতনার লক্ষ্য। চেতনা আদর্শাভিমুখী, আর এই আদর্শ হলো জড়বস্তুর বা স্ব-স্থিত-সত্তার সংগে এক হওয়ার বাসনা। মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ চেতনাকে বিচ্ছিন্ন করে না ; বরং এর দ্বারাই চেতনা জগতে নিযুক্ত হয়, চেতনা হয়ে ওঠে জগতের চেতনা, পরিস্থিতির চেতনা। চেতনা এবং বস্তু, স্ব-হেতু-সত্তা এবং স্ব-স্থিত-সত্তা, পরস্পরবিরোধী নয় ; বরং বলা যায়, বস্তুজগৎ চেতনার পক্ষে অপরিহার্য।

সার্ত্র্ তাঁর চেতনা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কীয় নতুন দৃষ্টিভংগীর সাহায্যে মানসঘটনাবাদকে এক ক্রিয়ার দর্শনে (Philosophy of activity) রূপান্তরিত করেছেন। সার্ত্র্-এর ব্যাখ্যায় চেতনা নিছক সত্তা নয়, সে নিজেকে তৈরি করে, নিজেকে সৃষ্টি করে। যেহেতু চেতনা হলো শুদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ততা, সেহেতু চেতনার কাজ হলো নিজেকে নির্বাচন করা, আবিষ্কার করা। এখানেই সার্ত্র্-এর সত্তাবিজ্ঞানের ভিত্তি। স্বহেতু-সত্তা এবং স্ব-স্থিত-সত্তার দ্বিতত্ত্ব আর থাকে না। সত্তা এবং ক্রিয়া সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সার্ত্র্-এর দর্শন হয়ে ওঠে মূলতঃ ক্রিয়ার দর্শন। অস্তি অর্থই ক্রিয়া। সার্ত্র্-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানসঘটনাবাদী কেন্দ্রীকরণ বা সীমিতকরণ প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকরণ ; আর সেজন্য এই নাস্তিকরণ হলো জগৎকে পরিবর্তিত করার আকাঙ্ক্ষা। একে আত্মপরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাও বলা যেতে পারে, কারণ, আমি জগতেরই একটি অংশ। মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণের প্রক্রিয়ায় অহংও সীমিত বা বন্ধনীভুক্ত হয়ে যায়, আর এভাবেই সার্ত্র্ উপনীত হন শূন্য চেতনায়।

তাই মানসঘটনাবাদ, যা ছিল স্বজ্ঞামূলক, চিন্তামূলক, উন্মোচনমূলক দর্শন, তা রূপান্তরিত হলো ক্রিয়ায় দর্শনে। সার্ত্র্-এর ক্রিয়ার দর্শনের মৌলিকতা হলো এই যে, এমন কোন ক্রিয়া নেই যা উন্মোচন নয়। একমাত্র ক্রিয়াই আমাদের জানতে সমর্থ করে তোলে। চিন্তা বা বোধ এবং ক্রিয়া একসাথে চলে।

সার্ত্র্-এর কাছে মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ এই তাৎপর্য বহন করে আনে যে, মানুষ নিজেকে তার অতীত থেকে ও নিয়ন্ত্রণবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং ভবিষ্যতের দিকে অভিক্ষেপণ করে। এই অভিক্ষেপণ আবার সংগে সংগে ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানের দিকে অগ্রগমন করে। মানুষ ভবিষ্যতের ভিত্তিতেই নিজের কাছে উপস্থাপিত হয়, তার লক্ষ্যসমূহের দ্বারাই নিজেকে চিনতে পারে। মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণকে এইভাবে প্রয়োগ করলেই তা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে অতীতের নিয়ন্ত্রণ থেকে ছিন্ন হয়ে আসা এবং ভবিষ্যৎ থেকে ফিরে আসা। এইভাবে আমরা মানসঘটনাবাদী চিন্তাধারার দুটি পরস্পর-পরিপূরক গতি লক্ষ্য করি,—বন্ধনীকরণ ও আভিমুখ্যতা এবং এই দ্বিমুখী গতিতে বর্তমানের চেতনার সংজ্ঞা দান।

হুসার্লের মানসঘটনাবাদে যে উদ্দেশ্যমুখীনতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা আবার দেখি সার্ত্র্-এর চিন্তাভাবনায়। কিন্তু সার্ত্র্-এর উদ্দেশ্যবাদ হুসার্লীয় উদ্দেশ্যবাদ থেকে ভিন্ন। বাস্তব তত্ত্বের দিক থেকে 'যা ইতিমধ্যেই আছে' তার অনুসন্ধানরূপেই হুসার্লীয় মানসঘটনাবাদের শুরু হয়েছিল। কিন্তু সার্ত্র্-এর দর্শনে 'ইতিমধ্যেই আছে' বলে কিছু নেই, কেননা, তাঁর কাছে মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ শূন্যতা পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তা হলেও স্বাধীনতা যেহেতু প্রদত্ত (given) কিছু নয়, যেহেতু তা পরিকল্পনা বা মুক্তির অভিক্ষেপণ মাত্র, সেহেতু তা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই প্রতিরোধ শুধু বাস্তব পরিস্থিতি থেকে আসে না, 'মিথ্যা বা মন্দ বিশ্বাস' (Bad faith)-এর প্রলোভন থেকেও আসে। এই 'মিথ্যা বিশ্বাস' (বা আত্মপ্রবঞ্চনা) দায়িত্ব থেকে, সিদ্ধান্ত বা সংকল্প গ্রহণ থেকে, সরে থাকতে আমাদের প্রলুব্ধ করে। যেহেতু প্রত্যেক ক্রিয়াই হলো কোন পরিবর্তন, প্রচেষ্টা, কিংবা সংগ্রাম, সেহেতু তা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং ব্যর্থ হয়। মুক্ত বা স্বাধীন চেতনার সফলতাই হলো তার ব্যর্থতা। তা হলে, মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণকে সার্ত্র্ যেহেতু জগৎ ও জীবনে স্বাধীন ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করেছেন, সেহেতু এই পদ্ধতির সম্পূর্ণতা (completeness) অসম্ভব প্রমাণিত হয়। অন্ততঃপক্ষে অবিরাম ধারায় এই পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। সার্ত্র্-এর মানসঘটনাবাদী ক্রিয়ার দর্শন নতুন করে হুসার্লীয় পদ্ধতির উপস্থাপনা করে। এই পদ্ধতি অনন্ত পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি। এই ক্রিয়ার সমাপ্তি বা শেষ নেই। এই অনন্ত ক্রিয়া যদি ব্যর্থতারই নামান্তর হয়, তা হলে এ ক্ষেত্রে হুসার্লীয় মানসঘটনাবাদ পরিত্যক্ত বা অতিক্রান্ত হয়।

মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ সার্ত্র্-এর দর্শনে চরমতম প্রকৃতিবাদ বিরোধী এবং জড়বাদ বিরোধী মতবাদে পরিণতি লাভ করেছে। সার্ত্র্ মানুষ সম্পর্কে প্রকৃতিবাদ বিরোধী, জড়বাদ বিরোধী মতবাদ প্রদান করেছেন। তাঁর মতানুযায়ী, মানুষ প্রাণীমাত্র নয়, এমন কি যুক্তিবান প্রাণীও নয়। জগৎ কিংবা অন্য কোন

রাজ্যের ভিত্তিতে মানুষকে ব্যাখ্যা করা যায় না। চেতনা হলো শূন্যতা—সত্তাবিহীন বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। মানুষের কোন স্থিরীকৃত বা নির্দিষ্ট সারধর্ম নেই। প্রতিমুহূর্তেই সে নিজেকে নতুন করে তৈরি করে। চেতনা হলো বিশুদ্ধ বিষয়ীগততা, আর এই চেতনা একাই সমগ্র মানুষকে ধরে রাখে। অবশ্য, এই চেতনা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এর শূন্যতাই একে পরিপূর্ণরূপে জগতের সংগে বেঁধে রাখে। এর আভিমুখ্যতা এর শূন্যতা বা স্বাধীনতার মতোই একে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। মানুষের বৈশিষ্ট্য বা অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষের সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না, মানুষ সব সময় অনিয়ন্ত্রিত। মানুষকে বুঝতে হবে তার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিতেও মানুষকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। সার্ত্র্ সম্পূর্ণরূপে অহং এবং জগতের সীমিতকরণ করেছেন; তারপর তিনি ঈশ্বরেরও মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ করেছেন। মানুষের মনুষ্যত্বের আবিষ্কারের জন্য চেতনাকে, নিজেকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, যেমন সে নিজেকে অহং এবং জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অতএব, ঈশ্বর মানুষের ভিত্তি নয়। তবে, অস্তিবাদী নিরীশ্বর তত্ত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণের চেষ্টা করে না, বরং অস্তিবাদ (সার্ত্র্-এর) ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলেও মনুষ্য-পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটে না।

যাই হোক, যদিও সার্ত্র্-এর দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ তাঁর মন্ত্রগুরু হুসার্লের সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন, তা হলেও সার্ত্র্-এর দর্শনে মানসঘটনাবাদী পদ্ধতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মানসঘটনাবাদী ধারায় তিনি তাঁর চিন্তাকে পরিস্থিতিতে নিযুক্ত ক্রিয়া এবং ইতিহাসের বিশ্লেষণের দিকে বিন্যস্ত করেছেন।

**সার্ত্র্-এর অস্তিবাদে 'কর্ম' বা 'ক্রিয়া'-র ধারণা :**

সার্ত্র্-এর অস্তিবাদের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই দর্শন 'মানুষ' থেকে যাত্রা শুরু করেছে, 'প্রকৃতি' থেকে নয়। গতানুগতিক পাশ্চাত্ত্য দর্শন যেভাবে মানুষকে চিত্রিত করেছে, সার্ত্র্ তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হেগেলের বিশ্ব-ন্যায় এবং পরমাত্মাবাদের প্রতি সার্ত্র্-এর বিরূপ মনোভাবের কথা সুবিদিত। হেগেলের দর্শন অস্তিত্বশীল ব্যক্তি মানুষকে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার সংগে অভিন্ন বলে মনে করেছে এবং এর ফলে ব্যক্তির বিষয়ীগততা অস্বীকৃত হয়েছে। সার্ত্র্-এর দর্শন বিষয়ীর দর্শন, বিষয়ের দর্শন নয়। এই বিষয়ী তাঁর দর্শনে শুধুমাত্র চিন্তাশীল বিষয়ী নয়, কর্মোদ্যোগী (initiator of action) এবং অনুভূতির কেন্দ্রও বটে। অস্তিত্বের এই সামগ্রিক রূপ, যা সাক্ষাৎভাবে এবং মূর্তভাবে অস্তিত্বশীল হওয়ার কর্মে বা ক্রিয়ায় ধরা দেয়, তা অস্তিবাদের আলোচ্য বিষয়।

'বীয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্' গ্রন্থে সার্ত্র্ স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, স্বাধীনতার ধারণাটি বিশ্লেষণ করার আগে 'কর্ম' বা 'ক্রিয়া'র (Action) ধারণাটি বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। সার্ত্র্-এর মতানুসারে, মানুষ সামগ্রিকভাবে অস্তিত্বশীল। বিচ্ছিন্নভাবে মানুষকে বিচার করা সংগত নয়। মানুষ প্রথমে

অস্তিত্বশীল এবং তার পর ক্রিয়াশীল হয় বা কর্মে প্রবৃত্ত হয়, এ ধারণা করা ঠিক নয়। বস্তুতঃ, মানুষ প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল। সার্ত্র্-এর অস্তিবাদে 'মানুষ'-এর ধারণা স্থানুধর্মিতা বর্জিত এবং ক্রিয়াশীল গুণে গুণান্বিত। কর্মের আলোচনা প্রসংগে সার্ত্র্ শুরুতেই বলেছেন যে, "এটা বিস্ময়কর যে, দার্শনিকরা অনবরত নিয়ন্ত্রণবাদ ও ইচ্ছার স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেন, দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ দিয়ে কেউ এক পক্ষকে, আবার কেউ অন্য পক্ষকে, সমর্থনও করেন, কিন্তু কেউই এই প্রসঙ্গে কর্মের ধারণার মধ্যে নিহিত কাঠামোকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নি।"

সার্ত্র্-এর দর্শন অঙ্গীকারের দর্শন, কর্মের দর্শন, সংহতির দর্শন। তিনি ক্যামু ও কাফকার নৈরাশ্যবাদ থেকে দূরে থেকেছেন, যাতে একটি ইতিবাচক নীতিদর্শনের উপস্থাপনা করা যায় যা মানুষ আশা করতে পারে এবং যা মানুষ তার অঙ্গীকারবদ্ধ বা দায়বদ্ধ কর্মের মাধ্যমে লাভ করতে পারে। নীৎসের প্রভাবে সার্ত্র্ ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, মানুষের একমাত্র আশা-ভরসা সে নিজে। আধুনিক চিন্তাজগতে সার্ত্র্-এর অবদান হলো এই যে, তিনি কর্ম ও সংহতির দর্শনের সাহায্যে অসংগত মনুষ্য-পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে বলেছেন। সার্ত্র্-এর দর্শন একটি আশাবাদী দর্শন, কারণ, তা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহ দেয় এবং মানুষই যে তার ভাগ্য-নিয়ন্তা ও কর্ম ছাড়া যথার্থ অর্থে বাঁচার কোন যে সম্ভাবনা নেই তা শিক্ষা দেয়।

অনেককাল ধরেই নীতিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সত্তার পথ (way of being) নির্দেশ করা। স্টোয়িক নৈতিকতা বা স্পিনোজার নীতিদর্শনের অর্থ তাই। কিন্তু মানুষের সত্তাকে যদি তার কর্ম-পরম্পরায় পুনরায় মনোযোগী হতে হয়, তা হলে মানুষকে আরো উন্নত সত্তামূলক স্তরে উন্নীত করা নীতিদর্শনের লক্ষ্য হতে পারে না। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টই প্রথম এমন একটি নৈতিকতার কথা বললেন, যা মানুষের সত্তার চেয়ে কর্মকেই প্রাধান্য দিল। কান্টের নৈতিকতার ধারণা সেদিক থেকে প্রশংসনীয়। স্টোয়িক নৈতিকতা এবং স্পিনোজার নীতিদর্শন যেমন সার্ত্র্-এর কাছে তাৎপর্যহীন, তেমনি পুরোনো ফ্যাকাল্টি-মনোবিজ্ঞানও সার্ত্র্-এর কাছে তাৎপর্যহীন। "আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি"—দেকার্তের এই বিখ্যাত নীতিটিও সার্ত্র্-এর কাছে গ্রহণীয় নয়। কেননা, আমি মুখ্যত একজন চিন্তাশীল বিষয়ী নই। আমি প্রথমে অস্তিত্বশীল। 'অস্তিত্ব' 'চিন্তার' চেয়ে ব্যাপক এবং চিন্তার চেয়ে পূর্ববর্তীও। অস্তিত্বের অর্থই হলো স্বাধীনভাবে কর্ম করে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে বেঁচে থাকা। তাই সার্ত্র্-এর মতে, "আমি চিন্তা করি" একথার বদলে বলতে হবে "আমি কর্ম করি"। জাগতিক ব্যাপারের সংগে জড়িয়ে থাকা বহুমাত্রিক মানবিক অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ, কর্মই হবে দর্শনের প্রস্থানবিন্দু, বিমূর্ত চিন্তাশীল দ্রব্য নয়। কর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সার্ত্র্ বলেছেন যে, "কেবলমাত্র কর্মেই অস্তিত্ব মূর্ততা ও পূর্ণতা লাভ করে।"

'কর্ম' বা ক্রিয়া বলতে সার্ত্র্ কী বুঝিয়েছেন? তাঁর মতানুসারে, যে কোন ক্রিয়া কর্ম নয়। সক্রিয়তামাত্রকে কর্ম বলা যায় না। সার্ত্র্-এর কাছে কর্ম একান্তই

ব্যক্তিগত এবং সমগ্র ব্যক্তিই এতে জড়িয়ে থাকে। চিন্তা এবং অনুভূতি (passion) উভয়ই কর্মের অন্তর্গত। চিন্তা, অনুভূতি এবং অন্তর্মুখী বা স্ব-মুখী সংকল্প ছাড়া 'কর্ম' কথাটির তাৎপর্য বোঝা যায় না। সার্ত্র্-এর কাছে বাহ্যিক ক্রিয়া এবং কর্ম সমার্থক নয়। কর্মে সমগ্র ব্যক্তি ক্রিয়া করে বলে মানব-অস্তিত্বের রহস্য কর্মেই বিধৃত। বাহ্যিক ক্রিয়ার সাফল্যের দ্বারা কর্মের বিচার করা সংগত নয়। সার্ত্র্-এর অস্তিবাদ সেজন্যই প্রয়োগবাদ (Pragmatism) নয়। মানুষ শুধু কিছু ক্রিয়ার সমষ্টি-মাত্র, বা কিছু ভূমিকা পালনকারীমাত্র নয়। মানুষ হলো এক ঐক্য, যা নিজেকে বিভিন্ন ক্রিয়া বা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করে, অথবা বলা যায়, বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি বা সৃষ্টি করে।

সার্ত্র্ মানসঘটনাবাদী দৃষ্টিভংগী থেকে কর্মের বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, কর্মের একটি আভিমুখ্যতা রয়েছে, অর্থাৎ কর্ম সবসময়ই কোন উদ্দেশ্যাভিমুখী। ক্রিয়ামাত্রই যে কর্ম হতে পারে না তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ত্র্ বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্যমনস্কভাবে বা অবহেলায় জ্বলন্ত সিগারেটের টুক্‌রো ফেলে দিয়ে কারখানায় আগুন লাগায় বা বিস্ফোরণ ঘটায় তা হলে ঐ কাজকে 'কর্ম' বলে চিহ্নিত করা যাবে না। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি কারখানায় আগুন লাগাবার জন্য বা বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য স্বেচ্ছায় জলন্ত সিগারেটের টুক্‌রো ছুঁড়ে দেয়, এবং এর ফলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তা হলে তার ঐ কাজ 'কর্ম' নামে চিহ্নিত হবে। কর্ম তাই চেতন পরিকল্পনাকে বা উদ্দেশ্যের উপলব্ধিকে সূচিত করে। কর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সার্ত্র্ বলেছেন যে, যা এখনও এখানে নেই তাকে এখানে পাওয়ার ইচ্ছা ও তজ্জনিত যে ক্রিয়া তাই হলো কর্ম। কর্ম অভাববোধকে সূচিত করে। কোন প্রত্যাশার ভিত্তিতেই আমরা কর্ম করি বলে সার্ত্র্ মনে করেন। আমি এখনও যা নই, কী করে তা হয়ে উঠতে পারি—আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা একে কেন্দ্র করেই। এই জগৎ আমার সকল সম্ভাব্য কর্মের ক্ষেত্র, যা আমার ভবিষ্যৎকে সূচিত করে। সার্ত্র্-এর মতে, "কর্ম হলো যা নয় তার প্রতি স্ব-হেতু-সত্তার অভিক্ষেপ (Projection)।" তিনি বলেছেন যে, কর্ম করার অর্থই হলো জগতের আকারকে পরিবর্তন করা। মানুষের স্থান জগতের মধ্যেই, বাইরে নয়, এবং মানবিক জগৎ ও চেতনার সংযোগ হয় কর্মের মাধ্যমেই। বর্তমানে আমি যা তাকে অস্বীকার করে ভবিষ্যতে আমি যা হতে চাই—একেই স্ব-হেতু-সত্তার অভিক্ষেপ বলা হয়েছে, তার জন্য যে সচেতন কর্ম তাকেই সার্ত্র্ বলেছেন স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ যদি তাই হয়, অর্থাৎ, স্বাধীনতা বলতে যদি বোঝায় না-চাওয়া বর্তমানকে অস্বীকার করে চাওয়া-ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা, তা হলে কর্ম ও স্বাধীনতা প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, আর সার্ত্র্ বস্তুত বলেছেনই যে, সকল কর্মই স্বাধীন। 'কর্ম' ও 'স্বাধীনতা' শব্দ দুটি সার্ত্র্ সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেন নি, করেছেন বিশেষ অর্থে। মানসঘটনাবাদের জনক হুসার্লের অনুসরণে সার্ত্র্ বলেছেন যে, চেতনা 'এখন যা আছে' তা থেকে 'এখনও যা নয়' তা হতে পারে আর 'এখনও যা নয়' তা হতে পারার সম্ভাবনার জন্যই কর্মের প্রয়োজন। কর্মের মূল রয়েছে তাই চেতনার লক্ষণের মধ্যে। সার্ত্র্ বলেছেন, কর্মক্ষেত্র হিসেবে জগৎকে প্রত্যক্ষ করার

অর্থই হলো জগৎকে 'অপূর্ণ' (lack) হিসেবে প্রত্যক্ষ করা, যে অপূর্ণতা দূর করা সম্ভব একমাত্র কর্মের মাধ্যমেই। সার্ত্র্-এর মতে, "জ্ঞান এবং কর্ম একই মূল সম্বন্ধের দুটি দিক ; জ্ঞানের মাধ্যমে যদি জগৎ প্রকাশিত হয়, তা হলে কর্মের মাধ্যমে জগৎ গঠিত হয়"।

উপরি-লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, সার্ত্র্-এর 'কর্ম'-এর ধারণার বিশ্লেষণ থেকে দুটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, যথা,

১। কোন বাস্তব অবস্থা (Factual state) নিজে কাউকে কর্মে প্রবৃত্ত করতে সমর্থ নয়। কারণ, কর্ম হলো 'যা নয়' (what is not) তার প্রতি স্ব-হেতু-সত্তার অভিক্ষেপ। 'যা আছে' (what is) তা কখনও 'যা নয়' তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

২। কোন বাস্তব অবস্থা নিজে তাকে 'অপূর্ণ' হিসেবে উপলব্ধি করতে চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

সার্ত্র্-এর অস্তিবাদে মানুষ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্র নয়। সমাজের সংগে, জগতের সংগে সে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। মানুষ পরিবেশকে, যুগধর্মকে এড়িয়ে থাকতে পারে না ; তাকে কোন না কোন ভূমিকা পালন করতেই হয়, আর ঐ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাকে কিছু কর্মও করতে হয়। কর্মেই মানুষের স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা কোন জন্মগত গুণ নয়, যা আমাদের চূড়ান্ত বাধ্যতামূলক অবস্থা ছিন্ন করে বেড়িয়ে আসার ছাড়পত্র দেয়। সার্ত্র্-এর কাছে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় কর্ম করার অঙ্গীকারের ক্ষমতা এবং কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ রচনার সামর্থ্য। সার্ত্র্-এর দর্শন তাই কর্ম ও সংহতির দর্শন, অঙ্গীকারের দর্শন।*

### সার্ত্র্ বনাম ক্যামু—একটি রাজনৈতিক বিরোধ :

বিশ শতকের দুই বিস্ময়কর ও বিরল প্রতিভা জাঁ-পল সার্ত্র্ এবং আলবেরু ক্যামু দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতির জগতে এমন একটা উঁচু আসন পেয়েছিলেন যা যে কোন বিচারেই অসাধারণ। এঁদের দুজনের ভাব-ভাবনা শুধু যে পশ্চিমী দুনিয়াকেই প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল তাই নয়, তৃতীয় দুনিয়াতেও এঁদের চিন্তাধারার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সার্ত্র্ ও ক্যামুর ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের সূত্রপাত ১৯৪২-৪৩ খ্রীস্টাব্দে—প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় থেকেই। প্রায় দশ বছর ধরে চলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের যৌথ প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু ঐ রাজনীতির সূত্র ধরেই উভয়ের বন্ধুত্বে ফাটল ধরেছিল এবং ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে চিরকালের জন্য উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। বিরল প্রতিভার অধিকারী এই দুই মনীষীর বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং পরবর্তীকালের বিরোধ বিশ্বের সাহিত্য ও রাজনৈতিক সচেতন মানুষের কাছে এক স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সার্ত্র্ এবং ক্যামু উভয়েই যদিও 'অস্তিবাদী' হিসেবে চিহ্নিত, তবু দুজনের

বৌদ্ধিক পটভূমিকা ছিল ভিন্ন। সার্ত্র্ জন্ম নিয়েছিলেন উচ্চ-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে। শৈশবে পিতৃহারা হলেও মাতামহ চার্লস্ সুইটজারের প্রযত্নে তাঁর দিন কেটেছে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে। লেখাপড়া শিখেছেন রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে। কৃতিত্বের সংগে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে সার্ত্র্ ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সাফল্যের সংগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। স্বভাবতই সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরী পেতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সার্ত্র্ ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বন্দী হন। অত্যাচারিত অবস্থায় জার্মান বন্দীশিবিরে তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সার্ত্র্-এর জীবনে কোন বড় রকমের ঝড়-ঝাপটা আসে নি। লেখা-পড়া, শিক্ষকতা, সাহিত্য-দর্শনচর্চা আর নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। মোটামুটিভাবে বামপন্থী চিন্তাভাবনা থাকা সত্ত্বেও সার্ত্র্ রাজনীতি নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ করেন নি। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে সমাজের কিছু কিছু নিয়ম তিনি অমান্য করেছিলেন। কিন্তু এ সবকে অনেকেই 'মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিগত বিদ্রোহ' বলে চিহ্নিত করেছেন। পোলিটজার দেখাতে চেয়েছেন যে, সার্ত্র্ মনে-প্রাণে একজন পাতি-বুর্জোয়া। সার্ত্র্ নিজেও তা অস্বীকার করেন নি। তবে, তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে, শুধু পাতি-বুর্জোয়া বললেই তাঁর দৃষ্টিভংগীর পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। তিনি হলেন সেই সমস্যাপূর্ণ বুর্জোয়া-ঐতিহ্যানুযায়ী বুদ্ধিজীবী যিনি তাঁর শ্রেণীসুলভ বিশ্বাসের উর্ধ্বেও উঠতে পারেন।

এ কথা সংশয়াতীতরূপে সত্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সার্ত্র্-এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিভংগী গিয়েছিল পাল্টে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের আগে সার্ত্র্-এর সমস্যা ছিল ব্যক্তিকে ঘিরে। কিন্তু ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ থেকেই তাঁর লেখায় এবং কর্মকাণ্ডে দেখা গেল এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন। একজন মনস্তাত্ত্বিক ও নীতিবাদী লেখক থেকে তিনি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে লাগলেন একজন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষক হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতিই সার্ত্র্-কে তাঁর প্রথম জীবনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানসিকতার গণ্ডী পেরিয়ে সমাজতান্ত্রিক পূর্ণ মানুষের কথা বলার প্রেরণা জুগিয়েছে। সার্ত্র্-এর প্রথম জীবন কেটেছে রাজনৈতিক উদাসীনতায়। তাই তিরিশের দশকের প্রথমদিকের রাজনৈতিক টালমাটাল তাঁকে তেমনভাবে স্পর্শ করে নি, পল নিজাঁর সংগে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও। বোধহয় সেজন্যই হিটলারের ছায়ায় আচ্ছন্ন বার্লিনের ফরাসী ইনস্টিটুটে হুসার্ল-চর্চার সময় সার্ত্র্ লক্ষ্য করেন নি ফ্যাসীবাদের অভ্যুদয়। ফ্রান্সে ফিরে এসেও তিনি ছিলেন প্রায় সমান উদাসীন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাত সার্ত্র্-কে যখন রাজনীতি সচেতন করে তুলল, তখন তিনি পল নিজাঁর সংগে সুর মিলিয়ে বললেন, "রাজনীতি থেকে পালিয়ে থাকা যায় না। রাজনীতি থেকে সরে থাকাও এক ধরনের রাজনীতি।" তখন থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনার

বিবর্তন তাঁকে এই সত্যে এনে পৌঁছে দিয়েছিল যে, 'লেখকের প্রথম ও প্রধান উপজীব্য বিষয়ই হলো রাজনীতি'। তাঁর দর্শন ও সাহিত্য তাই হয়ে উঠেছিল এই রাজনীতির সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সিমন দ্য বোভয়রের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, জার্মান ফ্যাসীবাদকে প্রতিরোধ করার দায়বোধই সার্ত্র্-এর চিন্তাধারার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায়। বিশ্বজনমানসে সার্ত্র্ পরিচিতি লাভ করেন একজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে।

সার্ত্র্-এর সময় এবং অবস্থায় একজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর কাছে কোন্ দল গ্রহণীয়? ফ্রান্স যতোদিন জার্মানির অধিকারভুক্ত বা পদানত ছিল, ততোদিন এ প্রশ্ন তীব্রভাবে দেখা দেয় নি। কারণ, তখন প্রায় সকলেই মূল শত্রু ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ছিল ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু মুক্তিলাভের পর নানা কারণে প্রতিরোধ আন্দোলন-কারীদের ঐক্যে ফাটল ধরে। এক দল পুরোনো সমাজকে আবার গড়ে তুলতে চাইলেন—ফিরে যেতে চাইলেন প্রাক্-যুদ্ধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। অপরদিকে আর এক দল মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হলেন। বলা বাহুল্য, সার্ত্র্ ছিলেন দ্বিতীয় শিবিরভুক্ত। কিন্তু সমস্যা থেকেই গিয়েছিল। ঐ সময় কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল ফ্রান্সে বৃহত্তম বামপন্থী দল এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের হাতিয়ার। ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকার জন্য ঐ দল সারা দেশের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন পেয়েছিল। অনেক বুদ্ধিজীবী ঐ দলে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সার্ত্র্ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন নি, যদিও তাঁর সহানুভূতি ছিল ঐ দলের প্রতি। প্রথমত, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বস্তি এবং ব্যক্তির স্বতন্ত্র কর্ম ও ভূমিকাই ছিল সার্ত্র্-এর লক্ষ্য। ইতিহাসকে মেনেও ব্যক্তির স্বতন্ত্র আচরণই, তাঁর মতে, ইতিহাসের কাছে মানুষের অঙ্গীকার। দ্বিতীয়ত, তাঁর অস্তিবাদী দর্শনের সংগে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পুরোপুরি মিল ছিল না। তৃতীয়ত, লেখক হিসেবে সার্ত্র্ সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বোধ করি সেজন্যই তিনি বলেছিলেন, "একজন লেখক জগৎটাকে শুধুমাত্র ভোগ করতে পারেন না; তাঁকে একটা জায়গায় দাঁড়াতেই হবে—কোন না কোন এক পক্ষ সমর্থন তাঁকে করতেই হবে!" অথচ কম্যুনিস্টরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সার্ত্র্-এর সব বক্তব্যকে মেনে নিতে পারেন নি। তা ছাড়া, তখন সোভিয়েত নীতির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য জানানো ছিল প্রত্যেক ফরাসী কম্যুনিস্টের একান্ত কর্তব্য; অথচ সার্ত্র্ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য সোভিয়েত নীতির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য জানাতে পারেন নি। কম্যুনিস্ট পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীর যথার্থ আত্মপ্রকাশ বলে বর্ণনা করার পরও এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতন্ত্র ও বিশ্বশান্তির প্রতীক বলে মনে করা সত্ত্বেও তিনি মস্কোর ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকেন নি। হাঙ্গেরী এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত হস্তক্ষেপের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এমন কি, সোভিয়েত শ্রমশিবির সম্পর্কে তিনি তাঁর 'লে তঁ মদার্ন', পত্রিকায় এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ না দিয়ে সার্ত্র্ চেষ্টা করেছেন এক ব্যাপক বামফ্রন্ট গড়ে তোলার। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি গড়ে তোলেন 'গণতান্ত্রিক

বিপ্লবী সংঘ'। কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয় নি, কেননা, এই সংস্থা দক্ষিণপন্থী হয়ে যায়। সার্ত্র্ সংগে সংগে এই সংস্থার সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ইতিমধ্যে তিনি কম্যুনিস্টদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। ফ্রান্সের সাম্যবাদী পত্রিকা 'আকসিয়" বা 'অ্যাক্‌সন্' কখনও সার্ত্র্-কে তাত্ত্বিক বিতর্কে আহ্বান জানিয়েছে, আবার কখনও 'বিশ্বাসঘাতক' বলে তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছে। ফ্রান্সের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই সার্ত্র্ কম্যুনিস্টদের সংস্পর্শে আসেন, একযোগে নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিকদের সংগে তিনি তাঁর দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। সার্ত্র্ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ না দিলেও তাঁর এই বিশ্বাস হয়েছিল যে, কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না। মার্ক্স্‌বাদই এ যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন। অথচ কম্যুনিস্টদের নীতির তিনি সর্বাত্মক সমর্থক ছিলেন না। সেজন্যই দেখা যায়, সার্ত্র্-এর বাকী জীবনের ইতিহাস হলো কোন সংগঠনের সংগে যুক্ত না হয়ে বামপন্থী রাজনীতি করার সযত্ন প্রয়াস। দলের বাইরে মার্ক্স্‌বাদ-বিশ্বাসী তাত্ত্বিক হিসেবেই ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী মহলে হয়েছিল তাঁর প্রতিষ্ঠা। কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিল যুগপৎ সহযোগিতা ও সংঘাতের। সিমন দ্য বোভয়রের বক্তব্য থেকেই এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। সার্ত্র্-এর বহুবিতর্কিত গ্রন্থ 'দ্য ক্রিটিক অব্ ডায়েলেকটিক্যাল রীজন'-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অস্তিবাদ ও মার্ক্স্‌বাদের সমন্বয় ঘটিয়ে 'অস্তিবাদী মার্ক্স্‌বাদ' তৈরি করা। ঐ গ্রন্থটির মূল প্রচেষ্টা হলো, মার্ক্সীয় কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান নির্ণয় করা। সারাজীবন ধরেই তিনি চেয়েছেন মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে সমস্তরকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে। সার্ত্র্-এর 'অস্তিবাদী মার্ক্স্‌বাদ' মুখ্যতঃ ব্যক্তিজগৎ ও সামাজিক জগতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মার্ক্স্‌বাদ ছাড়া মানুষের মুক্তির দর্শন সম্ভব নয়; মানবিক উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন একটি গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিই স্বাধীন সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। বস্তুত সেজন্যই তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। আর, সত্যি কথা বলতে কি, সার্ত্র্ ও ক্যামুর বিরোধ মূলতঃ এই কম্যুনিস্ট-প্রীতি নিয়েই।

এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক্ ক্যামুর চিন্তাভাবনার দিকে। ক্যামুর জন্ম আলজিরিয়ার মঁদোভি গ্রামে। জাতিতে তিনি মিশ্র ইউরোপীয়ান। পিতা লুসিয়াঁ ক্যামুর আদিভূমি ছিল ফ্রান্সের আলসাস্ শহর। তিনি মদ্যব্যবসায়ে সামান্য চাকরী করতেন। মা কাঁথারাইন ছিলেন স্প্যানিশ এবং নিতান্তই নিরক্ষর। সার্ত্র্-এর মতো ক্যামুও শৈশবেই পিতৃহারা হন। অন্যের বাড়ীতে ঠিকা ঝির কাজ করে অতিকষ্টে ক্যামুর মা সংসার চালাতেন। দু'ভাই, মা, মাতামহী, এবং 'পংগু এক মামা বেলকুর্ অঞ্চলের শ্রমিক পাড়ায় ছোট্ট দু-ঘরের এক ফ্ল্যাটে কোনরকম বাস করতেন। ক্যামুর দারিদ্র্য জর্জরিত এই শৈশবের ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর 'বিটুইন্ট্ অ্যান্ড বিটুইন' প্রবন্ধ সংকলনে। এ রকম পরিবারের সন্তানের পক্ষে ভালো

শিক্ষা লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল বললেই চলে। কিন্তু ফ্রেন্চ্ আলজিরিয়ার গরীব শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতো। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ক্যামু তাঁর কৃতিত্বের জন্য লুই জারমেনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। লুই জারমেনের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফলেই ক্যামু রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে বৃত্তি লাভ করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং জাঁ গ্রেনিয়ারের সান্নিধ্যে আসেন। জাঁ গ্রেনিয়ারই তাঁকে সাহিত্য-শিল্প-দর্শন চিন্তায় উৎসাহিত করেছেন। শৈশব ও কৈশোরের দারিদ্র্য এবং ছেলেবেলার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে মাত্র সতের বছর বয়সেই ক্যামু যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁর পক্ষে পরীক্ষা পাশ করে সরকারী চাকরী লাভ করা সম্ভব হয় নি। বাধ্য হয়েই তিনি অভিনয়, সাংবাদিকতা, কেরানিগিরি প্রভৃতি নানা পেশার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেছেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরুও হয় এই সময়।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ক্যামুর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। সার্ত্র্-এর মতো তিনিও ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নিজেকে সংগ্রামের সংগে যুক্ত করেছিলেন। ক্যামুর রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলেই বোঝা যায় কেন তিনি সার্ত্র্-এর বিরোধিতা করেছেন। ক্যামু জন্মসূত্রে মিশ্র ইউরোপীয়ান এবং দীর্ঘদিন ইউরোপীয়ান শ্রমিক শ্রেণী ও আরবদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে আলজিরিয়ায় বাস করেছেন, অথচ শিক্ষাসংস্কৃতিতে তিনি ছিলেন পুরোপুরি একজন ফরাসী। আলজিরিয়ায় শ্বেতাঙ্গরা ছিল সংখ্যালঘু। তাঁদের কাছে আলজিরিয়ার ফ্রান্স-অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা ছিল বাস্তবচিন্তাপ্রসূত। পক্ষান্তরে, দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই আরব ও বারবার্ জাতি। তাঁদের ভাষা আরবি, ধর্ম ইসলাম। তাঁদের কাছে ফ্রেন্চ্-রিপাব্লিকের অচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে আলজিরিয়ার অবস্থিতি কাম্য ছিল না। আলজিরিয়ার এক শ্রমিক পরিবারের সন্তান হিসেবে ক্যামু ছিলেন দ্বৈত প্রভাবের ফসল। তাত্ত্বিক দিক থেকে আলজিরিয়া উপনিবেশ ছিল না, ছিল রিপাব্লিকের অচ্ছেদ্য অংগ, অথচ তার ইতিহাসের বাস্তবতা ও জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা ছিল ঔপনিবেশিক। আলজিরিয়ার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরাই পূর্ণ নাগরিক অধিকার দাবী করতে পারত, সব বড় চাকরী এদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকত, সম্পত্তির বড় অংশের মালিকানা ছিল এদেরই হাতে। আর, সমগ্র জনগণের বড় অংশ হয়েও আরবদের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এদের শিক্ষার সুযোগও ছিল খুবই সীমিত। এরা বেশিরই ভাগই ছিল ছোট চাষী বা কৃষি শ্রমিক। ক্যামুর পরিবারের মতো গরীব শ্বেতাঙ্গদের অবস্থাও এদের তুলনায় ছিল অনেক ভালো। আরবদের দারিদ্র্য ছিল অসহনীয়। এদিকে শ্বেতাঙ্গরা চাইত আরবরা যেন সামান্য দামে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাবে আলজিরিয়া পঞ্চাশের দশক থেকে ষাটের দশকের গোড়া পর্যন্ত ফরাসী সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। মিশ্র ইউরোপীয়ান এবং আরবদের মধ্যে যুদ্ধে আলজিরিয়ার সমস্যা ও সংকট হয়েছে আরো তীব্র। ফ্রান্স ও আলজিরিয়ার সম্পর্কের সমস্যাজাত মানসিক অশান্তি ক্যামুর যন্ত্রণা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আরবদের সংগে সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গরা যেমন ছিল শোষক, তেমনি আর এক দিক

থেকে গরীব শ্বেতাঙ্গরাও ছিল শোষিত। তবে, আরবরা যে ধরনের শোষিত ছিল, গরীব শ্বেতাঙ্গরা সে ধরনের ছিল না। তারা অনেক সময়ই ফরাসী সরকার ও ধনী শ্রেণীর সাহায্য পেয়ে থাকত। গরীব শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে সমাজ পরিবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করা বা বামপন্থী চিন্তাভাবনা স্বাভাবিক ছিল। প্রথম জীবনে ক্যামুও এ ধরনের চিন্তাভাবনার অংশীদার ছিলেন।

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ক্যামু কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং আরবদের মধ্যে পার্টির প্রচারক হিসেবে কিছুকাল কাজ করেন। কেউ কেউ বলেন যে, পার্টি আরবদের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ না দেখানোর ফলে ক্যামু ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেন। কিন্তু সম্ভবত তা ঠিক নয়, কেননা, এর পরের বছরও আলজিয়ার্সে কম্যুনিস্ট পার্টি পরিচালিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে ক্যামু কাজ করেছেন, এ প্রমাণ আছে। সেজন্যই, মনে হয়, ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে বা অন্য কোন সময় ক্যামু কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সত্যি কথা বলতে কি, কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে ক্যামুর সম্পর্ক ছিন্ন করার সঠিক সময় ও কারণ আজও কিছুটা অজানা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্যামু সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ঐ আবেদন মঞ্জুর হয় নি। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু 'আলজার রিপাবলিকেন' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে সেন্সর কর্মকর্তাদের সংগে বিরোধের ফলে পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তারপর ক্যামু আলজিরিয়া ছেড়ে প্যারিসে চলে আসেন। কিন্তু নাৎসীবাহিনীর আক্রমণের ফলে তাঁকে প্যারিস ছাড়তে হয়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের গ্যাবরেল পেরি জার্মানদের হাতে নিহত হন। ঐ ঘটনা ক্যামুকে প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু প্যারিসে আসেন এবং ফ্যাসী-বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ক্যামু ছিলেন 'কবাঁ' (কমব্যাট বা সংগ্রাম) নামক এক গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত সমিতির সদস্য এবং ঐ নামের একটি গোপন পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'লেটারস্ টু এ জার্মান ফ্রেন্ড'-এ যে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল তা হলো, এই ঈশ্বরহীন এবং চরম মূল্যহীন জগতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের (পলিটি-ক্যাল অ্যাক্সন) সমর্থনকারী কোন নৈতিক বিধি আছে কি না। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ক্যামু 'ন্যায়'-এর তাৎপর্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ক্যামুর সাহিত্যকীর্তির আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হলেও তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত প্রাসংগিক। এর কারণ, সার্ত্র্-ক্যামু বিরোধের মূল সুর এখানে ধরা পড়ে।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, সার্ত্র্ ও ক্যামুর নাম একই বন্ধনীভুক্ত হয়ে প্রায় দশ বছর ধরে সাধারণ জনমানসে বিরাজ করেছে। ক্যামুর প্রথম উপন্যাস 'দ্য স্ট্রেঞ্জার' যখন ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, সার্ত্র্ তখন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সার্ত্র্ ক্যামুর ঐ উপন্যাসটির সপ্রশংস আলোচনা ও মন্তব্য করার ফলে ক্যামুও জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করেন। সাধারণ জনমানসে সার্ত্র্ ও ক্যামু উভয়েই প্রতিরোধ

আন্দোলনকারী লেখক ও অস্তিবাদী হিসেবে চিহ্নিত হলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে সম্পর্ক ও ঠান্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে উভয়ের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে। সার্ত্র্-এর সংগে রাজনৈতিক মতপার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে ক্যামুর বিভিন্ন রচনায়।

ক্যামুর প্রথম উপন্যাস 'দ্য স্টেঞ্জার'-এর কেরানি নায়ক ম্যর্সল্ একদিক থেকে ক্যামুর ব্যক্তিগত জীবনের ও চিন্তাভাবনার প্রতীক। ছাত্রাবস্থায় অর্থাভাবে ক্যামু নিজেও মাঝে মাঝেই কেরানির কাজ করেছেন, একথা আমরা জানি। সাংবাদিকতায় তিনি ম্যর্সল্ ছদ্মনামটি ব্যবহারও করেছেন। ঐ উপন্যাসের নায়ক ম্যর্সল্ অসংগত ও অর্থহীন জগতে একজন 'স্ট্রেঞ্জার' বা পরদেশী। ভালোবাসা, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, হিংসা, ঘৃণা, সবকিছু সম্বন্ধেই সে উদাসীন। তার মায়ের মৃত্যুতে সে শোক অনুভব করে না। মাতৃবিয়োগের প্রতি তার মনোভাব প্রথানুগ নয়। তার এই প্রথাবিরোধী আচরণ ও উদাসীনতা সমাজ সহ্য করে নি। কিন্তু নায়ক এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। মাতৃবিয়োগের পরের দিনই সে একটি মেয়ের সংগে প্রেম করে, তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়, কিন্তু তাও ঔদাসীন্যর সংগে। উপন্যাসটিতে দেখা গেছে নায়ক ম্যর্সল্ তার অনুভূতির ব্যাপারে মিথ্যাভাষণ করতে চায়নি, অকপটে সে প্রকাশ করেছে তার অনুভূতির কথা। সমাজে তাই সে যেন অপরিচিত, নতুন, অনাত্মীয়। তার এক সঙ্গী একটি আরব মেয়ের ওপর অত্যাচার করলে মেয়েটির ভাই ছুরি নিয়ে সঙ্গীটিকে আক্রমণ করে। ম্যর্সল্ কোনো কিছু না ভেবেই আরব ছেলেটিকে গুলি করে। এখানে সে অনুভূতি শূন্য, উদাসীন। বিচারকরা তার এই ঔদাসীন্যর জন্য তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু প্রাণদণ্ডের আদেশও তাকে বিচলিত করে না—সে সমান উদাসীনতায় তা গ্রহণ করে।

উদ্দেশ্যহীন এক অপরাধকে এই উপন্যাসে চিত্রিত করলেও ক্যামুর বক্তব্যের তাৎপর্য রয়েছে অন্য এক জায়গায়। এখানে আরবদের ঠিক মানুষ হিসেবে চিত্রিত করা হয় নি। ম্যর্সল্ যেন আর একজন মানুষকে মারেনি, মেরেছে একজন আরবকে। আরবরা যেন অনামী, অস্পষ্ট, বিপজ্জনক ছায়ার মতো। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরবদের মধ্যে ক্যামু যে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচারক হিসেবে কাজ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করে যান নি। আরবদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তা নয়। তাদের দুঃখদুর্দশার কথা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনীতিতে কোথাও আলজিরিয়ার আরবদের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের চিহ্ন নেই। ক্যামুর আলজিরিয়া ছিল একান্ত-ভাবেই ফ্রান্সের সম্পত্তি। আরবরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করবে—এটা ঠিক ক্যামুর কাম্য ছিল না। তাঁর অনেক লেখা থেকে এটা মনে হয় যে, আরবদের ন্যায্য অধিকার যেন শ্বেতাংগদের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৪৫ খৃীস্টাব্দে আলজিরিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে ফরাসী সরকার তা নির্মমভাবে দমন করে। ক্যামু ন্যায়ের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত না করায় তিনি জোরালো কোন প্রতিবাদ জানান নি। অথচ, আমরা জানি, সার্ত্র্-সেই সময়

আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং ফরাসী সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছেন। এরপর ক্যামু প্রায় নবছর আলজিরিয়া সম্বন্ধে নীরব ছিলেন।

ক্যামুর দ্বিতীয় উপন্যাস 'দ্য প্লেগ'-এর বক্তব্য সুস্পষ্টরূপেই রাজনৈতিক। 'প্লেগ' শব্দটিকে তিনি অনেকার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অরাঁ শহরে প্লেগের আবির্ভাব ও তাণ্ডবলীলা উপন্যাসটির একটি ঘটনা। মানুষের অসংগত পরিবেশকেও ক্যামু 'প্লেগ' শব্দটির দ্বারা বুঝিয়েছেন। হানাদার জার্মান নাৎসীবাহিনীকেও তিনি ভয়াবহ প্লেগের সংগে তুলনা করেছেন। প্লেগ রোগগ্রস্ত শহরটি জার্মান নাৎসী বাহিনীর পদানত শহরের সংগেই তুলনীয়। প্রতীক ব্যবহারে ক্যামু এখানে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু আরব-প্রধান শহরে আরব জনসাধারণ রহস্যজনকভাবে প্রায় অনুপস্থিত।

ক্যামু গভীরভাবে সার্ত্র্-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সার্ত্র্-এর মাধ্যমেই তিনি কিয়েকেগার্দ, হাইডেগার ও য়্যাস্পার্সের অস্তিবাদী চিন্তাধারার সংগে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু যখন ফ্রান্সে এসে প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তখন সার্ত্র্, সিমন দ্য বোভয়র এবং আরও অনেক প্রথম শ্রেণীর ফরাসী লেখকের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে। সার্ত্র্ ও বোভয়রের সংগে ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হয় নি। সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের স্বপ্ন সার্ত্র্ ও বোভয়রের সংগে ক্যামুর বন্ধুত্বকে দৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল। সার্ত্র্ ও ক্যামু উভয়েই উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের অসংগতি, ও অর্থহীনতা। কিন্তু তাঁদের এই উপলব্ধি তাঁদের নৈরাশ্যের উদাসীনতায় নিয়ে যায় নি। কারণ, তাঁরা উভয়েই মনে করতেন যে, নৈরাশ্যের শেষে জীবনের শুরু। জীবনের কোন অর্থ নেই সত্য, কিন্তু একমাত্র মানুষই পারে তার মূল্য সৃষ্টি করতে। উচ্চাশা, জীবন ও সাহিত্য, জাতীয় মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ইত্যাদি ক্যামু ও সার্ত্র্-কে পরস্পরের খুব কাছে নিয়ে এসেছিল। সিমন দ্য বোভয়র বলেছেন, "আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম নতুন ভোরের দিকে। আমরা রাতের শেষ দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার বয়স তখন ৩৬ হলেও আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ছিল প্রথম যৌবনের তাজা উৎসাহ।" ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে মুক্তির উদ্দাম উৎসব সার্ত্র্, ক্যামু, বোভয়র প্রমুখ বন্ধুদের আরো কাছাকাছি এনে দিয়েছিল।

রাজনৈতিক সহযোগিতা ও প্রয়াসের মাধ্যমে সার্ত্র্ ও ক্যামুর মধ্যে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত ঘটেছিল, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সংগে সংগে ধীরে ধীরে সেই বন্ধুত্বের উষ্ণ উত্তাপ কমে আসত লাগল। মানসিক দূরত্ব ধীরে ধীরে বেড়েই চলল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই, আমরা জানি, সার্ত্র্ যথার্থ অর্থেই একজন কার্যকরী বামপন্থী। এমনকি, তাঁকে অনেক সময়ই বিপ্লবী রাজনীতির সমর্থক বলে গণ্য করা হয়েছে। রাজনীতির ব্যাপারে সার্ত্র্-এর কোন দ্বিধা ছিল না। সার্ত্র্ কোনদিনই কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য ছিলেন না, হতে পারেন নি। এর কারণ তাঁর স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কিন্তু ব্যক্তির রাজনৈতিক ভূমিকায় সার্ত্র্-এর বিশ্বাস ছিল। তিনি মনে করতেন, ব্যক্তি রাজনীতি এড়িয়ে গেলেও রাজনীতি তাকে

মুক্তি দেয় না। ব্যক্তি-সমাজ-রাজনীতি—এর কোনটাকেই কোনটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি দেখতে চান নি। পক্ষান্তরে, ক্যামু রাজনীতির বাঁধাধরা নির্দিষ্ট জগতে কখনই স্বস্তি বোধ করেন নি। একথা সত্যি যে, ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনে তিনি অসামান্য আত্মত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দেন। কিন্তু দৈনন্দিন রাজনৈতিক জীবনযাপনের জন্য যে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় তার অভাব ছিল ক্যামুর মধ্যে। তিনি সবসময়ই চাইতেন হঠাৎ কিছু চমকপ্রদ কাজ করে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিতে। এটা তাঁর স্বভাবের মধ্যেই ছিল। সার্ত্র্ এটাকে বলতেন 'স্বপ্নবিলাস'।

ক্যামুর মধ্যে যে স্ববিরোধ, স্বপ্নবিলাসিতা, অনধ্যবসায় ও অধৈর্যমূলক মানসিকতা ছিল তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। মুক্তির ঠিক পরে ফ্যাসীবাদের সমর্থকদের ন্যায্য শাস্তি তিনি দাবী করেন। ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত সন্ত্রাসের কথা তিনি সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আবার তিনি মত পরিবর্তন করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক ব্রাজিলাক্ জার্মানদের দালালের কাজ করে বহু স্বদেশপ্রেমীর মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন। কিন্তু ক্যামু সেই ব্রাজিলাকের জন্য ক্ষমা চেয়ে আবেদন-পত্র পাঠান। সার্ত্র্ বা বোভয়র কেউই সেই আবেদনপত্রে সই করেন নি। একসময় ক্যামু মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার জন্য—বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—আন্দোলন শুরু করেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই আন্দোলন থেকেও তিনি আবার অতি সত্বর সরে দাঁড়ান। এমনি আরো কতো উদাহরণ। হিরোসিমায় পরমাণু বোমা নিক্ষেপের পর ক্যামুর প্রতিক্রিয়াও ছিল এই ধরনের। সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের তিনি অনুরোধ জানান যে, তাঁরা যেন বোমা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত গবেষণা বন্ধ রাখেন। সার্ত্র্-এর কাছে তা অবাস্তব মনে হয়েছিল। ফ্রান্স যখন ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালাচ্ছিল, ক্যামু তখন কোন প্রতিবাদ করেন নি। তাঁর বক্তব্য হলো, "আমি কম্যুনিস্টদের খেলা খেলতে চাই না"। ১৯৪৭ খৃীস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট সরকার থেকে কম্যুনিস্ট মন্ত্রীরা বিতাড়িত হন। সারা পৃথিবীতে ইতিমধ্যে ঠাণ্ডালড়াই শুরু হয়ে যায় পুরোদমে। ক্যামুকে নানা কারণে 'কবা' পত্রিকার সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হয়। এমতাবস্থায়, সার্ত্র্ এবং ক্যামু উভয়েই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। সার্ত্র্ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন না, কিন্তু বামপন্থী মতাদর্শে রইলেন অবিচল। অন্যদিকে, ক্যামু নিলেন অন্যপথ। প্রথম জীবনে তিনি যদিও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, তবু ধীরে ধীরে তিনি কম্যুনিজম-বিরোধী হয়ে উঠতে লাগলেন। তিনি রাজনীতি বা ঐতিহাসিক জগৎ থেকে ব্যক্তিগত জগৎকে বিচ্ছিন্ন বলেই ভাবতেন। ব্যক্তিগত জগতে ইতিহাসের কোন স্থান নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্যামু এক জার্মান বন্ধুর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে ইতিহাসে ঢুকতে বাধ্য করেছ"। রাজনীতির প্রতি তিনি ধীরে ধীরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিছক নীতিতে ফিরে যেতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ক্যামুর মতো অস্থিরচিত্ত লোকের পক্ষে এ দুয়ের মধ্যে সীমারেখা টানা সম্ভব হলো না। তিনি দক্ষিণ-পন্থী শিবিরের দিকে ক্রমেই ঝুঁকে পড়তে লাগলেন।

সার্ত্র্-এর সংগে ক্যামুর সম্পর্ক ধীরে ধীরে তিক্ত ও জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

বিখ্যাত লেখক কোয়েস্‌লার সার্ত্‌র্‌ ও ক্যামুর বন্ধু ছিলেন। কোয়েস্‌লার কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য থাকায় সার্ত্‌র্‌ ও ক্যামুর সংগে ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হয় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে কোয়েস্‌লার কম্যুনিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা হওয়ায় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্‌র্‌-এর সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ, ক্যামু কোয়েস্‌লারের দ্বারা গভীর-ভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। সার্ত্‌র্‌ ও বোভয়রের সংগে কোয়েস্‌লার ও ক্যামুর বিরোধের ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া যায় বোভয়রের আত্মজীবনীতে। ক্যামু প্রথমে কম্যুনিস্ট-বিরোধীদের দলভুক্ত হতে চান নি। কিন্তু পরে তাঁর কম্যুনিস্ট-বিরোধিতা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। ব্যক্তিগতভাবে ক্যামু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু রুশ-বিরোধিতা ধীরে ধীরে তাঁকে মার্কিন শিবিরের সমর্থক করে তোলে। সোভিয়েত রাশিয়া যে ফ্রান্স আক্রমণ করবে, এ বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। আবার প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেন। সার্ত্‌র্‌-কে তিনি ঐ সময় প্রশ্ন করেছিলেন, রাশিয়ানরা এখানে এলে আপনার কী হবে? তারপর বারবার সার্ত্‌র্‌-কে অনুরোধ জানান দেশ ছেড়ে যেতে। আপনি নিজে কি যাবার কথা চিন্তা করছেন?—সার্ত্‌র্‌-এর এই প্রশ্নের জবাবে ক্যামুর দ্বিধাহীন উত্তর ছিল—"জার্মানরা থাকার সময় যা করেছিলাম তাই করব"। সার্ত্‌র্‌ সেদিন ঋজুভাবেই ক্যামুকে জানিয়েছিলেন—"আমি কোনদিনই শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যাব না, প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে কোনদিনই আমি অস্ত্র ধরব না"। ফরাসী শ্রমিকরা যথেষ্ট পরিমাণে রুশ-বিরোধী নয় বলে ক্যামু তাদের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।

সার্ত্‌র্‌ ও ক্যামুর তত্ত্বগত এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার পার্থক্য বছরের পর বছর বেড়েই চলল। সার্ত্‌র্‌ অবিচলভাবে সাম্যবাদের সমর্থক, আর ক্যামু সাম্যবাদবিরোধী। সার্ত্‌র্‌ একনিষ্ঠ-ভাবে চেষ্টা করে গেছেন ইতিহাসের মধ্যে বাঁচতে। মার্ক্‌স্‌বাদকে গ্রহণ করেছেন 'এ যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন' হিসেবে, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা করেছেন। তিনি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক চেয়েছেন, সমাজতন্ত্রে ছিলেন দৃঢ়বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে, ক্যামু আঁকড়ে ধরলেন বুর্জোয়া মূল্যবোধগুলিকে। ইতিমধ্যে ফরাসী দার্শনিক মার্লো পঁতি রুশ বিপ্লব ও তার পরিণতি বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, আত্মরক্ষার জন্যই বলশেভিকদের কঠোর একতা চালু করতে হয়েছিল এবং ঐ অবস্থায় রাজনৈতিক বিরোধিতা ছিল বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল। সোভিয়েত সরকারের প্রতি সার্ত্‌র্‌-এর প্রশ্নাতীত আনুগত্য না থাকলেও তিনি মার্লো পঁতির ঐ বক্তব্য মেনে নেওয়ায় ক্যামু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ক্যামুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে, তিনি বিরোধিতা সহ্য করতে পারতেন না, আর খুব তাড়াতাড়ি রেগে যেতেন। মাঝে মাঝেই মত পাল্টাতেন, আর তাতে তাঁর কোন দ্বিধা-সংকোচ থাকত না। আমরা জানি, এক সময় তিনি ইতিহাসের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ইতিহাসের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করারও চেষ্টা করেছেন। রুশ-বিরোধিতায় ক্যামু এতো কঠোর ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, বিপ্লব হলো পৃথিবীর সব অনিষ্টের মূল। হিংসা মানুষকে মুক্ত করে না, সৃষ্টি করে নতুন বন্ধন। হিংসা বলতে ক্যামু বিপ্লবী হিংসাকেই বুঝিয়েছেন।

ক্যামু তাই বিদ্রোহী, বিপ্লবী নয়। হিংসা ও হত্যার রাজনীতির তিনি ছিলেন বিরোধী। পরিণাম বা লক্ষ্য উপায়ের ন্যায্যতা নির্ধারণ করে—এই নীতিতে ক্যামুর কোন আস্থা ছিল না। রাজনৈতিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতেই শুধুমাত্র মানুষের অংগীকারের বিচার করা উচিত—সার্ত্র্-এর এ ধরনের বক্তব্যের সংগে ক্যামু কখনই একমত হতে পারেন নি। ক্যামু তাঁর 'দ্য জাস্ট' নাটকে মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য হিংসার ব্যবহারের মধ্যে যে অসংগতি লক্ষ্য করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। ঐ নাটকে বলা হয়েছে বিপ্লবীদের প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ; নতুবা, ন্যায় পরিণত হবে অন্যায়ে। রাজনৈতিক হত্যা ও হিংসাকে ক্যামু নিন্দা করেছেন তীব্রভাবে। অথচ, সার্ত্র্-এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সযত্ন অনুধাবন এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি কখনও কখনও হিংসাকে সমর্থন করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্র্ একসময় বলেছিলেন, প্রতিরোধ আন্দোলন বা আলজিরিয়া যুদ্ধের হিংসার মতো নয়, আমাদের প্রয়োজন 'যুক্তিগ্রাহ্য হিংসা' (Rational violence)। এই 'যুক্তিগ্রাহ্য হিংসা' সার্ত্র্ খুঁজে পেয়েছিলেন ১৯৬৮ র ছাত্র-বিদ্রোহে। ক্যামুর 'দ্য ফল্' উপন্যাসের অনেক জায়গায়ই সার্ত্র্-ক্যামু বিরোধ সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও উপন্যাসটির ভাষা দার্শনিক, সারাংশ কিন্তু রাজনৈতিক।

'দ্য রেবেল্' গ্রন্থটিতে ক্যামুর সবচেয়ে পরিণত রাজনৈতিক চিন্তাধারার সংগে আমাদের পরিচয় ঘটে। গ্রন্থটি রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা। ক্যামুর কম্যুনিজম্-বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি একসময় কম্যুনিজম্ ও ফ্যাসিজমকে একই বন্ধনীর মধ্যে রাখতেন। গ্রন্থটিতে ক্যামুর কম্যুনিজম্- বিরোধিতা স্পষ্ট। তাঁর মতে, কম্যুনিজম্ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বিপদ। বিপ্লব ও রুশ আগ্রাসনের মধ্যে ক্যামু কোন পার্থক্য করেন নি। অথচ, সার্ত্র্ রুশ আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করেও বামপন্থী রাজনীতির প্রতি অবিচল থেকেছেন। স্তালিনীয় অপরাধের তীব্র নিন্দা করলেও সার্ত্র্ একথা কখনই মনে করেন নি যে, ঐ সব অপরাধ কম্যুনিজমের যৌক্তিক পরিণতি বা বিপ্লবী অভিজ্ঞতার যৌক্তিক পরিণতি। 'দ্য রেবেল' গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার পর ক্যামুর রাজনৈতিক পরিচিতি সম্পর্কে আর কারো সন্দেহ থাকে না। ফলে, নানা মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফ্রাঁসিস্ জাঁস' ক্যামুর ঐ গ্রন্থটির বিরূপ সমালোচনা লেখেন এবং সার্ত্র্ ঐ সমালোচনাটি তাঁর 'লে ত' মদার্ন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ঐ সমালোচনা পড়ে ক্যামু এতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে, লেখককে অগ্রাহ্য করে তিনি সরাসরি পত্রিকার সম্পাদক সার্ত্র্-এর প্রতি বিষোদ্গার করে একটি চিঠি পাঠান। সার্ত্র্ ঐ চিঠির জবাব পাঠান অত্যন্ত তীব্র কঠোর ভাষায়। প্রথমত, ক্যামুকে তিনি জানান যে, তিনি কম্যুনিস্টদের সংগে সব বিষয়ে একমত নন। দ্বিতীয়ত, সার্ত্র্ রুশ-বিরোধিতা সহ্য করতে পারেন না—ক্যামুর এই অভিযোগ সত্য নয়। তৃতীয়ত, সার্ত্র্ ক্যামুর দর্শনকে বিকৃত করেছেন—এ অভিযোগও স্বীকার্য নয়। চতুর্থত, ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের যোদ্ধাদের মুখপত্র হিসেবে কথা বলার কোন নৈতিক অধিকার ক্যামুর নেই। কারণ, ফ্রান্সের স্বাধীনতা বলতে ক্যামু বুঝতেন আলজিরিয়া ও অন্যান্য উপনিবেশের অধীনতা। তা ছাড়া, ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে ক্যামু

সমর্থন করেছেন। পরিশেষে, ক্যামুর রাজনৈতিক অবস্থান অনিবার্যভাবেই তাকে নিয়ে যাবে দক্ষিণপন্থী শিবিরে।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে এই চিঠি বিনিময়ের পরই সার্ত্র্-ক্যামু বন্ধুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। ক্যামুর মৃত্যু পর্যন্ত দুই বন্ধুর আর সাক্ষাৎ ঘটে নি, কথাবার্তাও ছিল বন্ধ। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন। লাঁ জমাঁ টেলিফোনে এই দুঃসংবাদ বোভয়রকে জানিয়েছিলেন। বোভয়র এক সময় বলেছিলেন, ফ্রান্সের অপরাধে সায় দিয়ে ক্যামু আমাদের মন থেকে মুছে গেছেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু ক্যামুর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর সার্ত্র্ ও বোভয়র ক্যামুর জন্য শোক করেছেন, সারাটা সন্ধ্যা ক্যামুর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ক্যামুকে হারিয়ে শোকাহত সার্ত্র্ লিখলেন, 'আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। মুখ দেখাদেখি ছিল বন্ধ। তবু আমি তার কথা ভাবতাম। বই বা সংবাদপত্রের ওপর যেন তাঁর দৃষ্টি অনুভব করতাম। নিজেকে প্রশ্ন করতাম, এ বিষয়ে সে কি বলে? এই মুহূর্তে সে এ বিষয়ে কি বলছে?'

সার্ত্র্-ক্যামু বিরোধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, উভয়ের বিরোধ আসলে পঞ্চাশের দশকের বুদ্ধিজীবীদের এক সংকটকেই প্রতিফলিত করছে, আর সেজন্যই সার্ত্র্-ক্যামু বিরোধের গুরুত্ব ছোট করে দেখা চলে না।

**নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক এবং নারীমুক্তি আন্দোলন—**
**বোভয়র-সার্ত্র্ আলাপ ঃ**

বোভয়র—শোন সার্ত্র্, মেয়েদের সম্পর্কে আমি তোমার মতামত যাচাই করতে চাই। এর মূল কারণ, এই ব্যাপারে তুমি কোনদিনই তোমার মতামত জানাও নি। গোড়াতে সেই কথাটিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। প্রায় সব নিগৃহীত গোষ্ঠী সম্পর্কে তুমি কথা বলেছ—মজুরদের বিষয়ে, কৃষ্ণাংগদের বিষয়ে, ইহুদীদের বিষয়ে,—কিন্তু মেয়েদের বিষয়ে কখনো কথা বলো নি। এর কারণ কী?

সার্ত্র্—আমি মনে করি আমার শৈশবেই এর কারণ নিহিত আছে। শৈশবে আমি মেয়েদের মধ্যেই বেশী সময় কাটাতাম। ঠাকুমা আর মা আমাকে সব সময়ই নজরে রাখতেন, আর ছোট ছোট মেয়েরা তো ঘিরে থাকতই। ফলে, মেয়েরাই আমার স্বাভাবিক পরিবেশ ছিল। আর আমি সব সময়ই ভেবেছি আমার ভেতরে এক ধরনের মেয়েলিভাব আছে।

বোভয়র—মেয়েরা তোমাকে ঘিরে ছিল বলেই তারা যে নিগৃহীত এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা তুমি বুঝবেনা, এটা কখনও হতে পারে?

সার্ত্র্—ঠাকুমাকে ঠাকুরদা যে দাবিয়ে রাখেন, এটা আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমি ভেবে দেখিনি এর আসল অর্থটা কী। আমার মা বিধবা ছিলেন। ফলে তাঁর ওপর তাঁর মা-বাবা খুবই অত্যাচার করতেন—বাবা যতোটা, মাও ততোটাই।

বোভয়র—কিন্তু তুমি তো নাবালক নও। মেয়েরা যে অত্যাচারের লক্ষ্য, এটা তোমার চোখকে ফাঁকি দিল কী করে?

সার্ত্র্—আমি ব্যাপারটাকে সর্বজনীন ঘটনা হিসেবে দেখি নি। আলাদা

আলাদা ঘটনা আমি দেখেছি। কিন্তু প্রতিবারই আমি পুরুষ-চরিত্রের ব্যক্তিগত ত্রুটি হিসেবে এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে দেখেছি, যেমন এক ধরনের মেনে নেওয়াটাকে মেয়েদের স্বভাব বলে ভেবেছি।

বোভয়র—বেশীর ভাগ পুরুষের, এমন কি মেয়েদেরও, কি মেয়েদের ব্যাপারে একটা অন্ধতা আছে? নারীপুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা এমন নির্দিষ্ট বলে ধরে নেওয়া হয় যে, শেষে আর কেউ সেদিকে নজরই দেয় না। এ থেকে প্রাচীন গ্রীক গণতন্ত্রের কথা আমার মনে পড়ছে। প্রত্যেকেই পারস্পরিক নির্ভরতার দায়িত্ব মনে রাখছে, অথচ দাসপ্রথার প্রতি কেউ নজরই দিচ্ছে না। এথেনিয়ান গণতন্ত্র সম্বন্ধে যে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকি, ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের সমাজে মেয়েদের প্রতি যে ব্যবহার করা হয় সেই ব্যাপারটাকে ঠিক তেমনি দেখবে বলে আমার মনে হয়।

সার্ত্র—তুমি ঠিকই বলছ। আমার বয়স যখন কম ছিল তখন আমি পুরুষ আধিপত্যে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু সেই বিশ্বাসের মধ্যে নারী-পুরুষের এক ধরনের সমানাধিকারের সুযোগ ছিল। আমার মনে হতো, সামাজিক জীবনে নারীকে পুরুষের সমানই মানা হয়। কোন সময় হয়তো পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের ওপর রাগ দেখাত, হুকুম চালাত, যেমন আমার বিপিতা করতেন। আমি এটাকে তার চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য বলে ভেবেছি।

বোভয়র—কিন্তু তুমি তো বললে মেয়েদের সংগে তোমার যে নানা ধরনের সম্পর্ক তাতে তুমি তাদের একই সংগে তোমার সমানও ভেবেছ, আবার অসমানও ভেবেছ। কোন এক সময় তুমি আমাকে বলেছিলে, নারী নির্যাতনটা হিসেবে ধরলে নারীরা পুরুষদের সমান, এমন কি তারা যদি অসমান হয়, তবুও সমান। তুমি কি সেটাই বোঝাতে চাও? আমি যা বুঝি তা হলো, যেহেতু পুরুষদের মতো শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান ও স্বাধীনতা লাভের সুযোগ নারীদের নেই, তাই তুমি মনে করো একজন নারীর শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান ও অন্যান্য ব্যাপারে ঘাটতি থাকলেও সে আসলে পুরুষের সমানই।

সার্ত্র—নিশ্চয় খানিকটা তো তাই। আমার মনে হতো, তার আবেগ-উপলব্ধির, তার সত্তার কিছু কিছু অংশ আমার মধ্যেও আছে। পুরুষদের সংগে কথা বলার চেয়ে মেয়েদের সংগে কথা বলতে আমার বেশী ভালো লাগত। পুরুষদের সংগে কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত যেন মুদির স্তরে নেমে আসে। তোমাকে শেষ পর্যন্ত আর্থিক অবস্থা বা নিত্য-বর্তমানের ব্যবহার নিয়ে কথা বলতে হবে—তুমি ব্যবসা করো, না শিক্ষকতা করো শুধুমাত্র তার ওপর সেটা নির্ভর করে। কিন্তু, একটা কাঁচের বারান্দায় বসে বসে বাইরের আবহাওয়া বা লোকজন বা রাস্তাটাকে কেমন লাগছে, এইসব নিয়ে কথা বলা প্রায় অসম্ভব—এই সব কথা সবসময় আমি মেয়েদের সংগেই বলেছি। এর ফলে আমার ভেতরে তাদের সংগে একটা সমতার বোধ এসেছে, যদিও অবশ্যই কথাবার্তাটা আমি চালিয়েছি।

বোভয়র—কথাবার্তাটা চালানো তোমার পক্ষেই স্বাভাবিক। এর মধ্যে এক ধরনের পুরুষ-প্রাধান্য আছে। একথাও আমাকে অবশ্য সংগে সংগে বলতে হবে যে, বারবার পড়লে তোমার সমগ্র রচনায় এক ধরনের পুরুষ-প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

সার্ত্র্—খানিকটা বাড়িয়ে বলছ তুমি। তবে এটাকে সত্য বলে মেনে নিতে রাজি আমি।

বোভয়র—তোমার মনে হয় নি যে, তোমার মধ্যে পুরুষ-প্রাধান্যের একটা ভাব রয়েছে?

সার্ত্র—একদিক থেকে তো নিশ্চয়ই। আমিই তো সবসময় প্রথম চালটা দিয়েছি। তবে, আমার কখনও মনে হয়নি যে, আমি যে পুরুষ সেই ভাবনা থেকে পুরুষ-প্রাধান্যের ব্যাপারটা উঠে আসত।

বোভয়র—এটা তো বড়ো অদ্ভুত। কেননা, তুমিই তো একথা প্রথম বলেছ যে, মনস্তত্ত্ব, অন্তর্চারিত্র প্রকৃতপক্ষে বাস্তব অবস্থার অন্তর্গ্রহণ ছাড়া কিছু নয়।

সার্ত্র্—সত্যিই তো। আমাদের এই সময়ের নারী-পুরুষের সম্পর্কের নির্দিষ্ট পরিবেশের ভেতরই তো আমি ছিলাম। আমি এটাকে একটা ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতা বলেই ভাবতাম। এটা ভুলোনা যে, আমার সমবয়সীদের চেয়ে এবং অন্যান্য পুরুষের চেয়েও আমি নিজেকে খানিকটা শ্রেষ্ঠই ভাবতাম।

বোভয়র—তার অর্থ, শুধু মেয়েদের সংগে সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই এই শ্রেষ্ঠতাবোধ তোমার মনে আসত না, কেননা, সকলের বেলাতেই তোমার এরকম মনে হতো।

সার্ত্র—যা ভাবো। কিন্তু ব্যাপারটা খুব নির্দিষ্ট। কেননা, এর সংগে তো অনুভূতির যোগ আছে। একটি অনুভূতির ভেতর দিয়ে যে শ্রেষ্ঠতার উপলব্ধি হয় সেটা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কারো চাইতে নিজেকে বড়ো ভাবতে ভাবতেও তাকে ভালোবাসা বলতে কী বোঝায়? আর এটা কতোটাই বা স্ববিরোধিতা?

বোভয়র—আমার সবচেয়ে যেটা মজার মনে হচ্ছে তা হলো, যদিও তোমার বলতে ভালো লাগত যে, তুমি যে-কোন একটা লোক, কিন্তু তোমার পুরুষ-সত্তা যে আর কারো পুরুষ-সত্তা হতে পারে, এটা তুমি বুঝতে না।

সার্ত্র্—বরং, একজন নির্দিষ্ট লোকের নির্দিষ্ট পৌরুষ। তুমি মনে করোনা যে, জীবনভোর আমি নিজেকে যে-কোন একজন লোক ভেবেছি। চল্লিশ বছর বয়স থেকে আমি সে-রকম ভাবতাম আর এখনও আমি এটাই ভাবি।

বোভয়র—পুরুষ-প্রাধান্যের ব্যাপারটাতে ফিরে আসি। বিষয়টিকে বেশী সোজা করে ফেলা ঠিক হবে না। সবার ওপরে, তুমি আমাকে 'সেকেণ্ড সেক্স' বইটা লেখার ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহ দিয়েছিলে। বইটা লেখা যখন শেষ হলো, তখন তুমি তার সব তত্ত্বই মেনে নিয়েছিলে, অথচ ক্যামুর মতো লোকজন আমার মুখের ওপর বইটা ছুঁড়ে মারল। বস্তুত, যে-সব লোককে আমি নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা সমগ্র সমাজের ব্যাপারে যথার্থ গণতন্ত্রী ভাবতাম, তাদের অনেকের ভেতর সেই সময়েই আমি পুরুষ-প্রাধান্য ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ্য করি।

সার্ত্র—হয়ত তাই। কিন্তু আমাদের দুজনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি বরাবরই তোমাকে আমার সমান ভেবেছি।

বোভয়র—সত্যি, তুমি আমার ওপর কোন জবরদস্তি চালাওনি, আমার চেয়ে কোন রকমের শ্রেষ্ঠতাও তুমি কোনদিন দাবী করো নি। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভেতর

সাধারণতঃ যে উঁচু-নীচু ভেদ থাকে, তোমার-আমার সম্পর্কের মধ্যে তা কোন দিনই ছিলনা। তোমার পৌরুষের রহস্য বোঝার পক্ষে এ-ব্যাপারটা খুব প্রয়োজনীয়।

সার্ত্র্—তোমার-আমার সম্পর্কের ভেতর দিয়েই আমি শিখেছি ও বুঝেছি যে, নারী আর পুরুষের ভেতর এমন সব সম্পর্ক আছে যা উভয়ের সমতারই প্রমাণ। তোমার চাইতে নিজেকে আমি বেশী বড়, বেশী বুদ্ধিমান, বা বেশি সক্রিয় কখনই ভাবি নি। আমি আমাদের দুজনকেই এক পর্যায়ে ফেলি। হয়ত খুব অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু আমার মনে হয় এই সমতাবোধ একদিক থেকে আমার পৌরুষকে পুষ্টই করেছে। আমাদের দুজনের এই সমতা দুজন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য মাত্র নয়, বস্তুত তা নারী ও পুরুষের সমতারই প্রমাণ।

বোভয়র—ঠিক। একথা বলেই তুমি 'সেকেণ্ড সেক্স'-কে স্বীকার করে নিয়েছিলে। 'সেকেণ্ড সেক্স' অবশ্য তোমার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটায় নি। বলা ভালো, আমার মধ্যেও কোন পরিবর্তন আনে নি। এর কারণ, আমার মনে হয়, আমাদের তখন একই বিশ্বাস ছিল। আমরা দুজনেই বিশ্বাস করতাম যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নারীমুক্তি ঘটাবে। ১৯৬৯-এর কাছাকাছি কোন সময়ে আমি প্রকাশ্যেই নারী মুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিলাম। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে অনুসরণ করেছ। কিন্তু আমি জানতে চাই, কতটা অনুসরণ তুমি আমাকে করেছ? নারীমুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে তুমি কী ভাবো? এটার সংগে শ্রেণীসংগ্রামের যোগ কীরকম বলে তুমি মনে করো?

সার্ত্র্—আমি মনে করি এই দুটো দুই স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও চেহারার সংগ্রাম। এতোদিন পর্যন্ত শ্রেণী সংগ্রামটা পুরুষদের মধ্যেই ঘটেছে। পুরুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই শ্রেণীসংগ্রাম। নারী-পুরুষের সম্পর্কটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। বলা বাহুল্য, অর্থনীতির দিক থেকে খুব জটিল কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু নারীরা তো কোন শ্রেণী নয়, আর নারীদের সংগে সম্পর্কের সূত্রে পুরুষরাও কোন শ্রেণী নয়। অত্যাচারিত বা নিগৃহীতদের জন্য দুটো সংগ্রাম আছে—শ্রেণীসংগ্রাম এবং নারী-পুরুষের সংগ্রাম। অনেক সময়ই এই দুটো সংগ্রাম মিলে যায়। আজকের দিনে এই দুই সংগ্রামের মিলে যাওয়ার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। আমি শুধু 'ঝোঁক'-ই বলছি, কেননা, সংগ্রাম দুটির নীতিগুলো একই ভাষায় তো প্রকাশ করা হচ্ছেনা। একজন বুর্জোয়ার স্ত্রী আর একজন মজুরের স্ত্রী শ্রেণী-শত্রুতার দ্বারা পরস্পরের শত্রু হয় না। বুর্জোয়া আর মজুরের শ্রেণী বৈশিষ্ট্য মেয়েদের কাছে এসে পেঁছায় অনেক পরোক্ষভাবে। একজন বুর্জোয়া গিন্নী ও তার ঝি-এর মধ্যে অনেক সময় এমন সম্পর্ক দেখা যায় যেটা একজন মিল-মালিক এবং সেই মিলের একজন মজুরের বেলায় ভাবা যায় না।

বোভয়র—কীরকম সম্পর্কের কথা তুমি বলছ?

সার্ত্র্—ধরো, এমন সম্পর্ক যে বুর্জোয়া মহিলা তার স্বামীর কথা, স্বামীর সংগে তার ভাব-ভালোবাসার কথা, তার বাড়ীঘরের কথা বলেন;—আলাদা শ্রেণীর এই দুই নারীর ভেতর বেশ একটা বোঝাপড়া থাকতে পারে। আমার মনে হয়, যেখানে কোন নারী কোন ব্যবসায়ের মাথা, সে-রকম ক্ষেত্রে ছাড়া বুর্জোয়া নারীরা বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। সে তার স্বামীর বকলমে বুর্জোয়া।

বোভয়র—মানে, যারা বরাবরই বুর্জোয়া তুমি এ ধরনের নারীদের বোঝাচ্ছ ?

সার্ত্র—হ্যাঁ ; যারা মা-বাবার সংগে থাকেন বাবার কর্তৃত্বে, তারপর বিয়ের পর স্বামীর কর্তৃত্বে। সেই ধরনের নারীর কোন সুযোগ নেই নিজেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার। নিশ্চয় তিনি অনেক সময় বুর্জোয়া নীতি-নিয়ম গ্রহণ করেন। বুর্জোয়ার স্ত্রীকে নিশ্চয়ই বুর্জোয়া মনে হয়। তিনি তার স্বামীর মতোই মতামত ব্যক্ত করেন ; কোন কোন ক্ষেত্রে অধস্তনদের সংগে ব্যবহারে তিনি তার স্বামীর হাবভাবই নকল করেন। বাড়ির ঝি-এর প্রতি তার একটু অস্পষ্ট দোটানা ভাব থাকে। একদিকে দুই নারীর মধ্যে একটা সমঝোতা আছে। বুর্জোয়া গিন্নী অনেক সময় হয়তো ঝি-টিকে কিছু গোপন কথা বলেন, ঝি-টিও সেই গোপনতার অর্থ বোঝে এবং যখন যা বলার তা ব'লে তার গৃহকর্ত্রীর বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠে। অপরদিকে আবার গৃহকর্ত্রীতো নিয়োগকর্ত্রীও। সেটা অবশ্য তার স্বামীর সংগে সম্বন্ধ থেকে ধার করা কর্তৃত্ব।

বোভয়র—আসলে, নারীমুক্তি আন্দোলনের অনেকেই যে বলে একজন বুর্জোয়া নারী আসলে বকলমে বুর্জোয়া, সেটা তুমি স্বীকার করো ?

সার্ত্র—নিশ্চয়ই, যদি একটি পুরুষের মতো তার সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন না হয়। নতুবা সে শুধু বকলমেই ঐ জীবন পায়। একজন বুর্জোয়া নারীর তো পুঁজির সংগে কোন সম্পর্ক নেই ; তার সংগে সম্পর্ক আছে এমন এক পুরুষের যার পুঁজির সংগে সম্পর্ক আছে।

বোভয়র—ধরো, একজন বুর্জোয়া নারী, তার বাবা নেই, স্বামীই তাকে চালান। তিনি যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ চান, তাহলে তাঁকে কাজ খুঁজতে হয়। যে কাজ তিনি পান সেটা সাধারণত খুবই কম মাইনের, আর তা দিয়ে একজন মজুরের চেয়ে তো ভালো থাকা যায় না।

সার্ত্র—আমার মায়ের সংগে টাকা-পয়সার সম্পর্কের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রথমে মা তাঁর স্বামীর কাছ থেকে টাকা পেতেন, বিধবা হওয়ার পর তাঁর বাবার কাছ থেকে, এবং তারপর এক ভদ্রলোক তাঁকে বিয়ে করলেন, আমার বিপিতা, আমৃত্যু যিনি তাঁকে দেখাশোনা করেছেন। জীবনের শেষদিকে মা খানিকটা আমার বিপিতার রেখে যাওয়া টাকায় আর খানিকটা আমার দেওয়া টাকায় জীবন চালিয়েছেন। জীবনের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তিনি পুরুষদের দ্বারা পালিত, এবং পুঁজির সংগে তাঁর প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

বোভয়র—আচ্ছা, তুমি নারীমুক্তিসংগ্রামের নির্দিষ্ট প্রয়োজন মানো ?

সার্ত্র—নিশ্চয়ই, তবে আমি বিশ্বাস করি না যে, শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে এই সংগ্রামের জন্ম হয়েছে।

বোভয়র—যদিও নারীমুক্তিসংগ্রাম কোন কোন বিষয়ে শ্রেণীসংগ্রামের সংগে যুক্ত, তবু তা বস্তুত শ্রেণীসংগ্রামের বাইরের সংগ্রামগুলির অন্যতম বলেই আমার কাছেও মনে হয়। আরো কিছু কিছু সংগ্রাম আছে যেগুলি ঠিক শ্রেণীসংগ্রামের আওতায় আসে না, যেমন, ব্রিটানী বা লাগোয়াদকের জাতীয় সংগ্রাম।

সার্ত্র—সেগুলি অবশ্য শ্রেণীসংগ্রামের সংগে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক-যুক্ত।

বোভয়র—তরুণ সৈনিকদের বিদ্রোহ হচ্ছে এরকম একটি ব্যাপার যা শ্রেণীসংগ্রাম থেকে আলাদা। আজকাল এমন কিছু সংগ্রাম দেখা যাচ্ছে যা শ্রেণীসংগ্রামের সংগে যুক্ত হয়েও আলাদা বা শ্রেণীসংগ্রাম দিয়ে কোনভাবেই ব্যাপারটিকে পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না।

সার্ত্র্—হ্যাঁ। সেই সংগ্রামগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করা প্রয়োজন। পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর সংগ্রামের নির্দিষ্টতা অত্যাচারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সংগ্রামের মধ্যে নিহিত নেই। এটা স্বতন্ত্র, যদিও পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর সংগ্রাম শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কেননা, পুরুষরা নারীদের অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থায় আটকে রাখতে সচেষ্ট।

বোভয়র—যে নারীমুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তুমি মেনে নিয়েছ, তাকে তুমি কতোটা গুরুত্ব দাও ? মৌলিক বিরোধ এবং গৌণ বিরোধ—এই পুরোনো পার্থক্যটা কি এ ক্ষেত্রেও তুমি ব্যবহার করবে ? কি তুমি গৌণ বিরোধ বলে চিহ্নিত করবে ?

সার্ত্র্—কখনই না। আমার কাছে নারীদের সংগ্রাম সবসময়ই মৌলিক। কয়েক শ' বছর ধরে প্রত্যেকটি পরিবারে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভেতর দিয়ে এই সংগ্রাম চলে আসছে। ব্যক্তিগত সংগ্রামের এই মিলিত ফল বর্তমানে সাধারণ সংগ্রাম তৈরি করছে। এখন পর্যন্ত অবশ্য ব্যাপারটা সবাইকে স্পর্শ করে নি ; এমন কি, অধিকাংশ মেয়েরা এখনও বোঝেইনি যে, তাদের স্বার্থেই তাদের ব্যক্তিগত সংগ্রামকে সাধারণ সংগ্রামে মেলাতে হবে। এ সংগ্রাম সব পুরুষের বিরুদ্ধে সব নারীর সংগ্রাম।

বোভয়র—কিছু কিছু বিষয় আছে যেখানে মেয়েরা তাৎপর্য না বুঝেও গভীরভাবে আলোড়িত হয়। গর্ভপাতের বিরুদ্ধে যখন প্রথম আন্দোলন হয়, তখন মাত্র কয়েকজন বুদ্ধিজীবী তা আরম্ভ করেছিলেন। যখন ৩৪৩-এর আবেদনপত্রে আমরা সই করি তখন তো মাত্র কয়েকজন ছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা মেয়েদের মধ্যে এমন আলোড়ন আনল যে, শেষ পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে গর্ভপাত-বিষয়ক আইনটা আদায় করা গেল। এটা একটা জয় তো নিশ্চয়ই, যদিও আইনটা পুরোপুরি ভালো আইন নয়।

সার্ত্র্—কিন্তু তোমার মনে রাখা উচিত যে, অনেক পুরুষও গর্ভপাতের পক্ষে। গর্ভপাতের সংবাদ তো অনেক সময় পুরুষই বহন করে। যে পুরুষের কোন রক্ষিতা আছে, সে নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে কোন সন্তান আশা করে না।

বোভয়র—গর্ভবতী মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষের সতর্কতা নিয়ে মনে হচ্ছে তুমি বেশ আশাবাদী। এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে পুরুষ পালিয়ে যায়, টাকা-পয়সাও দেয় না—নৈতিক সমর্থনের তো কোন প্রশ্নই নেই। আমি বলছি, মেয়েরাই গর্ভপাতের পক্ষে সংগ্রামটা জিতেছে।

সার্ত্র্—হ্যাঁ, আপাতত জিতেছে। তা সত্ত্বেও এটা মনে রাখতে হবে যে, পুরুষদের পার্লামেন্টই ভোট দিয়ে আইনটা পাশ করছে।

বোভয়র—ও-কথা থাক্। এমন অনেক মেয়ে আছে যারা তাদের অত্যাচারের ব্যাপারটাকে ইতিবাচকভাবে দেখে না। বাড়ীর সব কাজ একা করা বা বাচ্চা মানুষ করার দায়িত্ব একা বহন করাটাকে এরা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে করে। যারা

একদিকে বাইরে কাজ করছে ও শোষিত হচ্ছে, এবং অন্যদিকে বাড়ীতে তাদের স্বামীদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, সেইসব শ্রমজীবী মেয়েদের ব্যাপারে নারীমুক্তি আন্দোলনের সমস্যা কী রকম বলে তোমার মনে হয়? পরিবারের মধ্যে এই শোষণ সম্পর্কে কি তাদের সচেতন করে তোলার প্রয়োজন আছে?

সার্ত্র্—নিশ্চয়ই আছে। তবে বর্তমানে বুর্জোয়া বা পাতিবুর্জোয়া মেয়েদের সংগে শ্রমজীবী মেয়েদের যে একটা দূরত্ব আছে সেটা বেশ স্পষ্ট। তাদের মূল স্বার্থ এক, মেয়ে বলে তারা পরস্পরের সংগে সংযোগ স্থাপনও করতে পারে, অথচ তারা আলাদাই থাকে। তাদের স্বামীদের শ্রেণীপার্থক্য থেকে এবং তারা তাদের বুর্জোয়া বা শ্রমজীবী স্বামীদের সামাজিক ভাব-ভাবনাগুলির প্রতিফলন ঘটায় বলে তাদের ভেতরে এই পার্থক্য তৈরি হয়। বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েদের প্রধান পার্থক্য এটাই।

বোভয়র—যে শ্রমজীবী মেয়ে নিজে কাজ করে শুধুমাত্র সে-ই দুভাবে শোষিত হয়। আমি খুব বাস্তব কারণে একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন রাখছি তোমার সামনে। প্রশ্নটি হলো, মেয়েটিকে কি তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা উচিত, যদিও মালিকের অত্যাচার থেকে তার বাঁচার একমাত্র ভরসাস্থল তার স্বামী-ই?

সার্ত্র্—একটা বিষয় তোমাকে মনে রাখতে হবে। নারীপুরুষের ভেতরকার সংগ্রামটা হচ্ছে প্রধান, আর শ্রেণীসংগ্রামটা হচ্ছে অপ্রধান। মেয়েরা যেখানে দুভাবে শোষিত বা নিগৃহীত, সেখানে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সংগ্রামটাই প্রাধান্য পাবে।

বোভয়র—মেয়েরা যখন কোন পেশাগত দাবীতে আন্দোলন করে তখন তো তুমি নারী-পুরুষের সংগ্রাম এবং শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে একটা সম্পর্ক দেখতে পাও। থ্রোয়ে-তে এবং নুভেল গ্যালারী-তে যে ধর্মঘট হয়েছিল তাতে এটাই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল যে, ঘরে বাইরে শোষণ মেয়েরা আর সহ্য করবে না। তোমার মতানুযায়ী তাহলে এমন কিছু করা ভালো যাতে মেয়েদের চোখ খোলে, তাতে যদি তাদের কিছু কষ্ট এবং উদ্বেগ হয়ও, তবু।

সার্ত্র্—অবশ্যই। জনসংখ্যার একটা অংশ মানুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে অংশ নেবে না, এটা আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়। যেহেতু মেয়েরা শোষিত এবং অত্যাচারিত, সেহেতু এ বিষয়ে তাদের সজাগ হতেই হবে।

বোভয়র—আমিও একথা স্বীকার করছি। তোমাকে এখন আর একটা প্রশ্ন করছি। নারীমুক্তি আন্দোলনে প্রশ্নটা খুবই জরুরী। একদিকে আমরা একটা সমতাভিত্তিক সমাজ চাই, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান চাই। শুধু তাই নয়, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সুযোগসুবিধা, এ সবেরও অবসান চাই। আবার, অন্যদিকে পুরুষের মতো পদমর্যাদা, সুযোগসুবিধা, সমান বেতন, ওপরে ওঠার সুযোগ—এসবও আমরা চাই। আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা রয়েছে।

সার্ত্র্—সামাজিক স্তরবিন্যাস রয়েছে বলেই স্ববিরোধিতা রয়েছে। আমি যদি কোন আন্দোলনের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমি চিন্তা করব এই স্তরবিন্যাসটা ভেঙে দেওয়ার আন্দোলনের কথা, কেননা, তাহলেই ঐ স্ববিরোধিতা লোপ পাবে। কাজের ভেতর নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে এ সমস্যা দূর হবে বলেই আমার

মনে হয়। আমার মতে, অধিকাংশ মেয়েরই একত্রিত হয়ে পুরুষদের সংগে সমানাধিকার দাবী করা উচিত যাতে সামাজিক স্তরবিন্যাস ভেঙ্গে যায়। এমন কি আজকের দিনে কোন কোন বিশেষ মেয়ের কৃতিত্বের দ্বারা একথাও প্রমাণ করতে হবে যে, সমাজে সেরা জীবিকাতেও মেয়েরা পুরুষদের সমান। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা যে মননশক্তিতে ছোট নয়, এটা প্রমাণ করা নিতান্তই জরুরী।

বোভয়র—তুমি কি মনে কর যে, যে-সব পুরুষ এরকম চিন্তা করে তারা এতে ব্যাপারটা বুঝবে? তুমি তো শ্রীমতী সোপিয়ের্তের ব্যাপারটা জানো। তিনি তো ইকোল পলিটেক্নিক্ থেকে প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু অনেক পুরুষই তো তাঁকে ছুতো হিসেবে ব্যবহার করবে। তারা হয়তো বলবে, এই তো মেয়েরা পুরুষদের সমান সুযোগ পাচ্ছে। পরীক্ষায় প্রথম হচ্ছে, তাদের দাবিয়ে রাখা হচ্ছে কোথায়? এ ধরনের বিপদ সম্পর্কে তোমার মত কী?

সার্ত্র্—বিপদটা যে আছে তা অস্বীকার করছিনা। তবে, পুরুষদের মধ্যে যারা ঐ ধরনের কথা বলে তাদের কথার উত্তর দেওয়া সোজা, যেমন তুমি 'লে ত" মদান" পত্রিকার বিশেষ নারীসংখ্যায় দিয়েছে।

বোভয়র—আচ্ছা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং চাকরী—এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করেই বলছি, শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও কি মেয়েদের এমন কোন চাকরী করা উচিত যেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে বাঁচিয়ে রাখা হয়?

সার্ত্র্—দেখো, আজকালকার দিনে এমন কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা ভাবাই যায় না যা চাকরীর সংগে যুক্ত নয়। তবে, এসব কাজে মেয়েরা পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

বোভয়র—প্রথমদিকে তুমি বলেছিলে যে, পুরুষ-সংগের চেয়ে নারী-সংগ তোমার ভালো লাগে। তার কারণ কি এই যে, নারীরা অত্যাচারিত বলে তারা পুরুষদের কিছু দোষত্রুটি এড়াতে পারে?

সার্ত্র্—নিশ্চয়ই। অত্যাচার আর শোষণের ফলেই এটা হয়েছে।

বোভয়র—তুমি তাহলে নারী-সংগ্রাম সমর্থন করো?

সার্ত্র্—একশবার। নারী-আন্দোলনের নেতারা যে সব ব্যাপারে ঐকমতে পৌছাতে পারেন না, এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তো আছেই। কিন্তু তাদের কোন জনভিত্তি নেই বলেই মনে হয়। সেই জনভিত্তি তাদের তৈরি করা দরকার। আর তাহলেই শ্রেণীসংগ্রামের সংগে যুক্ত হয়ে নারীসংগ্রাম আমাদের এই সমাজটাকে পাল্টে দিতে পারে।*

# মরিস মার্লো পঁতি

**জীবন ও দর্শন ঃ**

ফরাসী দার্শনিক মার্লো পঁতির জন্ম ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর দর্শনচিন্তা নিয়ে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে খুব একটা হৈ চৈ হয় নি, যেমন হয়েছে তাঁরই সমসাময়িক দার্শনিক সার্ত্র-কে নিয়ে। অথচ, সমকালীন অস্তিবাদকে, বিশেষ করে ফরাসী অস্তিবাদকে, বুঝতে গেলে মার্লো পঁতির দর্শনচিন্তার আলোচনা খুবই প্রাসংগিক।

মানসঘটনাবাদ বা ফেনোমেনোলজির জনক জার্মান দার্শনিক এডমুণ্ড হুসার্ল এবং অস্তিবাদের মহানায়ক সার্ত্র-এর দর্শনচিন্তাকে কেন্দ্র করেই মূলত মার্লো পঁতির দর্শনচিন্তা আবর্তিত হয়েছে। হুসার্লের মন্ত্রশিষ্যরূপে মার্লো পঁতি ফ্রান্সের দর্শনজগতে আবির্ভূত হন এবং নিজেই নিজেকে হুসার্লের 'উত্তরাধিকারী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মানসঘটনাবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও তিনি কিন্তু হুসার্লকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নি। অন্যদিকে তিনি সার্ত্র-এরও খুব কাছের লোক ছিলেন। বিখ্যাত সমাজতন্ত্রধর্মী ফরাসী পত্রিকা লে তঁ মদার্ন-এর অন্যতম সম্পাদক হিসেবে সার্ত্র-এর সংগে মার্লো পঁতি কাজ করেছেন সাত বছর—১৯৪৫ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত। যদিও বাস্তবিকপক্ষে সার্ত্রই ফরাসী বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকদের সংগে হুসার্লের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেন, এবং ফ্রান্সে মানসঘটনাবাদী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করতে সচেষ্ট হন, তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঐ কাজে সার্ত্র-এর যোগ্য সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন মার্লো পঁতি। যদিও সার্ত্র-কেই অস্তিবাদী-মার্ক্সবাদ-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়, তবু এ কাজে খানিকটা কৃতিত্ব মার্লো পঁতিরও প্রাপ্য। ফরাসী মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কম্যুনিস্টদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সার্ত্র এবং মার্ক্সবাদীদের আলোচনায় তিনিও অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই ধীরে ধীরে তিনি কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে দূরে সরে যান। রাজনৈতিক কারণে সার্ত্র-এর সংগেও ঘটে মত পার্থক্য। অস্তিবাদী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার মনোবাসনাও মার্লো পঁতির ছিল এবং বস্তুতঃ তাঁর রচনায় অস্তিবাদী উপকরণও যথেষ্ট রয়েছে। বোধহয় সেজন্যই সমকালীন দর্শনে মার্লো পঁতিকে 'অস্তিবাদমূলক মানসঘটনাবাদী' (এক্জিস্টেনসিয়েল ফেনোমেনোলজিস্ট) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর দর্শনচিন্তায় মানসঘটনাবাদী এবং অস্তিবাদী এই দ্বিমুখী ধারার মিলন ঘটেছে। সমকালীন ফরাসী দর্শনে মার্লো পঁতির অবদান নিতান্ত কম নয়।

সার্ত্র-এর মতো মার্লো পঁতির দর্শনের পরিধি খুব ব্যাপক নয়। তাঁর রচনার সংখ্যাও নিতান্তই সীমিত। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে 'দ্য স্ট্রাক্চার অব্ বিহেভিয়র,' 'দ্য ভিজিবল্ অ্যান্ড দ্য ইনভিজিবল্,' হিউম্যানিজম্ অ্যান্ড টেরর্,' এবং

ফেনোমেনোলজি অব্ পারসেপ্শন্'ই উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থটিই মার্লো পঁতিকে দর্শনজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মার্লো পঁতির প্রথম গ্রন্থ 'দ্য স্ট্রাকচার অব্ বিহেভিয়র' এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর দর্শনচিন্তার একটি ভিত্তি রচনা করা। কিন্তু বস্তুত ঐ গ্রন্থটি আচরণবাদের একটি সবিচার আলোচনা। গ্রন্থটিতে মার্লো পঁতি আচরণবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, ক্ল্যাসিকাল বা মূলপন্থী আচরণবাদীরা 'আচরণের বিজ্ঞান' তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আচরণবাদের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে, স্বাভাবিক মনুষ্য-আচরণ কখনও জাগতিক উদ্দীপকের প্রতি যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া নয়। আচরণবাদীদের উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সূত্রটির সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে, এর সাহায্যে মানুষের নানাবিধ আচরণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অবশ্য, উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার একটা প্যাটার্ন যে গবেষণাগারের বিশেষ পরিবেশে পাওয়া যেতে পারে তা তিনি অস্বীকার করেন নি। তবে, মার্লো পঁতি বলেছেন যে, 'নিষ্ক্রিয় বস্তু হিসেবে আমাদের দেহ বাহ্য কারণের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে'—বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একথা ভাবাই যায় না। পক্ষান্তরে, তাঁর জোরালো অভিমত হলো, 'আমাদের দেহ সক্রিয়ভাবে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে তার জগৎকে সংগঠিত করে'। আমাদের দেহের ওপর জাগতিক উদ্দীপক নিঃসন্দেহে ক্রিয়া করে, কিন্তু আমাদের দেহজ ইন্দ্রিয়গুলি যান্ত্রিক উপায়ে তার প্রতিক্রিয়া করে না ; বরং সমগ্র পরিবেশের প্রতি আমরা অর্থপূর্ণ প্রতিক্রিয়া করি।

আচরণবাদীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মার্লো পঁতি বলেছেন যে, তাঁরা 'আচরণ'-এর ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। আচরণ কোন দেহজ বা জড়াত্মক সত্তা নয়, আবার মানসিক সত্তাও নয়। তাঁর মতে, আচরণ হলো একটি আকার বা গঠন (স্ট্রাকচার) যা বাহ্যজগতেও নেই, আন্তরজীবনেও নেই। আচরণকে মার্লো পঁতি 'অস্তিত্বশীল হওয়ার উপায়' (Manner of existing) হিসেবেই গণ্য করেছেন। এ প্রসংগে তিনি আরো বলেছেন যে, মানব আচরণের কার্য-কারণ ব্যাখ্যা দান সম্ভব নয়। মানুষ শুধুমাত্র তার আচরণের প্রকাশ ঘটায় না, একমাত্র মানুষই পারে আচরণের প্রতীকায়িত রূপ (Symbolic form) প্রকাশ করতে। আচরণের এই প্রতীকায়িত রূপের ক্ষেত্রে আমরা যে প্রদত্ত উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করি তা যেসব নীতি বা নিয়মাবলীর মাধ্যমে হয় সেগুলি স্বেচ্ছায় মনোনীত হতে পারে, আবার ইচ্ছার স্বাধীন ক্রিয়ার দ্বারা সেগুলির পরিবর্তনও করা যেতে পারে। 'অস্তিত্বশীল হওয়ার উপায়' হিসেবে আচরণের এই যে নতুন প্রত্যয় বা ধারণা তা জগৎকে অর্থময় করে তোলার ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতা বা সামর্থকে অস্বীকার করে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করা যাবে না বলেই মার্লো পঁতির অভিমত। 'দ্য স্ট্রাকচার অব্ বিহেভিয়র' গ্রন্থের আরও কয়েকটি মৌল প্রত্যয়, যেমন, প্রত্যক্ষ, অতিক্রমণ ইত্যাদি নিয়ে মার্লো পঁতি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর 'দ্য ফেনো-মেনোলজি অব্ পারসেপ্শন্' গ্রন্থে।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'দ্য ফেনোমেনোলজি অব্ পারসেপ্শন্' গ্রন্থেই বস্তুত মার্লো পঁতির দর্শনচিন্তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও মার্কসীয়

ঘটনাবাদের জনক হুসার্লের কাছে তাঁর অপরিসীম ঋণ ও কৃতজ্ঞতার কথা মার্লো পঁতি বারবার স্মরণ করেছেন, তবু তাঁর মানসঘটনাবাদ স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র, স্বমহিমায় ভাস্বর। একে কিছুতেই হুসার্লের মানসঘটনাবাদের ব্লু-প্রিণ্ট বলা যায় না। হুসার্ল যে মানসঘটনাবাদের বা ফেনোমেনোলজির প্রবর্তন করেছিলেন তা কাণ্টীয় বা হেগেলীয় অর্থে নয়। তিনি চরমসত্তা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের আলোচনা করতে চান নি, বরং অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন কেমন করে আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞান সম্ভব হয়। তিনি যে 'ফেনোমেনা'-র কথা বলেছেন সেগুলি কোন ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার অবভাস নয়। সত্তা ও তার অবভাসের মধ্যে কোন পার্থক্য রচনার চেষ্টা হুসার্লের দর্শনে চোখে পড়ে না। দর্শনকে কতকগুলি সম্ভাব্য কাল্পনিক মতবাদের ক্ষেত্র না করে একটি কট্টর বা সুকঠোর বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা ছিল হুসার্লের। মানসঘটনাবাদী হিসেবে তাঁর প্রধান ইচ্ছা ছিল শুদ্ধ চিন্তনের মাধ্যমে জ্ঞানের ভিত্তি আবিষ্কার করা এবং এর দ্বারা সকল প্রকার অভিজ্ঞতার মূল গঠনভঙ্গিমা স্থির করা। হুসার্ল আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন কী কী মূল প্রত্যয় বা সারসত্তা আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞানকে সম্ভব করে তোলে। মূল প্রত্যয় আবিষ্কারের প্রতি ইংগিত জানিয়ে হুসার্ল বারবার বলেছেন, "মূল বস্তুতে ফিরে যাও"। একজন মানসঘটনাবাদী হিসেবে মার্লো পঁতিও একই কথা বলেছেন। অবশ্য তাঁর ভাষায় বলেছেন—"প্রত্যক্ষে ফিরে যাও"। প্রত্যক্ষের প্রাধান্য রক্ষা করাই মানসঘটনাবাদীর পবিত্র কর্তব্য বলে মার্লো পঁতি মনে করতেন।

ব্রেনটানোর প্রভাবে হুসার্ল চেতনার অভিমুখ্যতার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, চেতনা সবসময় কোন কিছুর চেতনা, তার যাত্রা কোন কিছুর অভিমুখে। চেতনা কখনও বিষয়হীন হয়ে থাকতে পারে না। চেতনার বিষয়বস্তু অবাস্তব হতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তু একটা থাকবেই। হুসার্লের এই 'অভিমুখ্যতা'-র ধারণাটি মার্লো পঁতিও গ্রহণ করেছেন, তবে অন্য অর্থে। হুসার্লের আত্মগণ্ডীবদ্ধ চেতনার ধারণাকে খণ্ডন করে মার্লো পঁতি মানসঘটনাবাদকে হুসার্লের শুদ্ধ চেতনার স্তর থেকে সামাজিক অস্তিত্বের স্তরে নামিয়ে এনেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, মানসঘটনাবাদকে আরো মূর্ত করে তোলা।

মার্লো পঁতি মনে করেন যে, যে-কোন ধরনের মানসঘটনাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো 'বিজ্ঞানের বর্জন'। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, হুসার্লের মন্ত্রশিষ্য হয়ে মার্লো পঁতির এ ধরনের বক্তব্য বেমানান, কেননা, হুসার্ল চেয়েছিলেন মানসঘটনাবাদকে কট্টর বিজ্ঞানে পরিণত করতে। কিন্তু মার্লো পঁতি যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, 'বিজ্ঞানের বর্জন' সরাসরিভাবে 'প্রত্যক্ষের প্রাধান্য'-এর সংগে সম্পর্কিত। সমগ্র বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি হলো সরাসরি প্রত্যক্ষীভূত বা অনুভূত জগৎ। এখানে অস্তিবাদের সুর সুস্পষ্ট। যদিও কিয়েকের্গার্দ ও মার্লো পঁতির মধ্যে সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নেই, তবু মাঝে মাঝে উভয়ের বক্তব্যের সাদৃশ্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিয়েকের্গার্দ যেমন বলেছিলেন," আমি ধর্ম ও নৈতিকতার চরম উৎস," সেরকম মার্লো পঁতিও বলেছেন, "সামগ্রিকভাবে আমিই জ্ঞানের চরম উৎস, কেননা, আমিই প্রত্যক্ষের উৎস"।

মার্লো পঁতির দর্শনের উদ্দেশ্য হলো, চেতনা এবং জগতের সম্বন্ধকে অনুধাবন করা এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ করেছেন। 'প্রত্যক্ষে ফিরে যাও' কথাটির অর্থ, মার্লো পঁতির মতে, 'জগতে ফিরে যাও', যে জগৎ জ্ঞানের পূর্ববর্তী। 'জ্ঞান জগৎ সম্পর্কেই কথা বলে'। মার্লো পঁতি সন্দেহাতীতভাবে তাঁর গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ববর্তী। তাঁর উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষের নিশ্চয়তা প্রমাণ করা নয়, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান যে প্রত্যক্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণ করা। আলোচ্য গ্রন্থটির সমগ্র অংশই জ্ঞান-পূর্ববর্তী জগতের উন্মোচনে সযত্ন প্রয়াসী।

মার্লো পঁতির বিখ্যাত গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান-পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের বিচার-বিশ্লেষণ করা। তাঁর প্রয়াস বর্ণনামূলক। তাঁর মতানুসারে, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে জগতে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক বোধ হবেনা, আর যতক্ষণ পর্যন্ত 'প্রত্যক্ষকারী বিষয়ী' এবং 'প্রত্যক্ষের বিষয়'-কে চূড়ান্তভাবে আলাদা করে রাখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যক্ষকে সম্যকভাবে বোঝা যাবে না। হাইডেগারের সংগে তিনি এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, 'মানুষ' এবং 'জগৎ'-কে বস্তুত কখনই সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চিন্তা করা যায় না। দেকার্ত 'মানুষ' ও 'জগৎ'-কে যথাক্রমে 'চিন্তাশীল দ্রব্য' এবং 'বিস্তৃত দ্রব্য' হিসেবে আলাদাভাবে চিন্তা করে ভুল করেছেন। এই দিক থেকে মার্লো পঁতিকে দেকার্ত-বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 'মানুষ' এবং 'জগৎ' এইভাবে চিন্তা না করে 'মানুষ-জগৎ' এইভাবে চিন্তা করাই যুক্তিসংগত। অন্য ভাবে বলা যায়, মার্লো পঁতি 'মানুষ' এবং 'জগৎ' এই দুটিকে একটি হাইফেনের সাহায্যে যুক্ত করে 'মানুষ-জগৎ' এই একটি কাঠামোর মধ্যে রাখতে চেয়েছেন। হাইডেগারের মতো তাঁর কাছেও যা সত্য তা হলো, 'বিশ্ব-মধ্যে-সত্তা' (Being-in-the-world)। মার্লো পঁতির মতে, "মানুষ একমাত্র জগতেই অবস্থান করে এবং জগতের মধ্যেই মানুষ নিজেকে জানতে পারে।" মানুষ ও জগতের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হলো প্রত্যক্ষ। সাধারণ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান মানুষ ও জগৎ-কে আলাদা করে রেখেছে বলে মার্লো পঁতি অভিযোগ করেছেন।

জ্ঞান-পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্লো পঁতি বলেছেন যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ববর্তী এবং তা আক্ষরিক অর্থে সত্য। শিশুর শৈশবাবস্থায় প্রত্যক্ষ হয়; জ্ঞান হয় না। জ্ঞান-পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্লো পঁতি 'এপোকি' পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন। এই পর্যায়েমানসঘটনাবাদী পদ্ধতির কাজ হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তু, এক কথায় জগৎ, থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া এবং বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সকল বিশ্বাস, মতবাদ, অবধারণ ও বিচার স্থগিত রাখা। হুসার্ল বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সকল বিচার ও বিশ্বাসকে বন্ধনীর মধ্যে রাখতে বলেছিলেন। মার্লো পঁতিও বন্ধনীভুক্ত প্রক্রিয়ার সমর্থক। কিন্তু তাঁর মতে, 'এপোকি' বা 'ট্রানসেন্ডেণ্টাল রীডাকসন' ও বন্ধনীভুক্ত প্রক্রিয়া হুসার্লের শুদ্ধ অহং-কে (Pure Ego) সূচিত করে না,—সূচিত করে প্রত্যক্ষে জড়িত দেহযুক্ত অহং বা দেহযুক্ত বিষয়ীকে। জগৎ-কে বন্ধনীভুক্ত করার অর্থই হলো প্রত্যক্ষকারী বিষয়ীকেও ঐ সংগে বন্ধনীভুক্ত করা। দেহযুক্ত বিষয়ী বা জগৎ কেউই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়,—একে অন্যের সাহায্যেই অর্থপূর্ণ হয়। দেহযুক্ত অহং বা বিষয়ী এবং জগতের মধ্যে যথার্থ

যে সম্পর্ক তা হলো দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। দুটি এমনভাবে পরস্পরের সংগে জড়িয়ে আছে যে, আমরা কখনই বিষয়ীকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুদ্ধ বিষয়ী হিসেবে পাই না। প্রত্যক্ষীভূত জগতের বাইরে কোন শুদ্ধ বিষয়ী বা অহং নেই—এটাই মার্লো পঁতির অভিমত। এ ব্যাপারে গুরু-শিষ্যের মতবিরোধ বেশ প্রকট।

দেহযুক্ত অহং-এর ধারণা মার্লো পঁতির মানসঘটনাবাদে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর মতে, প্রত্যক্ষকারী বিষয়ী সবসময়ই দেহযুক্ত। "আমার আত্মা এবং অন্যান্য আত্মার মধ্যে যোগসূত্র হলো দেহ"—সার্ত্র্-এর এই উক্তিকে মার্লো পঁতি সমর্থন জানিয়েছেন এবং দেহের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য সার্ত্র্-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। প্রত্যক্ষের প্রসংগ আলোচনায় মার্লো পঁতি বলেছেন, যে প্রত্যক্ষ মানুষ ও জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে সেই 'মানুষ' ও 'জগৎ' শুদ্ধ বিষয়ী ও শুদ্ধ জগৎ নয়। "সেই মানুষ হলো জগতেরই একটি অংশ এবং সেই জগৎ হলো তা মানুষ যার অংশ"। সমস্ত নির্বিচারবাদকে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষই আমাদের যথার্থ বিষয়গততার শর্তের সন্ধান দেয়। জগতের সংগে চেতনার সম্পর্ক অনুধাবন করার অর্থই হলো অন্যান্যদের সংগে তার সম্পর্ককে অনুধাবন করা, আর এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদিক বিচার করে মার্লো পঁতি এই সিদ্ধান্তই করেছেন যে, দর্শন বলতে প্রধানতঃ সমাজদর্শনকেই বোঝায়।

দার্শনিক হিসেবে মার্লো পঁতি পথ পরিক্রমা করেছেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। গতানুগতিক অভিজ্ঞতাবাদ বা বুদ্ধিবাদের কোনটিকেই তিনি গ্রহণ করেন নি। অভিজ্ঞতাবাদের বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন যে, সংবেদন আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। সংবেদন দিয়ে জ্ঞানের শুরু হয় না। বুদ্ধিবাদের বক্তব্য হলো, প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতা শুদ্ধ চিন্তনক্রিয়া শুরু করার পদ্ধতি বা উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্লো পঁতির প্রশ্ন, তাহলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন কী? শুদ্ধ চিন্তা কী করে অজ্ঞ থাকবে? তাঁর মতে, আমরা কিসের অন্বেষণ করছি তা আমাদের জানা উচিত, অন্যথায় আমাদের অন্বেষণ করাটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। বুদ্ধিবাদ বুঝতে পারে না যে, যে জিনিসের অন্বেষণ আমরা করি সে সম্পর্কে আমরা কিছুটা অজ্ঞ। যদি সে সম্পর্কে আমরা সব কিছু জানতাম, তাহলে আমরা তো অন্বেষণই করতাম না। মার্লো পঁতির কাছে শুদ্ধ অহং বা শুদ্ধ বিষয় কোনটাই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়,—দেহ ছাড়া চিন্তা বা চিন্তা ছাড়া দেহ কোনটাই এককভাবে অর্থপূর্ণ নয়। তাঁর মধ্যবর্তী পথের শুরু তাই দেহযুক্ত অহং দিয়ে। জগৎ-বহির্ভূত কোন শুদ্ধ বিষয়ী নেই, আবার বিষয়ী-বহির্ভূত জগৎও অর্থহীন। এখানে তিনি ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করেছেন। নিজ অভিজ্ঞতার বাইরে বস্তুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্বীকার করে মার্লো পঁতি ভাববাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু সংগে সংগে একথাও বলেছেনে, "যখন আমি বিষয়ীগততার সারধর্মের দিকে মনোযোগী হই, তখন দেখি বিষয়ীগততা দেহ ও জগতের সংগে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। এর কারণ, আমার দেহের ও জগতের অস্তিত্বের সংগে বিষয়ী হিসেবে আমার অস্তিত্বের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।"

নিয়ন্ত্রণবাদ ও চূড়ান্ত স্বাধীনতা—এ দু'য়ের মধ্যেও মার্লো পঁতি মধ্যবর্তী পথ

অনুসরণ করেছেন। মানুষ একান্তভাবেই স্বাধীন,—সার্ত্র্-এর এই বক্তব্য শেষপর্যন্ত তিনি সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে, মানুষ কোন সামাজিক পরিমন্ডলেই জন্মগ্রহণ করে, লালিত হয়, বর্দ্ধিত হয়। আমাদের ব্যক্তিসত্তা সামাজিক-ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের কার্যাবলী সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির স্বাধীনতা অবশ্যস্বীকার্য, আর তা আছে বলেই ব্যক্তি পরিবেশকে অর্থবহ করে তুলতে পারে।

একজন ফরাসী হিসেবে মার্লো পঁতির রচনা ফরাসী মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত এবং অস্তিবাদী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যদিও সার্ত্র্-এর মতো তিনি দার্শনিক-উপন্যাস বা নাটক লেখেন নি, কিংবা মার্সেলের মতো দিনপঞ্জীর আকারে দর্শন রচনা করেন নি এবং যদিও তাঁর লেখা মাঝে মাঝে পুনরুক্তিমূলক দোষে দুষ্ট, তবু তাঁর রচনায় মৌলিকত্ব রয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। অনেক সময় তাঁর লেখা সার্ত্র্-এর লেখার চেয়েও বেশী পরীক্ষিত। এটা কম কথা নয়।

**মানসঘটনাবাদ—সার্ত্র্ এবং মার্লো পঁতি :**

সার্ত্র্ মানসঘটনাবাদী পদ্ধতির চরমরূপ দিয়েছেন, আর এই প্রক্রিয়ায় তিনি এই পদ্ধতিকে সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নকরণের দিকে নিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, চেতনার অভিজ্ঞতাঊর্ধ্ব শূন্যতার পটভূমিকা থেকেই জগতকে বন্ধনীভুক্ত করা যায়। তাঁর আলোচনা-প্রক্রিয়ায় দেখা যায় তিনি যতোনা হাইডেগারপন্থী তার চেয়ে বেশী হুসার্ল পন্থী। মার্লো পঁতি কিন্তু হুসার্ল অপেক্ষা হাইডেগারের প্রভাবেই বেশী প্রভাবিত। তাঁর মতে, মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণের চরমরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গতিশীল। তাঁর মত অনুযায়ী এই পদ্ধতি হলো জগতের সঙ্গে আমাদের অবিনশ্বর সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার উপায়, এই জগৎ এবং এর অবিচ্ছেদ্য উপস্থিতি প্রকাশের উপায়। আমরা কখনও শূন্যতার মধ্যে আবদ্ধ থাকি না। আমরা সম্পূর্ণরূপে জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণকে মার্লো পঁতি জগৎ থেকে সরে গিয়ে বিশুদ্ধ চেতনার দিকে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিরূপে ব্যাখ্যা করেন নি। যদি তিনি জগৎ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেন সেক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য হলো জগৎকে দেখা এবং জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। অতীন্দ্রিয় চেতনায় নিজেদের সীমিতকরণ করে সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের সমস্ত চেতনা, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত মনুষ্যবোধ এক চিরবর্তমান আশ্রয় থেকে গৃহীত। এই আশ্রয় হল জগৎ, যা ইতিমধ্যেই বর্তমান, যা চরমরূপে প্রাথমিক। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ হবে জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ীর এক অস্তিবাদী দর্শনের সূত্র।

মার্লো পঁতি সার্ত্র্-এর কাছে অনেকাংশে ঋণী হলেও চেতনা এবং স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নে তিনি সার্ত্র্ থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী। সার্ত্র্-এর মতে, আমার অস্তিত্ব আমি অস্তিত্বশীলতার যে চেতনা লাভ করি তাতেই সীমিত বা কেন্দ্রীভূত। কিন্তু মার্লো পঁতি মনে করেন, চেতনার যে ধারণা তার নিজের কাছে স্বচ্ছ এবং যার অস্তিত্ব নিজের অস্তিত্বশীলতার চেতনাতেই সীমিত সেই চেতনার ধারণা নিজ্ঞানের

ধারণা থেকে খুব বেশী ভিন্ন হবে না। এই চেতনা অস্তিত্বের সঙ্গে পুনরায় সংহতিযুক্ত। এই চেতনা নিজেকে একপ্রকার অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতায় জানে এবং এর ফলেই এই চেতনার পক্ষে বিশুদ্ধ চেতনা বা নিরপেক্ষ অস্তিত্ব হয়ে ওঠার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। সার্ত্র্-এর কাছে এই অস্তিত্ব হলো উদ্বেগ এবং ঘৃণা বা ধিক্কার, কিন্তু মার্লো পঁতির কাছে এই অস্তিত্ব হলো অনেকার্থকতা, আকস্মিক ঘটনা এবং ঝুঁকির ব্যাপার।

সার্ত্র্ যে স্বাধীনতাকে নিরন্তর বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়া রূপে দেখেছেন তা মার্লো পঁতির কাছে জগতে আমাদের সার্বিক নিযুক্তির নঞর্থক দিক মাত্র বলে মনে হয়েছে। আমার স্বাধীনতা কখনও একাকী নয়, সব সময়ই এর সঙ্গী থাকে। আর এই স্বাধীনতার অবিরাম বিচ্ছিন্নকরণের শক্তির ভিত্তি হলো জগতে আমাদের সার্বিক নিযুক্তি। বিষয় সমূহের মধ্যে রয়েছে আমার কার্যকরী স্বাধীনতা। এই মূল বা ভিত্তি ছাড়া স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা হয় না, আর এই ভিত্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকার মধ্যেই প্রকাশিত হয় আমার অস্তিত্বের জগতে আমার অংশ গ্রহণে অনেকার্থকতা বা অস্পষ্টতা। সার্ত্র্-এর বিরুদ্ধে মার্লো পঁতি উল্লেখ করেন যে, ভাববাদী অনুচিন্তনের মতোই নাস্তিকরণ নিজেকে বিনষ্টির দিকে নিয়ে যায় এবং বিষয়ীগততায় নিজেকে রূপান্তরিত করে। মার্লো পঁতির মতে, মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ জগতের উদঘাটন করে, এই জগৎ হলো প্রত্যক্ষের জগৎ, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক জগৎ ; সংক্ষেপে মূল বা প্রাথমিক জগৎ। আর যতোই অনুচিন্তন অননুচিন্তনশীল জীবনের উপর তার নির্ভরশীলতাকে প্রকাশিত করে ততোই আরো ভালোভাবে আমরা উপলব্ধি করি যে, অনুচিন্তন যতক্ষণ না তার শুরু সম্পর্কে সচেতন হয় ততক্ষণ তা অসম্পূর্ণ।

মানসঘটনাবাদী পদ্ধতি অনুচিন্তন সম্পর্কে অনুচিন্তনের উপায় দান করে। এটাই হলো চরম এবং মৌলিক অনুচিন্তন, আর এইভাবেই প্রকাশিত হয় যে, অনুচিন্তন এমন কিছু বিষয়ের দিকে নির্দেশ করে যা অনুচিন্তন লব্ধ নয়। এর দ্বারা অনুচিন্তন অননুচিন্তিত বিষয় রূপে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু তার দ্বারা তাকে সে এক চরম বা নিরপেক্ষ চেতনার অন্তর্ভুক্ত করে না। আর এই অনুচিন্তনশীল চেতনার পক্ষে জগতের বাইরে পাখা মেলে উড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এমন কোন চিন্তা নেই যা আমাদের সমগ্র চিন্তাকে কুক্ষিগত করে। অতএব, মার্লো পঁতির বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানসঘটনাবাদে চেতনা যতোই কেন্দ্রীভূত বিষয় হোক না কেন, তা আর প্রাথমিক থাকে না। প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় বা অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব হলো জগৎ, তা হাইডেগারের 'সত্তা'-ও নয়, আবার সার্ত্র্-এর চেতনাও নয়। তবে এই জগৎ প্রচলিত দর্শনের বাহ্য জগৎ নয়, এই জগৎ হলো বিশ্ব বা জগতের সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বগত সম্বন্ধ। এই ভাবে মার্লো পঁতি হাইডেগারের বিশ্ব-মধ্যে-সত্তাকে হুসার্লীয় সীমিতকরণের যথার্থ লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

মানসঘটনাবাদী বর্ণনা আমাদের কাছে আবভাসিক জগৎকে উৎঘাটিত করেছে। মার্লো পঁতির মানসঘটনাবাদী সীমিতকরণ আমাদের দান করে অতীন্দ্রিয় বা

অভিজ্ঞতার-ঊর্ধ্বে রূপে জগৎকে। তাই সাক্ষাৎ বর্ণনারূপে যে মানসঘটনাবাদকে বুঝি তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে মানসঘটনাবাদের মানসঘটনাবাদকে। অনুচিন্তনের ভিত্তি সম্পর্কে অনুচিন্তনের মাধ্যমে আমরা প্রদত্ত সত্তার প্রদত্ত সত্তায় উপনীত (Phenomenon of phenomenon) হই। অনুচিন্তনের দ্বিগুণিত করণ প্রক্রিয়া এটাই বুঝিয়ে দেয় যে, মানসঘটনাবাদী পদ্ধতি মূলতঃ পুনরাবৃত্তি মূলক, এবং ফলে তার কখনও শেষ হয় না। তবে মানসঘটনাবাদের অসম্পূর্ণতা ব্যর্থতার চিহ্ন নয়, এই অসম্পূর্ণতা অনিবার্য কারণ। মানসঘটনাবাদের কাজ হলো জগতের রহস্য এবং যুক্তির রহস্যের উম্মোচন।

মার্লো পঁতির মানসঘটনাবাদ আমাদের অবিরাম ধারায় নিয়ে আসে বস্তু থেকে অর্থে, সত্তা থেকে অস্তিত্বে। দেহ এবং চেতনা পরস্পর জড়িত। প্রতিটি দেহ ইতিমধ্যেই অর্থপূর্ণ, আর চেতনা সবসময়ই দেহে প্রকাশিত। মানসঘটনাবাদী আভিমুখ্যতার ধারণা প্রচলিত জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিমান মূলক চেতনার কথাই বলে। অনেকে মনে করেন, মার্লো পঁতির লক্ষ্য কান্টের লক্ষ্যের মতোই। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রয়েছে যে সমস্ত শর্তাবলী তিনি সেগুলির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু কান্ট জগৎকে ঐক্যবিহীন বহুত্বে সীমিত করেছেন। অপরপক্ষে, মার্লো পঁতি জগতের এমন-এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন যা বিশ্বজাগতিক এবং সর্বকিছুর মূল। এই জগৎ হলো মনোস্তাত্ত্বিকতা, যুক্তিবিজ্ঞান প্রতিমানমূলক চেতনা ইত্যাদির বহির্ভূত অস্তিত্বমূলক এবং বেঁচে থাকার প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা।

মার্লো পঁতি দেখিয়েছেন যে, প্রত্যক্ষই জগতের সঙ্গে আমাদের মূল বা প্রাথমিক সম্বন্ধ। প্রত্যেক্ষের জগৎই আমাদের কাছে সমস্ত তাৎপর্যের সূতিকাগার, সমস্ত অর্থের অর্থ, সমস্ত চিন্তার বিকাশরূপে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু 'অর্থ' কথাটি মার্লো পঁতির ব্যাখ্যায় নতুন তাৎপর্যপূর্ণ। এই অর্থ জগতের সঙ্গে আমাদের মূল সম্বন্ধের মধ্যেই বর্তমান। মার্লো পঁতি তাই কোন একটি অর্থের কথা বলেন না, শুধু অর্থের কথাই বলেন। অর্থ অনেকার্থক, অর্থহীনতার সংগে মিশ্রিত, কারণ সীমিতকরণ কখনও সম্ভব হয় না। অর্থ ইতিমধ্যেই পূর্ব থেকে অস্তিত্বশীল নয়। আমরাও অর্থ এবং মূল্যের সৃষ্টি করি না। আমরা সুনির্দিষ্ট শব্দের সাহায্যে জগৎ সম্পর্কে অস্পষ্ট জ্ঞানের প্রকাশ করি মাত্র। মার্লো পঁতি প্রথমে সংকেতের মধ্যে অর্থের উপস্থিতি নির্দেশ করেছেন। তার পর অগ্রসর হয়েছেন অঙ্গভঙ্গী মূলক অর্থ থেকে প্রত্যয়গত বা ধারণাগত অর্থের দিকে। মার্লো পঁতি বলেন, যদি প্রতিটি জিনিসের পূর্ব থেকে অর্থ থাকতো, আর জগতের বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বলতে যদি কোন বিচারবুদ্ধি-পূর্ণ পরিকল্পনার রূপায়ণ বোঝাতো, তাহলে ইতিহাস বলে কিছু থাকত না। আবার তেমনি যদি সর্বকিছুই যুক্তিহীন হতো অথবা যদি বস্তু সমূহের কারণ কতকগুলি বিরাট-অপরিবর্তনীয় তথ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, তাহলেও কোন ইতিহাস থাকতো না। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাখ্যার স্তরে মার্লো পঁতি কখনও জগৎ থেকে পলায়ন করেন নি। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমরা জগতে আছি আমরা যুক্তির মধ্যে এবং ভাষার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করি। আমরা যেন অর্থের মধ্যে, ইতিহাসের মধ্যে, রাজনৈতিক ক্রিয়ার মধ্যে সন্তরণ করি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মার্লো

পঁতি এক অনিবার্য অস্পষ্টতা বা অনেকার্থকতার দিকে অঙ্গুলির নির্দেশ করেছেন। তবে বিশুদ্ধতার কোন গজদন্ত মিনার থেকে রাজনৈতিক ক্রিয়ার অমঙ্গলের অবিশুদ্ধতাকে, জগতের অর্থহীনতাকে, ইতিহাসের ভীতি বা হিংসাকে নিন্দা করার সুখলাভ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বরং বিপরীতপক্ষে তিনি ইতিহাসের চিন্তা না করে বরং ইতিহাসের মধ্যে যোগদান করতেই আমাদের আমন্ত্রন জানান। তাঁর আহ্বান অনুযায়ী আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, আমরা অভিজ্ঞতার সঙ্গেই জড়িত আর দর্শন এই অভিজ্ঞতার এক সুতীব্র চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এক্ষেত্রে সার্ত্র্-এর মতোই মার্লো পঁতিও মানবতাবাদের সমর্থন করেন।

# আল্‌বের্‌ ক্যামু

**জীবন ও সাহিত্য :**

সমকালীন সাহিত্যজগতের অন্যতম দিক্‌পাল আল্‌বের্‌ ক্যামু ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী। এই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সাহিত্যকীর্তি বিশ্বসাহিত্যের আঙ্গিনায় স্বজ্যোতিতে ভাস্বর। তাঁর সাহিত্য কীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার। প্রথাভ্যস্ত পথে সাহিত্যানুশীলনে ক্যামু উৎসাহী ছিলেন না—প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর ছিল প্রাণের বিদ্রোহ। সাহিত্যের সহজ অর্থ যদি হয় 'নৈকট্য', তাহলে ক্যামু নিঃসন্দেহে বিশ শতকের দুনিয়ার সাহিত্যিক ও পাঠকদের অতি কাছের মানুষ—একান্তই আপনজন। তাঁর গভীর জীবনবোধ, মনীষা, এবং অত্যুজ্জ্বল সাহিত্যপ্রতিভা ছাড়াও ছিল একটি দার্শনিক দৃষ্টিভংগী। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যামুকে 'অস্তিবাদী' বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও ক্যামু কখনই অ্যাকাডেমিক অর্থে দার্শনিক ছিলেন না।

আলজিরিয়ার ম'দোভি গ্রামে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ক্যামুর জন্ম। উত্তর আফ্রিকার এই আরব দেশটি ফ্রান্স ১৮৩০-এর দশকে জয় করেছিল। জাতিতে ক্যামু ছিলেন মিশ্র ইউরোপীয়ান। পিতা লুসিয়াঁ ক্যামুর আদিভূমি ছিল ফ্রান্সের আল্‌শাস্‌ প্রদেশ। তিনি মদ্য ব্যবসায়ে সামান্য চাকরী করতেন। ক্যামুর জন্মের এক বছর পরই তাঁর পিতা মার্ন-এর যুদ্ধে নিহত হন। মাতা ক্যাথারাইন ছিলেন স্প্যানিশ এবং নিতান্তই নিরক্ষর। অন্যের বাড়ীতে ঠিকা ঝির কাজ করে অতি কষ্টে তিনি সংসার চালাতেন। পিতার মৃত্যুর পর ক্যামু, তাঁর বড় ভাই লুসিয়াঁ, মাতা ক্যাথারাইন, মাতামহী এবং পঙ্গু এক মামা বেলকুব্‌ জেলার শ্রমিক অঞ্চলে দুটি ঘরের এক ফ্লাটে কোনরকমে বাস করতেন। এ রকম পরিবারের সন্তানের পক্ষে ভালো শিক্ষা লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল বললেই চলে। কিন্তু ফরাসী শিক্ষাব্যবস্থা ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাম্যনীতির দ্বারা পরিচালিত বলে সকলের ভাগ্যেই সেখানে সুযোগ জোটে। অবশ্য ফ্রেনচ্‌-আলজিরিয়ায় গরীব শ্বেতাংগ ছাত্রদেরই সুযোগ জুটত, আরবদের প্রায় কোন সুযোগই জুটত না। শ্বেতাংগ ক্যামু তাই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ক্যামু মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তাঁর শিক্ষক লুই জারমেনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লুই জারমেনের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফলেই আলজিয়ার্সের লিসা বা রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে ক্যামু বৃত্তি লাভ করেছিলেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই ক্যামু মালরো পাঠ শেষ করেন। ক্যামুর ওপর মালরোর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ফুটবল ও সাঁতার ছিল ক্যামুর প্রিয় সংগী—প্রাণের ধন। বোধকরি সেজন্য পরবর্তীকালে দেখা গেছে তাঁর রচনায় সাঁতারেরও একটি বিশেষ স্থান আছে। ১৭ বছর বয়সে ক্যামু যক্ষারোগে আক্রান্ত হন এবং বেলকুরের ঐ ছোট্ট ফ্ল্যাট ছেড়ে তাঁর এক কাকার বাড়িতে আশ্রয় নেন। কাকা ছিলেন উদার হৃদয়ের লোক। পেশায় কশাই হলেও তিনি ছিলেন সাহিত্যসংস্কৃতিরসিক।

ভল্‌তেয়ারীয় ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন উদ্বুদ্ধ। ক্যামুর ওপর তাঁর প্রভাবও কিছু কম নয়।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং জাঁ গ্রেনিয়ারের সান্নিধ্যে আসেন। জাঁ গ্রেনিয়ারই তাঁকে সাহিত্য-শিল্প-দর্শন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেন—চিত্তলোকের অমৃত আস্বাদনের পথ দেখান। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে ক্যামু তাঁর দুটি রচনা পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাগুরু জাঁ গ্রেনিয়ারের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ক্যামুর রাজনৈতিক জীবনের শুরু—শুরু হয় ফ্যাসী-বিরোধী আমস্টারডাম-প্লেএল আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে। ঐ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে হেনরী বারবুসে এবং রোঁমা রোঁলা ছিলেন প্রখ্যাত। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু বিয়ে করেন এবং এক বছরের কিছু পরেই বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ক্যামু কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং আরবদের মধ্যে পার্টির প্রচারক হিসেবে কাজ করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, পার্টি আরবদের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ না দেখানোর ফলেই ক্যামু ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। কিন্তু তা ঠিক নয় বলেই মনে হয়। মনে হয় বলছি এই কারণে যে, এর পরের বছরও আলজিয়ার্সে কম্যুনিস্ট পার্টি পরিচালিত 'কালচারেল মিশন'-এর প্রধান হিসেবে ক্যামু কাজ করেছেন, এ প্রমাণ আছে। খুব সম্ভবতঃ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। শুধু তারিখ নিয়েই নয়, যে বিষয়কে কেন্দ্র করে ক্যামু পার্টির সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। অ্যান ডুরান্ট মনে করেন যে, পার্টির সংগে ক্যামুর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার মূল কারণ হলো, জাতিতে ফরাসী না হলেও মনে-প্রাণে যাঁরা ফরাসী তাঁদের প্রতি পার্টির বিমাতৃসুলভ মনোভাব। সেজন্যই ক্যামুর সংগে কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্ক ছিন্ন করার সঠিক সময় ও কারণ আজও খানিকটা রহস্যাবৃত।

আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন ক্যামু অর্থাভাবে মাঝে মাঝেই কেরানি কিংবা সেলস্‌ম্যানের কাজ করেছেন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ক্যামু লিখতে শুরু করেছেন এবং পরবর্তীকালে ঐ লেখারই কিছু অংশ 'বিটুইকস্ট্ অ্যান্ড বিটুইন' নামে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ক্যামুর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি একটি ভ্রাম্যমান নাট্যগোষ্ঠীও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ১৯৩৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রেডিও আলজিয়ার্সের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় ভ্রাম্যমান নাট্যগোষ্ঠিতে অভিনয় করেন। ঐ বছরই ক্যামু 'আলজার রিপাবলিকেন'-এ সাংবাদিক হিসেবে নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি অ্যাগ্রিগেশন পরীক্ষায় বসতে পারেন নি। স্বভাবতই সরকারী চাকরীও তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। ১৯৩৮-৩৯ কেটেছে তাঁর দারুণ ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। ১৯৩৮-এ লেখা শেষ হয় তাঁর বিখ্যাত নাটক 'ক্যালিগুলা'। তাঁর প্রধান দর্শনগ্রন্থ 'দ্য মিথ্ অব্ সিসিফাস্' এবং প্রথম উপন্যাস 'দ্য স্ট্রেঞ্জার' লেখার প্রস্তুতিও শুরু হয় ঐ বছরেই। এ ছাড়া, ঐ সময় তাঁর অন্যতম প্রধান কাজই ছিল পুস্তক সমালোচনা করা।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সংগে সংগেই ক্যাম্যু সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ঐ আবেদন মঞ্জুর হয় নি। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রাঁসিনে ফ্যোর নামে অরাঁ শহরের একটি মেয়েকে ক্যাম্যু বিয়ে করেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী ক্যাম্যুর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না। ঐ বছরই সেন্সর কর্তৃপক্ষের সংগে বিরোধের ফলে ক্যাম্যুর পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ক্যাম্যু তখন আলজিরিয়া ছেড়ে প্যারিসের দিকে পা বাড়ান। যে মাসে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য স্ট্রেঞ্জার' লেখা শেষ হয়। কিন্তু নাৎসীবাহিনীর আক্রমণের ফলে ঐ মাসেই তাঁকে প্যারিস ছেড়ে আসতে হয়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ক্যাম্যু অরাঁ শহরে চলে আসেন এবং একটি বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। অরাঁ শহরে থাকাকালীনই তিনি 'দ্য মিথ্ অব্ সিসিফাস্' লেখা শেষ করেন।

মাত্র ২৮ বছর বয়সেই ক্যাম্যু তাঁর নাটক 'ক্যালিগুলা', উপন্যাস 'দ্য স্ট্রেঞ্জার' এবং দার্শনিক রচনা 'দ্য মিথ্ অব্ সিসিফাস্'-এর জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন—বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পেয়েছেন স্থায়ী আসন। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে 'দ্য প্লেগ,' 'দ্য ফল্', 'দ্য জাস্ট্', 'দ্য রেবেল', 'ক্লশ পারপাস্', 'এ হ্যাপি ডেথ', 'এক্জাইল্ অ্যাণ্ড দ্য কিংডম্', 'রিফ্লেকশন্ অন্ দ্য গিলোটিন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ক্যাম্যুর সাহিত্যকীর্তির আলোচনা করতে গেলে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যে সামাজিক-রাজনৈতিক যুগ ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে তাঁর নাটক, উপন্যাস ও অন্য সব রচনা তাকে বাদ দিলে এই আলোচনার অংগহানি ঘটবে। শুধু তাই নয়। ক্যাম্যুর জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিকতাকে উপেক্ষা করলে তাঁর একটি আলেখ্য তৈরি করাও অসম্ভব হয়ে উঠবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, জন্মের এক বছর পরই ক্যাম্যু পিতৃহারা হন, শৈশব ও কৈশোর কেটেছে তাঁর দারুণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে, যৌবনের উষালগ্নে পেয়েছেন জাঁ গ্রেনিয়ারের সান্নিধ্য ও স্নেহ, জন্মসূত্রে মিশ্র ইউরোপীয়ান এবং দীর্ঘদিন ইউরোপীয়ান শ্রমিক শ্রেণী ও আরবদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে আলজিরিয়ায় বাস করেছেন, অথচ শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ক্যাম্যু ছিলেন পুরোপুরি একজন ফরাসী। তাত্ত্বিক দিক থেকে আলজিরিয়া উপনিবেশ ছিল না, ছিল ফ্রেন্চ্ রিপাব্লিকের অচ্ছেদ্য অংগ; অথচ তার ইতিহাসের বাস্তবতা ও জীবনযাত্রার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছিল ঔপনিবেশিক। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল মিশ্র ইউরোপীয়ান। তাদের কাছে আলজিরিয়ার ফ্রান্স-অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা ছিল বাস্তব চিন্তাপ্রসূত। পক্ষান্তরে, দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল আরব ও বারবার্ জাতি—ভাষা তাঁদের আরবি, ধর্ম ইসলাম। তাঁদের কাছে ফ্রেন্চ্-রিপাব্লিকের অচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে আলজিরিয়ার অবস্থান কাম্য ছিল না। মিশ্র ইউরোপীয়ান হওয়ায় স্বভাবতই ক্যাম্যুর স্বপ্ন ছিল ফ্রেন্চ্ আলজিরিয়া। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাবে আলজিরিয়া পঞ্চাশের দশক থেকে ষাটের দশকের গোড়া পর্যন্ত ফরাসী সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। মিশ্র ইউরোপীয়ান ও আরবদের মধ্যে যুদ্ধ আলজিরিয়ার সমস্যা ও সংকটকে তীব্রতর করেছে। ক্যাম্যুর জীবনের শেষ দু'বছরের অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। ফ্রান্স ও

আলজিরিয়ার সম্পর্কের সমস্যাজাত মানসিক অশান্তি থেকে ক্যাম্যু মুক্তি পান নি, আর তারই প্রতিফলন আমরা দেখি ক্যাম্যুর উপন্যাস 'দ্য স্ট্রেঞ্জার'-এ।

'দ্য স্ট্রেঞ্জার' ( বিকল্পে 'দ্য আউটসাইডার' ) প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে। উপন্যাসটির কেরানি নায়ক ম্যরসল্ একদিক থেকে ক্যাম্যুর ব্যক্তিগত জীবনের ও চিন্তাভাবনার প্রতীক। ছাত্রাবস্থায় অর্থাভাবে ক্যাম্যু নিজেও মাঝে মাঝে কেরানির কাজ করেছেন। সাংবাদিকতায় তিনি ম্যরসল্ নামটি ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহারও করেছেন। ক্যাম্যু দেখিয়েছেন যে, নায়ক ম্যরসল্ এই অসংগত ও অর্থহীন জগতে একজন 'স্ট্রেঞ্জার' ছাড়া কেউ নয়। উপন্যাসটির শুরু নায়কের মাতৃবিয়োগে তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে। মাতৃবিয়োগের প্রতি নায়কের মনোভাব প্রথানুগ নয়—সে উদাসীন। তাঁর এই উদাসীনতা সমাজ অনুমোদন করে নি। কিন্তু নায়ক তাঁর অনুভূতির ব্যাপারে কোন মিথ্যাভাষণ করতে চায় নি—অকপটে সে প্রকাশ করেছে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সে সমাজের খেলা খেলতে চায় নি, আর সেজন্যই সমাজের কাছে তাঁর আচরণ বিসদৃশ লেগেছে। সমাজে সে যেন নতুন, অনাত্মীয়, অপরিচিত—এক কথায় 'স্ট্রেঞ্জার'।

ক্যাম্যুর সাহিত্য রচনার মূলমন্ত্র একটি করুণ বাণী : 'জীবন মূলতঃ সম্পূর্ণ অসম্ভাব্য, যুক্তি যার অতল গহ্বরে আলোকপাত করতে পারে না'। এই জগৎ ও জীবন স্ব-বিরোধে পূর্ণ—অসংগত, অযৌক্তিক এবং অর্থহীন। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ম্যরসল্-এর চোখ দিয়ে ক্যাম্যু অত্যন্ত দক্ষতার সংগে সভ্য মানুষের শিক্ষা, ভালোবাসা, যুক্তি, কর্তব্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ-চিন্তা এবং সমস্ত রকম মূল্যবোধ যে অর্থহীনতার নামান্তর তা ব্যক্ত করেছেন। তবু, ক্যাম্যুর মতে এই অর্থহীন জীবনকে সাহসের সংগে স্বীকার করেই অপর ব্যক্তি ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য করতে হবে। জীবনটা আসলে তার শেষ-লক্ষ্যে-না-আসা একটা ব্যাপার। অন্যভাবে বলা যায়, মৃত্যুর এখনও-না-আসার পোশাকী নামই জীবন। 'দ্য মিথ্ অব্ সিসিফাস্'-এ মৃত্যুর ধারণার মাধ্যমে ক্যাম্যু আসলে জীবনেরই জয়গান করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, এবং আমার ধারণা তা ভুল করেই, যে, ক্যাম্যু একজন দুঃখবাদী এবং তাঁর কাছে সিসিফাসের মতো নিষ্ফল প্রচেষ্টার কাছে আত্মসমর্পণের সান্ত্বনাই মানুষের একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু দুঃখবাদী তো জীবনের প্রতি উদাসীন থাকেন, অথচ সিসিফাসের বিদ্রোহ দুঃখবাদকে খণ্ডন করারই ইংগিত দেয়। জীবনের সমস্ত রকম অসংগতি ও অর্থহীনতা সত্ত্বেও সিসিফাস্ সাহসের সংগে জীবনকে গ্রহণ করেছে। ক্যাম্যু তাই দুঃখবাদী নন।

'দ্য মিথ্ অব্ সিসিফাস্' গ্রন্থটি ক্যাম্যু রচনা করেন দীর্ঘকাল রোগভোগের পর, যখন তাঁর এই অনুভূতি হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে মাঝে মাঝে অসুস্থ হওয়াটা হবে তাঁর জীবনের অংগ, এবং ঐ পটভূমিকাতেই তিনি চিন্তা করেছেন আত্মহত্যা নিয়ে। গ্রন্থটির ভূমিকাতেই ক্যাম্যু বলেছেন, "জীবনের কোন অর্থ আছে কিনা এটা ভাবা খুবই সংগত ও অপরিহার্য ; সুতরাং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মহত্যার সমস্যার সম্মুখীন হওয়াই সংগত।" একজন নাস্তিক হিসেবে ক্যাম্যু গ্রন্থটির শেষে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করে না তার পক্ষেও আত্মহত্যা করা সংগত নয়।

ক্যামুর সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ভাবনার মূল বিষয় 'অসংগতি'। তাঁর মতানুসারে, মানুষের অভাব এবং জগতের অযৌক্তিক নীরবতার দ্বন্দ্ব থেকেই জন্ম নেয় অসংগতি। দৈনন্দিন জীবনের যান্ত্রিকতা, নিঃসংগতার অনুভূতি, সংকটময় প্রতিটি মুহূর্ত, বিচ্ছিন্নতাবোধ—এ সব কিছুই অসংগতির অনুভূতিকে নির্দেশ করে। অসংগতি সম্পর্কে অবহিত না হয়ে মানুষ থাকতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ নিরাশ হওয়া নয়। আশা না থাকা আর নৈরাশ্যের গভীরে নিমজ্জিত হওয়া এক নয়। ক্যামুর কাছে তাই আশা এবং আত্মহননই একমাত্র বিকল্প নয়। জীবন ও জগৎ অর্থহীন, অসংগত ও অযৌক্তিক, তা সত্ত্বেও ক্যামু 'দ্য মিথ্ অব্ সিসিফাস্'-এ বলেছেন, বেঁচে থাকাটাই হলো অসংগতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদ্রোহই মানবজীবনকে মূল্য দান করে। মানুষের অস্তিত্ব ও তাৎপর্যকে দূরে সরিয়ে রেখে অন্য কিছুর উপলব্ধির প্রচেষ্টা ক্যামুর কাছে তাই নিরর্থক। মানুষকে বাদ দিয়ে জগৎ ও প্রকৃতির অর্থ বুঝতে তাই তিনি অসমর্থ। আত্মহনন বিদ্রোহের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। আত্মহননের দ্বারা তাই প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করা যায় না। আত্মহনন বস্তুত স্বীকৃতিরই নামান্তর। 'দ্য মিথ্ অব্ সিসিফাস্' গ্রন্থটিতে তাই প্রতিফলিত হয়েছে মৃত্যু সম্পর্কে এক শিল্পীর ভাবনা।

ক্যামুর 'দ্য প্লেগ' গ্রন্থটিতে প্রতিফলিত হয়েছে প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর জার্মানরা গ্যাব্রেল পেরীকে হত্যা করে। এই সংবাদ ক্যামুকে বিচলিত করে এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যুদ্ধের পর এক সাক্ষাৎকারে ক্যামু বলেছিলেন, "তুমি প্রশ্ন করছ, কেন আমি প্রতিরোধের পক্ষে ছিলাম? কিছু লোকের কাছে, আমি তাঁদেরই একজন, এই প্রশ্নের কোন অর্থ নেই। আমার কাছে মনে হয়েছিল, এবং এখনও মনে হয়, আমরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের পক্ষে থাকতে পারিনা। আমি তখন বুঝেছিলাম যে, আমি হিংসার চেয়ে হিংসার প্রতিষ্ঠানকেই ঘৃণা করি বেশী…।" 'প্লেগ' শব্দটিকে ক্যামু তাঁর গ্রন্থে অনেকার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ওঁরা শহরে প্লেগের আবির্ভাব গ্রন্থটির একটি ঘটনা। কিন্তু ক্যামু মানুষের অসংগত পরিবেশকেও 'প্লেগ' শব্দটির দ্বারা বুঝিয়েছেন। এমন কি, হানাদার জার্মান নাৎসী বাহিনীকে তিনি ভয়াবহ প্লেগ রোগের সংগে তুলনা করেছেন। 'প্লেগ' শব্দটি তাই প্রতীক হিসেবে ক্যামুর রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। একদিকে প্লেগ বাইরের একটি ঘটনা—মানুষ ও ইঁদুরের বিরোধ বা যুদ্ধ; অন্যদিকে আবার মানুষে মানুষে হানাহানিকেও ক্যামু বলেছেন প্লেগ।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ক্যামু 'কঁবা' নামক একটি গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন এবং ঐ নামের একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট মুক্তির দিনে কঁবা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবে ক্যামু স্বনামে সম্পাদকীয় লিখলেন—"আগস্টের রাতে প্যারিস তার সমস্ত গুলি উজার করে ঢেলে দিয়েছে। ঐতিহাসিক নদীর চারদিকে, পাথর ও জলের পরিপ্রেক্ষিতে, আবার মুক্তির ব্যারিকেড দেখা দিয়েছে। ন্যায় আবার অর্জিত হয়েছে রক্তের বিনিময়ে।" ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু দ্বিতীয়বার যক্ষারোগে আক্রান্ত হন এবং ফ্রান্সে চলে আসেন। ১৯৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্দে

ক্যামুর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল : 'ঈশ্বরহীন ও পরমমূল্যহীন জগতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কোন নৈতিক বিধি আছে কিনা'। এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়েই ক্যামু 'ন্যায়'-এর তাৎপর্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর 'দ্য জাস্ট্' নাটকে ক্যামু মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য হিংসার ব্যববহারের মধ্যে যে অসংগতি লক্ষ্য করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। স্কোরাতভের মুখ দিয়ে ক্যামুই বলেছেন, "ন্যায় বা সুবিচার চেয়ে অনেকেই শুরু করে, কিন্তু শেষ করে পুলিশবাহিনী গঠন করে।" তাঁর নাটক 'ক্রুশ্‌পারপাস্'-এ মার্থার বক্তব্য এখানে প্রাসংগিক : "মনে রাখবেন, মানব-জাতির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তোমাদের দুঃখকষ্ট কিছুতেই তার সমতুল্য হতে পারে না"।

'দ্য রেবেল' গ্রন্থটিতে আমরা ক্যামুর পরিণত রাজনৈতিক চিন্তাধারার সংগে পরিচিত হই। প্রথমদিকে, আমরা জানি, ক্যামু কম্যুনিস্টপন্থী ছিলেন এবং পার্টির সদস্যও ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি পার্টির সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ধীরে ধীরে কম্যুনিজম-বিরোধী হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কম্যুনিজম-বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পোঁছেছিল যে, তিনি কম্যুনিজম্ ও ফ্যাসিজম্-কে একই বন্ধনীর মধ্যে রাখতেন। তাঁর মতানুসারে, কম্যুনিজম্ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বিপদ। বিপ্লব এবং রুশ আগ্রাসনের মধ্যে তাই তিনি কোন পার্থক্য খুঁজে পান নি। টোটালিটেরিয়ান স্টেট্-এর প্রতি ক্যামুর বিদ্রোহ তাই এতো তীব্র। রাজনৈতিক হত্যাকে কোনদিনই ক্যামু সমর্থন করেন নি। হত্যার রাজনীতির তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। 'পরিণাম বা লক্ষ্য উপায়ের ন্যায্যতা নির্ধারণ করে'— এই নীতিতে ক্যামুর কোন আস্থা ছিল না। হিংসা বলতে ক্যামু বিপ্লবী হিংসাকেই বুঝিয়েছেন। প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রের হিংসাকে তিনি মনে করেছেন গৌণ, নিছক দুর্ঘটনা, বা ন্যায়সংগত। অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের প্রতি যে বিদ্রোহ করে সেই 'বিদ্রোহী'-র প্রতি ক্যামুর সহানুভূতি ছিল বেশী; ভাবাদর্শের দোহাই দিয়ে যে বিপ্লবী অন্যদের ওপর স্টীমরোলার চালায় ক্যামু তাকে কখনই সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে, বিপ্লব বিদ্রোহের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে, জন্ম দেয় নতুন শোষণের। এসব বক্তব্যের সংগে ক্যামু যোগ করেছেন তাঁর প্রিয় বিষয় 'মেডিটারেনিয়ান সূর্যস্নাত সভ্যতা'-র জয়গান। প্রকাশ্যেই তিনি বুর্জোয়া মূল্যবোধগুলি আঁকড়ে ধরেন এবং ধীরে ধীরে মার্কিন শিবিরের মুখপাত্র হিসেবে রাজনৈতিক মহলে চিহ্নিত হয়ে যান। রাজনৈতিক সূত্রেই সার্ত্র্-এর সংগে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল, রাজনৈতিক সূত্র ধরেই সেই ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের পরিসমাপ্তিও ঘটেছিল। আসলে, হিংসা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্যামুর প্রতিক্রিয়াই তাঁকে বাম-বিরোধী শিবিরে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন ন্যায় ও শান্তি। বিশ্বসাহিত্য দরবারে ক্যামু তাই পশ্চিমী বিবেকের প্রতীক এবং ঈশ্বরহীন জগতে একজন ন্যায়বান সন্ত। সুইডেনে ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে ক্যামু বলেছিলেন, "আমি সর্বদাই সন্ত্রাসের নিন্দা করি। কোনদিন সন্ত্রাসবাদ যদি আলজিরিয়ার রাস্তাঘাটে অন্ধভাবে হানা দেয়, যা যে-কোন সময় আমার পরিবার বা মাকে আঘাত করতে পারে, তাহলে নিঃসন্দেহে সেই সন্ত্রাসবাদের আমি নিন্দা করতে বাধ্য। আমি ন্যায়ে

বিশ্বাসী, কিন্তু সেরকম কিছু ঘটলে আমি ন্যায়ের আগে মাকেই রক্ষা করব…"। এই উদ্ধৃতি আসলে তৎকালীন আলজিরিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা ও ক্যামুর অশান্ত মানসিকতার ছবিকেই ফুটিয়ে তুলেছে। আলজিরিয়ার বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে ক্যামুর এক মানসিক সংকটের সৃষ্টি করেছিল। ফ্রান্স ও আলজিরিয়ার সম্পর্ক নিয়েও তিনি ছিলেন বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত। ধীরে ধীরে শেষ পর্যায়ে দেখা গেল ক্যামুর 'ন্যায়ের আলজিরিয়া' ফরাসী উপনিবেশ ছাড়া কিছু নয়। বোধ করি সেজন্যই সিমন দ্য বোভয়র ক্যামুর মৃত্যুর পর বলেছিলেন, "ন্যায়হীন ন্যায়বান ফ্রান্সের অপরাধে সায় দিয়ে আমার হৃদয় থেকে মুছে গেছেন," যদিও সার্ত্রের-এর সংগে বোভয়রও ক্যামুর মৃত্যুতে শোক করেছেন, স্মৃতি চারণ করেছেন।

ক্যামুর মতে, বিশ শতক হলো ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের যুগ, রাষ্ট্র-অপরাধের যুগ। মানুষ এই অবস্থাতেই অসংগত জগতে বাস করছে। ক্যামুর 'দ্য ফল্' উপন্যাসের মর্মকথা হলো, মানুষ যদিও ভণ্ড ও নিষ্ঠুর, যদিও নীতিশাস্ত্রে ও ধর্মশাস্ত্রে হত্যা না করার কথা বলা থাকা সত্ত্বেও মানুষ হত্যা করছে মানুষকে, রাষ্ট্র হত্যা করছে অপরাধীকে, সমাজ অনুমতি দিচ্ছে গণহত্যার, তবু মনুষ্য-পরিস্থিতি আমাদের নৈরাশ্যের উদাসীনতায় নিয়ে যায় না। অস্তিবাদী সাহিত্যিক ক্যামুর সাহিত্যবাণী হলো, যুক্তি বা বিশ্বাস কোনটাই অর্থহীন ও অসংগত মানবজীবনের ওপর আলোকপাত করতে পারে না, পারেনা জগৎ ও জীবনকে অর্থমণ্ডিত করতে। তবু, ক্যামুর মতে, নিরাশা নৈব নৈব চ। নিঃশেষে নৈরাশ্য ও দুঃখকষ্ট দমনের অক্লান্ত চেষ্টা করার মধ্যেই মনুষ্য জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত আছে। শিল্প-সংস্কৃতি প্রেমিক এবং সাহিত্যরসিক ক্যামুর জীবন-জিজ্ঞাসার পরিধি ছিল বৃহৎ—শিল্পী হিসেবে তিনি সব সময়ই ছিলেন মহৎ ও বৃহৎ কিছুর সন্ধানী। কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতিময় জীবনের আকস্মিক অবসান ঘটে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে—১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারীর এক মোটর দুর্ঘটনায়।

# সাহিত্যে অস্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা

॥ ১ ॥

যদি বলি সমস্ত রকম বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে, বা যা কিছু পূর্ব-সমর্থিত, মূর্ত, ঐক্যবোধে সার্থক তার সমূল ধ্বংসের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার নামে সংগ্রামের দীপ্ত রূপই ইংরিজিতে 'এক্‌জিস্টেন্‌সিয়েলিজম্' বোধ হয় ভুল হবে না। যে কোন সংগ্রাম ছোট হোক্, বড় হোক, কোন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার কারণে বা অন্য কোন বড় অস্তিত্বকে গঠন করার জন্যই ঘটে। অর্থাৎ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আসে সংগ্রাম। আর সংগ্রাম কথাটার সংগে অস্তিবাদ নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে। আমরা তিনটি শব্দ সামনে রাখি—বিচ্ছিন্নতা, ইংরিজি প্রতিশব্দে 'অ্যালিয়েনেসন,' সংগ্রাম অর্থাৎ 'স্ট্রাগল,' অস্তিত্ব, যার সাধারণ ইংরিজি প্রতিশব্দ 'এক্‌জিস্টেন্‌স্'।

মূল লক্ষ্য যেখানে এক্‌জিস্টেন্‌স্, সেখানে কিন্তু প্রদীপ জ্বালানোর আগে সল্‌তে পাকানোর মত এসে যায় বিচ্ছিন্নতা শব্দটা। আবার, অস্তিত্ব শব্দটা না থাকলে বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয় কি করে! স্বভাবতই লজিকের এই ধাঁধা এখন তফাতে থাক্। মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধতার মূল ভিত্তিতে আছে সংঘবদ্ধতা, ঐক্য-চেতনা। যা কিছু ঐক্যহীন, নিঃসঙ্গ, তা-ই মানুষকে বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায়। সমাজ থেকে সরে আসার নাম বিচ্ছিন্নতা, নিজের ঐতিহ্য-সম্মত ভাব-ভাবনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের মধ্যে নিঃসঙ্গ হওয়ার নাম আত্মসর্বস্বতার জালে জড়িয়ে যাওয়া, অহংমুখ হওয়া।

এমন আত্মমুখ হওয়ায়, এমন বিচ্ছিন্নতার বেদনাকে দুরূহভার, শ্বাসরোধকর, যন্ত্রণাদায়ক হতাশাব্যঞ্জক মনে হওয়ায় আমাদের দেশের এক বিশাল স্তম্ভের মত ব্যক্তিত্ব, যিনি বাস্তবিক অর্থেই 'দ্য গ্রেটেস্ট ম্যান অব দ্য নাইন্‌টিন্‌থ্ সেঞ্চুরী,' সেই বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন,—'কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা'। রেনেসাঁ-উচ্চকিত উনিশ শতকের মর্মবাণী ছিল—'মেন অ্যাণ্ড উইমেন আর বেটার দ্যান হিরোজ অ্যাণ্ড হিরোইন্‌স্' বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের দিকে তাকিয়েই একা না থাকার কথা বলেছিলেন। সেই সংগে তাঁর তীব্র অনুসন্ধিৎসা ছিল জন্ম ও জীবনের মূল প্রশ্নকে টান দিয়েই—'এ জীবন লইয়া কি করিতে হয়, কি করিব?' জীবনের সংগে মানুষের যোগ নিবিড়, যেহেতু জীবন একা চলতে পারে না, জানে না, তাই মানুষ তার একমাত্র আধার, সে নিজে আধেয়, এবং যেহেতু দু'য়ের চতুর্দিককে অবলম্বন করেই উভয়ের জয়যাত্রা, তাই জীবন ও মানুষ বিচ্ছিন্ন হলেই উভয়ের অস্তিত্বেই পড়ে টান, কোথায় যেন এক শূন্য হয়ে যায়—যার কথা বিশ শতকের কবি টি. এস. এলিয়টের কথায় পাই—'উই আর দ্য হলো মেন'। এমন কি এলিয়টের একথাটাও তখন সত্য হয়ে ওঠে—'এভরিওয়ান ইজ এলোন, আর ইট সিম্‌স্ টু মী'।

এমন অস্তিত্বের টানের ব্যাখ্যার আদিতম কথাটি হল, অস্তিত্বহীনতা সত্য হলে জীবন মূল্যহীন, মানুষ নিঃসঙ্গ। এমন সঙ্গহীনতার অন্য নাম বিচ্ছিন্নতা। অর জীবন মানুষ

জগত থেকে বিচ্ছিন্নতার নাম যদি সংস্কৃত দার্শনিকদের ব্যবহৃত 'নাস্তি' হয়, তবে জীবন জগতমুখিতা ও মানবপ্রেমের নাম হয় 'অস্তি'। বিচ্ছিন্নতা বিমূর্ত হতে পারে, অস্তিবাদ নিঃসন্দেহে মূর্ত বিষয়। মানুষ মানেই তার সমস্ত রকম ভাল-মন্দ নিয়ে, চাওয়া-পাওয়া, সংকট, হতাশা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন ভাবনা, যন্ত্রণা, পছন্দ-অপছন্দ, ঘৃণা, পাপ, পাপ-হীনতা, সঙ্গহীনতা ও একাকিত্ববোধ নিয়ে এক 'টোটাল ম্যান'। এই টোটাল ম্যান-ই অস্তিবাদী দার্শনিকদের লক্ষ্য। এর থেকে ক্রমিক বিচ্যুতি মানুষকে আস্তে আস্তে এক শূন্যের দিকে ঠেলতে থাকে। শূন্যের দিকে যাওয়া সম্পূর্ণ হলেই তার সামনে আসে ভয়াবহ মহাশূন্য—তা-ই বিচ্ছিন্নতার চরম রূপ। 'মহাশূন্য' কথাটির সংগে আমরা অসংগতি বা 'অ্যাবসারডিটি'-র সাদৃশ্য কল্পনা করতে পারি—যে অ্যাবসারডিটির কথা আলবের ক্যামু তাঁর 'দি মিথ্ অফ সিসিফাস' গ্রন্থে প্রথম প্রয়োগ করেন।

এক্ষেত্রে মানুষ যেমন অসহায় হয়, তেমনি জীবনও চলৎ-শক্তিহীন দুর্বল, স্থবির হয়ে পড়ে। এমন যে কাম্য নয়, তা বুঝেই ধার্মিকরা ধর্মের আধ্যাত্মিকতা এনে, সমাজ-তত্ত্ববিদ ও দার্শনিকরা যেমন যুক্তিতর্কের জাল ফেলে স্থির স্ব স্ব সিদ্ধান্তে এসে জীবন-বাদিতায় জাল গুটিয়ে নেন, তেমনি চিত্রশিল্পী, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্য-কাররাও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে তাঁদের লেখনীকে সবল করেন। এঁরা হলেন সৃষ্টিধর্মী মনের অধিকারী। এঁদের রচনা সেই বাল্মীকি কথিত 'কিমিদং' শব্দ-উচ্চারণের এক সবল আবেগমথিত স্বাদু বিস্ময়। এঁদের তৃতীয় নয়নে জীবন-জগত-মানুষ এক বিশেষ রূপ পায়। তাতেই যেভাবে সাহিত্যে জীবন ও মানুষ উঠে আসে, তা কাল্পনিক হলেও স্ব-কাল ও স্ব-সমাজনির্ভর গভীরভাবে, এবং অস্তিত্বের সংকট মোচনে তাঁরা তাড়িত হন, অস্থির হন, ভয়ংকর রকমভাবে বিপর্যস্ত হন।

এই সর্বাবয়ব বিপর্যস্ততাই সাহিত্যে অস্তিবাদের স্বীকৃতির ও স্বরূপ নির্ণয়ের পথ চিহ্নিত করে ধীরে ধীরে। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পে অস্তিবাদকে স্বাগত জানাতে গিয়ে কেউ হয়েছেন নৈরাশ্যবাদী, কেউবা অস্তিবাদের জীবননিষ্ঠিত রচনায় তৎপর। অস্তিবাদ সাহিত্যে প্রয়োগ করতে গিয়ে, বা কথাটা ঘুরিয়ে বলি, কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র-কথাকারদের ক্ষেত্রে, ইমেজ, বক্তব্য—কবিদের ক্ষেত্রে—এসব মাধ্যম করে এঁরা সাহিত্যে অস্তিবাদের মূল্যায়নে একাধিক বিপরীত শব্দকে বাছতে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। অ্যাব্সার-ডিটি, নৈর্ব্যক্তিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানব-বিচ্ছিন্নতা—এসব এমনিতেই মনে ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে 'কমিউনিকেশান' শব্দটিও। জীবন ও মানুষের সংগে—প্রত্যক্ষভাবে বা অপ্রত্যক্ষভাবেই হোক—যোগাযোগ করতে গিয়ে যে সমস্যা আসে—তা ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্তর অতিক্রম করে আসে ইম্পার্সোন্যালিটি'র স্তরে। সেই নৈর্ব্যক্তিকতা।

উদাহরণ দেওয়া যাক। টি. ই. হিউম এমন নৈর্ব্যক্তিক কাব্য-বিষয় ও কবিমানসকে বলছেন 'শীতল' আর 'কঠিন', জর্জ টি. রাইট তো কবির সমস্ত রকম জাগতিক সম্পর্ক-রহিত কবি-ব্যক্তিত্বের মূল নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন ওয়ালেস স্টিভেন্সের কবিতা। সেখানে অনেক জায়গায় মানুষ নেই, থাকলেও উপেক্ষারই বস্তু। উপন্যাসের বিষয়েও দেখা গেছে পরিণামী হতাশা, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানোর মত মানসিকতার প্রকাশ।

সাহিত্যে এমন অস্তিবাদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা এদেশে-বিদেশে বহুকাল আগে

থেকেই শুরু হয়েছে। এক এক সময়ের সমাজ, মানুষ, পরিবেশ এক একভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সমস্যার সামনে আসে। অস্তিবাদ কড়া অথচ মৃদুস্বাদী তামাকের মত ধোঁয়ার বিস্তার করে সুস্বাদু অথচ রহস্যময় করেছে সাহিত্য-ভাবনাকে। বিচ্ছিন্নতায় যে শূন্যতা, তা অনেকটা প্রাণায়ামের মত—সেই মুহূর্ত যখন সমস্ত জাগতিক জ্ঞান লুপ্ত, মানুষ বুঝি 'মৃতের মত', কিন্তু মৃত নয়। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ সত্য নয়, অস্তিত্বেই তার স্থিতি।

বিশ শতকেই দুটি বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে। এক একটি যুদ্ধ শুধু বিরাট জীবন-হানি ঘটিয়ে নিরস্ত হয় নি, প্রত্যেকটি মানুষের মনে ও সমাজে অস্তিত্বের মাটিকে করেছে আলগা নড়বড়ে, সংকটকে করেছে রক্তচক্ষু ও আত্মিক. জীবনকে করেছে তীব্র অস্থির ও উৎকেন্দ্রিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যার সূচনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার প্রসার। বিশ শতককে বিজ্ঞানের এক রেনেসাঁর কাল বললে অত্যুক্তি হবে না। আর এমন বিজ্ঞানের সর্বব্যাপক অসম্ভব ক্ষমতায়—অনেকটা অলৌকিক শক্তির মত প্রয়োগে মানুষ হচ্ছে অবহেলিত, তাই মানুষের হতাশা, উদ্দেশ্যহীনতা. বাসনাহীনতা, বিরক্তি, অবসাদ. অসুস্থতা স্পষ্ট। এই বাসনাহীনতা ব্যক্তিক হয়ে কবিদের বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিকতা আনে, সমষ্টিগত হয়ে কথাকারদের ভাবায়।

এখান থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি, বিশ শতকের বিজ্ঞান ও যুদ্ধ বিচ্ছিন্নতাকে মাথা চাড়া দেবার সুযোগ করে দিচ্ছে। সমাজনীতি, ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ যেখানে মূলেই ঘা খাচ্ছে, সেখানে অস্তিত্বের সংকট তীব্র হতে বাধ্য। অস্তিবাদের মূল কথা হল, মানুষের স্বাধীনতাবোধ, স্বাধীনতাজ্ঞান ও স্বাধীন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার গভীর গোপন এবং একমাত্র বাসনা। সাহিত্য এই স্বাধীনতার কথা বলে, তার বিষয়, কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা, উপসংহার—এসবের মাধ্যমে। 'হোয়াট ইজ্ লিটারেচার'? —এমন শীর্ষক বিষয় নিয়ে আলোচনায় সার্ত্র্ বলছেন, 'শিল্পকর্ম মানেই মানব সমাজের স্বাধীনতায় আস্থা ঘোষণা'। মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথায় সোচ্চার হন সাহিত্যিকরা, সেই সংগে নিজেদের সচেতন রাখেন নিজেদের ও সময়বিশেষে স্বাধীন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়ে। হিটলারের আমলের লেখকদের নিজেদের অস্তিত্বের সংকটের কথা ভেবে 'হোয়াট ইজ লিটারেচার'-এ সার্ত্র্ বলেছেন, 'আমি এমন লেখকদের দেখেছি, যাঁরা যুদ্ধের আগে মনে প্রাণে ফ্যাসিবাদকেই চেয়েছেন, অথচ নাৎসিরা যখন তাদের ওপর সম্মান ঢেলে দিয়েছেন, তখন তাঁরা বন্ধ্যাতায় নিমজ্জিত হয়েছেন'।*

যাঁরা সাহিত্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরেও অস্তিবাদকে স্বাগত জানাতে চান তাঁরা ইতিহাসের ধারায় নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার যন্ত্রণাও ভোগ করেছেন কোন না কোন সময়ে। অস্তিবাদী সাহিত্য তাই যেমন সমকালের সমাজ, জীবন, মানুষ-এর ইতির দিকটা তুলে ধরে, মানুষকে জীবনের প্রতি জীবন্ত হতে শেখায়, তেমনি তার রচয়িতাকেও বুঝিয়ে দেয়। সার্ত্র্, ক্যামু্র সাহিত্য এবং সাহিত্যে অস্তিবাদের প্রথম প্রবক্তা ফিয়োদোর দস্তয়ভ্স্কির রচনাও তার প্রমাণ দেয়।

দার্শনিক ব্যাখ্যায় অস্তিবাদের প্রথম স্বীকৃত পুরুষ কিয়েকেগার্দ, এবং সেই অস্তি-বাদকে সৃজনশীল সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যে অভিভাবকত্ব দানের ক্ষেত্রে প্রথম উজ্জ্বল পুরুষ

---

*অনুবাদ: অজিষ্ণু ভট্টাচার্য, 'পরিচয়' পত্রিকা।

ফিওদোর মিখাইলোভিচ দস্তয়ভ্স্কি—যদিও তাঁর সামান্য আগে এবং তাঁর প্রায় সমকালে দেখি তলস্তয় ও তুর্গেনিভের সাহিত্যে বিষয়বস্তুর আধারে অস্তিবাদকে প্রকাশ করতে। দস্তয়ভ্স্কি রাশিয়ার জারের শাসনকালের যুবক পুরুষ। এমন দস্তয়ভ্স্কি দিয়ে বিশ্ব সাহিত্যে অস্তিবাদের প্রয়োগের আলোচনা শুরু করলে স্বভাবতই উত্তর কালের পৃথিবীর পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিচয় মনে রাখতে হয়।

আগেই বলেছি, বিশ শতকের দুটি দুরন্ত গতিশীল জ্বলন্ত অগ্নি গোলকের মত যুদ্ধের কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ সুদূর ইউরোপেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার কালো হাত বাড়ায় প্রাচ্য ভূখণ্ডে। আমরা যারা ভারতীয়, তারাও যুদ্ধের ভয় ও শব্দ, প্রসার ও প্রেত থেকে নিজেদের লুকোবার জন্যে জানলা-দরজা আপ্রাণ বন্ধ করার চেষ্টা করলেও যুদ্ধ আমাদের উঠোনে এসে সদম্ভে দাপায়, কাঁপিয়ে দেয় মাটি, জানলা-দরজা ভেঙে আমাদের শ্বাস বন্ধ করে দেয় যুদ্ধের বিষাক্ত ধোঁয়ায়। মাত্র ছয় বছরের যুদ্ধ আমাদের রক্তচক্ষু দেখায়, যুদ্ধের শেষে আমরা ক্লান্ত বিধ্বস্ত নানা দিক থেকে, কিন্তু আমাদের সমাজ-মাটি, আমাদের জীবন, আমাদের ব্যক্তি-আত্মা গভীর সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

এতেই আমরা হই বিচ্ছিন্ন. আত্মকেন্দ্রিক। যে স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও ছিলাম গোষ্ঠীবদ্ধ, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যাবস্থার আশ্রয়ে ও বিশ্বাসে পরস্পর যুযুধান দুই ভ্রাতৃরাষ্ট্রের সংঘর্ষ-সংঘাত সেই গোষ্ঠীবদ্ধতার মূলে ঘা মেরে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমরা সর্বদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, যেতে থাকি। দস্তয়ভ্স্কির সময় থেকে আমরা অনেক সরে এসেছি। রাশিয়ায় এসেছে জারের শাসন-শেষের সুগঠিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপক প্রেরণা ও প্রত্যয়। জার শাসন ও শাসনের অবসান, দুই ধনতান্ত্রিক শিবিরের মদমত্ত পারস্পরিক যুদ্ধ, আমাদের বুকে যুদ্ধবাজদের ভয়াল তাণ্ডবনৃত্য—এসবই একে একে সম-সময়ের সাহিত্যে অস্তিবাদকে নানান ডাই-মেন্শানে ধরার সুযোগ ঘটায়।

আমি পৃথিবীর সাহিত্যে অস্তিবাদের প্রয়োগের কিছু সূক্ষ্ম সূত্রই ধরতে চাই। তার মৌল আবেগটি ছিল সামন্ততান্ত্রিকতা থেকে ধনতান্ত্রিকতা হয়ে সমাজতান্ত্রিকতাকে চকিত বিস্ময়ে অবলোকন করে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী পরাধীন রাষ্ট্রকাঠামোয় লালিত লেখকদের চিন্তাচেতনায় নতুন করে জন্ম নেওয়ার মধ্যে নিহিত। তলস্তয়, তুর্গেনিভ, দস্তয়ভ্স্কি, কবি বোদলেয়ার উনিশ শতকের মানুষ, বিশ শতকের কথাকার সার্ত্র্, ক্যামু, কাফ্কা, কক্তো, কাব্যে এলিয়ট, ওয়ালেস স্টিভেন্স্, অ্যাংলো স্যাক্সন কবি ইয়েট্স্ পাউণ্ড, অডেন, ডিলান টমাস, চিত্রশিল্পী পিকাসো, এবং একালের বহু বিদেশী নাট্যকার সাহিত্যে ও শিল্পে অস্তিবাদের প্রয়োগকে তাঁদের রচনার 'ক্রিয়েটিভ পার্সোনেলিটি' দিয়ে দীপিত করেছেন। আমাদের দেশের দুই বিশ্বযুদ্ধ-প্রভাবিত কালের লেখকদের স্মরণ করে একেবারে হাল আমলের কিছু আগে পরে আবির্ভূত বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, বিমল কর, মতি নন্দী, দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখের লেখাতেও দেখা যাবে অস্তিত্বের সংকট, অস্তিত্ব রক্ষার সংকট ও সংগ্রাম, বিচ্ছিন্নতা বোধকে সরিয়ে অস্তিত্ব জয়ের উল্লাস, আবার বিচ্ছিন্নতার সমূহ বেদনা ও বিদীর্ণতাও।

॥ ২ ॥

নিশ্চয়ই সারা পৃথিবীতে সাহিত্যে অস্তিবাদের প্রথম সার্থক প্রবক্তা দস্তয়ভ্স্কি। আজ তা প্রমাণিত। কিন্তু তাঁর সেকালের সাহিত্য-পাঠকদের একাধিক সমালোচকদের তীব্রতম প্রতিক্রিয়া ছিল তাঁর বিরুদ্ধতার। হাস্যকরভাবে সেকালের এক সমালোচক শয়তান-দুর্লভ এক গভীরতম অন্তর্দৃষ্টির কথা বলে তিনি বিচার করেছেন তাঁর সুকৌশলে মানুষের পাপ ও যত রকম হীনতম প্রবৃত্তিকে বাইরে টেনে আনার ক্ষমতাকে এবং বলেছেন 'আন এ্যাব্জর্বিংলি ইণ্টারেস্টিং নভেলিস্ট অফ্ অ্যাডভেঞ্চার'—যে কথাটা একমাত্র আলেকজাণ্ডার ডুমার সঙ্গে তুলনায় সুপ্রযুক্ত হয়। গোর্কির মত লেখক সন্দেহ সংশয় নিয়ে রাইটার্স কংগ্রেসে বলেন, 'Dostoevsky has been called a seeker for truth. If he did seek it, he found it in the brutal animal instincts of men and he found it, not in order to fight it, but in order to justify and excuse it.'

পাঠক-সমালোচকদের বিচার ছিল একমুখীন। তাঁরা বার বার বলেন, দস্তয়ভ্স্কির উপন্যাসের চরিত্ররা আত্ম-নিয়ন্ত্রণশক্তিহীন, অস্থির-বুদ্ধি, দায়িত্বজ্ঞানহীন। সেখানে বন্যতা, হিংস্রতা, জীবনহীন বিভীষিকার দুঃস্বপ্ন, একটা নৈরাজ্যবাদী আবহাওয়ার কালো বিষাদ। J. Meier Graefe-এর ভাষায় 'Blood flows, not behind the scenes, but in the full blaze of the fortlight,' সেখানে তাই 'blood is of the very essence of the mystery, always an indispensable factor !' তাঁর উপন্যাসের অস্বাভাবিক জটিলতার কথা বলতে গিয়ে সমালোচকের এমন মন্তব্য। আর এত সব প্রশ্ন, ব্যাখ্যার উত্তরে, তাঁর উপন্যাসে কেন এত অন্ধকার--তার জবাবে, দস্তয়ভ্স্কির একটিমাত্র উত্তর—চারপাশে এত অন্ধকার আছে বলেই।

এখানেই অস্তিবাদী দস্তয়ভ্স্কির অভিযাত্রা—অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে নামার কারণ জীবনের কেন্দ্রস্থ শক্তি যে আলোর, যে অস্তির, তারই সম্যক সন্ধান করা। দস্তয়ভ্স্কির সময়টা ছিল চরমতম বিষাদের, অসম্ভব রুদ্ধশ্বাস নির্জন নৈরাজ্যবাদের, হতাশার। এটার মূল্যায়ন ছিল সঠিক দস্তয়ভ্স্কির উপন্যাসে। তাই মানুষের মনের আলো-অন্ধকারের অনুসন্ধানে তাঁর জীবনাগ্রহকে—যা তাঁর দর্শন—তাকে টেনে এনেছেন এক বিরাট বিশাল মঙ্গলময় শক্তির উৎসে। আর এখানেই সমস্ত রূঢ় সমালোচকদের, বিরোধী, বিরক্ত, হতাশ, উন্নাসিক পাঠকদের অস্বীকার করে তাঁর অস্তিবাদী সাহিত্য-ভিত্তি শক্ত হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে আমরা তাঁর চারটি প্রধান গ্রন্থের উল্লেখ করি—'জাপিস্কি ইজ্ পদপোলিয়া' (নোটস্ ফ্রম দ্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড), প্রেস্তুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে' (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট) ইদিয়ত (দ্য ইডিয়ট) এবং 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি' (দ্য ব্রাদার কারামাজোভ)।

রুশীয় সমালোচক মেরেঝকভস্কি একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, দস্তয়ভ্স্কি কখনোই পালিয়ে যান নি 'from the fortunes and disease of the age. In all his struggles with us he is as we are'—এমন মন্তব্যের মূল প্রমাণ করে তাঁর সাহিত্য থেকে উঠে-আসা অস্তিবাদী দর্শনকে। মানুষেরই ভালবাসা, মানুষেরই

বেঁচে থাকার তীব্রতম বাসনা ও আর্তিকে সংগ্রামে রেখে প্রকাশ করায় এই অস্তিবাদের প্রবর্তনা।

'নোটস্ ফ্রম দ্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড' উপন্যাসে কাল্পনিক এক শ্রোতাকে সামনে বসিয়ে আলাপের ছলে জবানবন্দীতে দস্তয়ভ্স্কি দেখিয়েছেন মানুষের গভীর গহন মনের স্বপ্নকে স্পষ্ট করে ধরে তার স্বরূপ। এই উপন্যাসের নায়কের যে অনুসন্ধান-প্রয়াস তার মূলে বক্তব্য হল মানুষ মাত্রেই স্বপ্ন দেখে, আর স্বপ্ন যখন শেষ হয়ে যায় তখনি মনে হয়, স্বপ্নের কিছুটা যেন বাস্তব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত! উপন্যাসটি প্রমাণ করে, মানুষের ইচ্ছাবৃত্তিতে কোন কলঙ্ক নেই। তাঁর ঈশ্বরে যেমন বিশ্বাস নেই, তেমনি নেই মানুষের পাপেও। দুইখণ্ডে ভাগ করা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে আছে বিদ্রোহ ও সন্দেহ-সংশয়ে বিধ্বস্ত এক নায়কের 'সাইকোলজিক্যাল ফিলজফিক্যাল এন্ভায়রনমেণ্ট', দ্বিতীয় খণ্ডে নায়কের অস্তিত্ব রক্ষা ও ব্যাখ্যার যন্ত্রণা। অস্তিবাদী দার্শনিকের এই দৃষ্টিতে বসানো আছে সমকালীন অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্বচ্ছ আয়না।

অস্তিবাদী ডেনিস দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দ মারা যান ১৮৫৫-এ, দস্তয়ভ্স্কির 'নোটস্ ফ্রম দি আণ্ডারগ্রাউণ্ড' বেরোয় ১৮৬৮তে। কিয়ের্কেগার্দের কথা তাঁর স্বদেশের লোকেরাই তখন জানত না। দস্তয়ভ্স্কি তাঁর কথাও শোনেননি, কিছু পড়েনওনি। এমন কি নীৎসের নামও তাঁর কাছে ছিল একেবারে অজ্ঞাত। অথচ তিন দার্শনিকের ভাবনায় অদ্ভুত মিল এবং অপর দুজনের থেকে দস্তয়ভ্স্কির অস্তিবাদী ধ্যান-ধারণা কিয়ের্কেগার্দের ব্যক্তি থেকে ব্যাপ্ত হয়েছে বিশ্বে। দস্তয়ভ্স্কির এই উপন্যাসের নায়ক এক সময়ে এইভাবে কথাটা বলে, একদিন না একদিন চরমতম সুখী মানুষও সুখের মধ্যে বিরক্ত, ব্যতিব্যস্ত হয়ে অস্থিরতার মধ্যে পথে নামবে। মানুষের অস্তিত্বের গভীর বিচারণা, মূল্যায়ন প্রথম এই গ্রন্থে লেখক প্রকাশ করেন।

আমাদের এর পরের আলোচ্য গ্রন্থ 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'। মধ্যবিত্ত মানুষ সব সময়েই একটা না একটা বিকারগ্রস্ততায় ভোগে, অর্থের ভাবনা ও বেশি চাহিদা তাদের আরও বিকারগ্রস্ত করে। তারা এসব নিয়ন্ত্রিত যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, তা দিয়ে মূলত তাদের আত্মা তথা আত্মিক শক্তিরই ক্ষয় ঘটায়। আত্মার এমন ক্রম-ক্ষয়ের কাহিনীই 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' উপন্যাসের কেন্দ্রে উপস্থিত। এর নায়ক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র তরুণ রাস্কল্নিকভ্ অস্তিত্বের মৌলিক শর্ত নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এক জটিল কারণে এক বুড়ি সুদখোর মহিলাকে করে খুন, ঠিক সে সময়েই আসে তার বোন, তাকেও সে খুন করে প্রমাণ লোপ করার জন্য। বুড়ির সব টাকা-পয়সা, সোনাদানা নিয়ে পালিয়ে যায়, কোনো কাজে সেগুলো লাগাতে না পেরে এবং কাজে লাগানোর ইচ্ছে আদৌ না থাকায় সে গোপন জায়গায় মাটি চাপা দিয়ে রাখে। এমন খুনের প্রমাণ কারোর কাছে নেই। পুলিশী আইনও সেই প্রমাণে ধরতে পারছে না। এদিকে নিজের কাজের জন্যে রাস্কল্নিকভের আসছে মনের ওপর তীব্র চাপ। এমন অসহনীয় চাপ সহ্য করতে না পেরে শেষে সে নিজেই পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দেয়। বিচারে দীর্ঘ আট বছরের শাস্তিতে সাইবেরিয়ার জেলে সঙ্গী হয় সোনিয়া নামের একটি মেয়ে, যে তার মাতাল বাবার সংসার চালাতে বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে। রাস্কল্নিকভের তখন খুন করার অনুতাপ নয়, তার অনুশোচনা ছিল স্বীকারোক্তি দেওয়ার ব্যাপারে নিজের দুর্বলতার কাছে নিজের

সমর্থন থাকার। কঠিন অসুখে ভুগে রাসকলনিকভ্ যে নতুন জীবনে আসে, যে পবিত্র জীবন তার কাম্য হয়, তার মূলে সক্রিয় ছিল সোনিয়ার প্রেম ও প্রভাব। এখানেও সেই অস্তিবাদীর জীবন-অন্বেষা দস্তয়ভ্স্কির জীবনকে অস্তিত্বের সুস্থ মূল্যে যাচাই করার জন্যই বিপরীত অবস্থার সংগ্রামে ফেলে, কৃতকর্মের মধ্য দিয়ে চরম পাপের থেকে জীবনকে মুখ ফিরিয়ে স্থায়ী একজায়গায় নিয়ে গিয়ে আসার প্রয়াস।

'দ্য ইডিয়ট' উপন্যাসের নায়কের প্রাচীন রুশবংশের উত্তরপুরুষ প্রিন্স মিশ্কিনের প্রতীক্ষার মূলেও তেমনি অস্তিত্বের মূল্যায়নের দিক। এই উপন্যাসের মধ্যেই নায়ক এক সবল স্বপ্নকে সামনে রেখে যা চিন্তা করে তা হল,—'Something new, prophetic, that you were awaiting, has been told you in your dream'। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট-এর মত 'দ্য ইডিয়ট'-এর সমস্যাও সেই জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত মানুষেরই মানসিক সংকট। আগের উপন্যাসে এই সংকট রাসকলনিকভের ব্যক্তিক সমস্যা ও জাতীয় চারিত্র্য—দুই মিলে এক মনের গভীরতলের সংকট; পরের উপন্যাসে তার আধার হয়েছে সমষ্টি মানুষ। এমন সমষ্টি মানুষের কথা বলতেই লেখক সমস্ত চরিত্রকেই তার সৃষ্ট সংকটের শিকার করেছেন। মৃগীরোগী প্রিন্স মিশ্কিন সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আগেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির দখল নিতে চলে আসে স্বাস্থ্য-নিবাস থেকে। অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের শেষে নায়ক আবার অসুস্থ হয়েই ফিরে যায় স্বাস্থ্যনিবাসে—সুইজারল্যাণ্ডে। মন তার ভাল-মন্দ খোঁজার দ্বন্দ্বে, সত্তার অস্থিরতায় ক্ষত-বিক্ষত। মিশ্কিনের মত সত্যিকারের সৎনায়কের কথায় সেই সংগ্রাম—যা অস্তিবাদী দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

এমন অস্তিবাদী সাহিত্যের আর এক দৃষ্টান্ত 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ' গ্রন্থ। এ উপন্যাসেও দস্তয়ভ্স্কি এঁকেছেন তেমন সৎচরিত্র আচার্য এলডার জোসিমা ও আলিওশাকে। উপন্যাসে নায়ক দিমিত্রি কারামাজোভ এমনভাবে উপন্যাসের কাহিনীর একটা অংশে শেষ ঘটায়, যেখানে পাঠক এক অধ্যাত্মলোকের ধ্রুবতারার অনির্বাণ আলোয় জীবনের সত্য দেখে। সমস্ত সংগ্রাম শেষে এই তার উপলব্ধি। এসব অস্তিত্ব রক্ষার শেষ দলিল, জীবন মূল্যায়নের শেষতম চুক্তিপত্র। অস্তিবাদী দার্শনিক-সাহিত্যিক দস্তয়ভ্স্কির অস্তিবাদী বিশ্বাসের চমৎকার প্রতিচিত্রণ দেখি আলিওশাকে বলা জোসিমার এক মন্তব্যে। জোসিমা আলিওশাকে বোঝায়, মানুষের পাপ শুধু ব্যক্তিক নয়, সমষ্টিগত। সমষ্টির যে পাপ তার জন্যে ব্যক্তিও দায়ী। ঠিক একরকম অপরাধ স্থির থাকে সেই পাপের মূলে। আবার বিশ্বের সব মানুষের পাপে একজন পাপী হচ্ছে না, প্রত্যেকটি মানুষের পাপ তাদের প্রত্যেকের জন্যই, সকলের পাপ সকলের জন্যে। এমন সর্বব্যাপক পাপের স্বীকৃতি ও দহনে একজন মানুষ হয় খৃস্টান। আর যখনি মানুষ খৃস্টান হয়, তখন সেই খৃস্টীয় মানব অস্তিত্ব থেকে জন্ম নেয় মানুষে মানুষে ভালোবাসার, সমস্ত মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, প্রেম, প্রত্যয়, সুস্থ প্রতিশ্রুতি। এত কথা এবং এমনভাবে দস্তয়ভ্স্কির জোসিমা যখন বলে, তখন লেখক দস্তয়ভ্স্কির 'প্রফেসি' মেনে নিজেও একথা ঠিক এসবের মধ্যে আছে ব্রহ্মার নাভিমূল থেকে উঠে আসা সেই পদ্মের মত এক মহৎ মানবত্ব—যা মানুষকে সমস্ত বৈপরীত্য, বৈষম্যকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকার অস্তিত্বে মুখ ঢাকতে শেখায়।

আমরা সমস্ত মানুষই বাঁচতে চাই, সংগ্রাম-বিচ্ছিন্ন বাঁচা নয়, সংগ্রাম-নিক্ষিপ্ত জীবনের

অভ্যস্ততার মধ্য দিয়ে একটা স্থিত জায়গায় জীবনকে রেখে যেতে চাই। এটাই অস্তিত্ববাদী ধ্যান-ধারণার মূলে। দস্তয়ভস্কির চরিত্রগুলি এমন যাদের দেখতে। আমরা তাদের বিচিত্র জীবনাচরণের আয়নায় নিজেদের দেখতে শুরু করে দিই। এক সময়, শুধু মনে হয় না, শাশ্বতভাবেই সত্য হয়ে ওঠে, আমরা তাদের সঙ্গে গভীরভাবে অবিচ্ছিন্ন। সেখানে, মেরেঝকভস্কির কথায়—"The barrier line between fiction and reality seems to have disappeared. It is more than sympathy with the hero, it is absolute absorption into him."

ফিওদোর মিখাইলোভিচ্ দস্তভস্কির উপন্যাস ধরে আমরা একটু বিস্তৃত আলোচনা করে তাঁকে সাহিত্যে অস্তিবাদ প্রবর্তনার প্রথম সার্থক প্রবক্তা হিসেবে সম্মানিত আসনটুকু দিলাম। দস্তয়ভস্কি যুগ-সংকটে, সমাজ-প্রেক্ষায়, ব্যক্তিক জীবনের যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার অজস্র ছোটবড় স্মৃতির নুড়ি দিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন উত্তরকালের অস্তিবাদী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উপযোগী করে, তারই ধারায় উপন্যাসে একে একে এসেছেন সারা পৃথিবীর সাহিত্যে সার্তর, ক্যামু, কাফ্কা প্রমুখ।

দস্তয়ভস্কি উনিশ শতকের লেখক, এটা বিশ শতক। এই শতকে আমরা পেয়েছি অস্তিবাদী ফরাসী লেখক সার্ত্র্, ক্যামু—এঁদের। বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ, সমাজে ভাঙন শুরু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ, সেই ভাঙনের বিস্তার, বলা যায় পূর্ণতা। বিশ শতকের এমন দুটি যুদ্ধ আনে মানুষে-মানুষে. মানুষে-সমাজে বিচ্ছিন্নতা তথা এক গভীর গহন শূন্যতা। এমন শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতার বিপক্ষেই কথা তুললেন সার্তর, ক্যামু প্রমুখ। তাঁদের উপন্যাসে এলো বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতার বিপরীত অস্তিবাদিতা—অস্তিত্ব রক্ষার কথা। বিশ শতকের আর একটা দিক হল এস্ট্যাব্লিশমেন্টের বিরোধিতা। যা কিছু প্রতিষ্ঠিত, পুরনো, গতানুগতিক তার বিরুদ্ধে ব্যক্তির জেহাদ ঘোষণা। যা কিছু আর তৃপ্তি দেয় না,একঘেয়ে জীবনের ঘানিটানাকেই একমাত্র কর্ম বলে মনে করে বিরাট সচল সরব সংগ্রামী জীবনের পক্ষে তারই বিরোধিতা করা। অস্তিবাদ জীবনে আর এক সংকটের সম্মুখীন হয়। দস্তয়ভস্কির ছিল সমাজ, অর্থনীতি পরিপার্শ্বের থেকে ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, বিশ শতকে সার্ত্র্, ক্যামু প্রমুখ ব্যক্তির মগ্নচৈতন্যে ডুব দিয়ে তুলে আনলেন অস্তিবাদের আরও নতুন ব্যাখ্যা, জীবনকে মূল্যবান করার মত শিল্পরসদ।

সার্ত্র্-এর 'নসিয়া' ( Nausea ) উপন্যাসে নর্মান পোর্ট অফ বোভিলের অধিবাসী, মুখ্য চরিত্র বা নায়ক আতোয়াঁ রোক্যুতাঁর যে দিনলিপি, তার মধ্যে লেখকের অস্তিবাদী দর্শনের প্রত্যয়সিদ্ধ প্রয়োগ স্পষ্ট। এখানে আছে নায়কের জীবনের এক সংকট। সংকট নায়কের সচেতন আত্মহনন বাসনার মধ্যে থেকে উঠে আসে। নায়কের দেখা দেয় এক-ধরনের অসুস্থতা,—যা এক গভীর যন্ত্রণায় পরিণতি আনে নায়ক চরিত্রের। এই যন্ত্রণা এক ব্যক্তির অন্তর্জগতের উপলব্ধি। বোভিলে জাহাজে যাত্রাপথে বসে রোক্যুতাঁর উনিশ শতকের এক অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিত্ব ম. দ্য. রোলেবোঁর জীবনী-রচনা করতে চায়। এখানে এসে তার সংযোগ সম্ভব হয় অটোডিডাক্ট্ বলে বিখ্যাত এক ওগিয়ার পি-এর সঙ্গে। পরে আসে এক যৌন সম্পর্কসূত্রে এক নারীসঙ্গ। এইভাবে পরিপার্শ্বের বেষ্টনীতে নায়কের উপলব্ধি ঘটে, তার গবেষণার কাজ নিখুঁত কল্পনামাত্র। আর সে এক আকর্ষণীয় সচেতনার শিকারমাত্র—যেখানে মুহূর্তের স্বাধীনতা বা মুক্তির বদলে অ্যাবসার্ডের সমন্বয়েই নিখিল

বিশ্ব সত্য রূপ পায়, নায়কের সচেতনার বস্তুরূপ অন-অধিকারমাত্র থেকে যায়। কাফে মালিক মসিয়ে ফাসক্যেয়েল-এর মৃত্যু সম্পর্কে নায়কের কাল্পনিক বিশ্বাস ও সেইসব ভাবনায় নায়কের বিপদ সংক্রান্ত অনুভূতি, এক যুগল তরুণ-তরুণীর মৈথুনদৃশ্য কল্পনা, তরুণী লুসিয়েনের ধর্ষিতা হওয়া ও মৃত্যুবরণ—এসব ঘটনা দিয়ে সার্ত্রে রোকাঁতার যে নিঃসঙ্গ মূর্তি, নির্জনতায় ফিরে আসার চিত্র আঁকেন, তার মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট তীব্রতম। নায়কের কল্পনায় অন্যতম নারী চরিত্র অ্যানি-র অস্তিত্ব থেকে আরম্ভ করে যেসব ঘটনা-চরিত্র কাল্পনিক, অবাস্তব বলে মনে হয়েছে, সে সবই কিন্তু প্রকৃত অর্থেই বাস্তব। বিচ্ছিন্নতার কল্পনায়, বিহ্বলতায়, নির্জনতায় সার্ত্র্-এর নায়ক ব্যক্তির অস্তিত্বের যন্ত্রণা ও সংকটের একমাত্র আবিষ্কারক।

'দ্য এজ্ অব রীজন' উপন্যাসেও সার্ত্র্-এর অস্তিত্ববাদী ভাবনার সম্যক প্রতিবিম্বন। উপন্যাসের নায়ক ম্যাথু প্রণয়িনী মার্সেল ও তাদের সন্তানের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়, চায় গর্ভপাত। কিন্তু গর্ভপাত এক গতানুগতিক আচরণমাত্র ম্যাথুর কাছে, তা কোন নৈতিক বিচারের সীমায় বাঁধা নয়। অন্য চরিত্র আইভিচের সঙ্গে ম্যাথুর সম্পর্ক, বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন সমকামী এক বন্ধু দ্যানিয়েল মার্সেলের সঙ্গে ম্যাথুর সম্পর্ক, ক্রমশ আইভিচ ও মার্সেলের ম্যাথুকে প্রত্যাখ্যান—এসব থেকে ম্যাথু এক নিঃসঙ্গতার মধ্যে মুখ ঢাকে, ঢাকতে বাধ্য হয়। ম্যাথুর যে অস্তিত্বের সংকট, জাগতিক সুখ-দুঃখের প্রতি যে সমান উদাসীনতা, তার মূল্যায়ন নায়ক ম্যাথু তথা লেখক সার্ত্র্ এইভাবে করেছেন নায়কের সংলাপের মধ্য দিয়ে—'এইটাই আসল সত্যি, আমি এজ্ অব্ রীজন-এ পরম সিদ্ধির স্বাদ পেয়েছি।' এই অস্তিত্বের কথা সার্তর্ সাহিত্যে উজ্জ্বল করছেন এইভাবে।

সার্ত্র্-সমকালে আসেন ক্যামু। তাঁর 'দ্য প্লেগ', 'দ্য আউটসাইডার' ইত্যাদি গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই অস্তিত্বের, তার রক্ষার, তার সংকটের কথা বলেছেন। আলবের ক্যামু নিজে কখনই চান নি তাঁকে একজন 'এক্সিজস্টেন্সিয়েলিস্ট' সাহিত্যিক হিসেবে চিহ্নিত করতে, কিন্তু তাঁর 'দ্য প্লেগ' উপন্যাসে শহরে প্লেগের ঘটনার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে নায়কের যে অন্তর্জগতের উন্মোচন ঘটিয়েছেন, তা বৈপরীত্যে, বৈষম্যে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকেই প্রতীক প্রতিম ভাষা যোগায়। সমকালীন বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ফ্যাসিস্ত কায়দায় যুদ্ধবাজদের আক্রমণ ও আগ্রাসন, —এসব থেকে মানুষ ও ব্যক্তির বাঁচার যে সমস্য—'দ্য প্লেগ'-এ তা-ই স্পষ্ট। 'দ্য আউট-সাইডার' উপন্যাসের নায়ক ম্যরসল। সে এক অবিবাহিত মধ্যবিত্ত কেরানিমাত্র। একাই ছোট বাড়ীতে পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে নিজের হাতেই রান্নাবান্না করে দিন কাটায়। তাঁর এক পরিচিত মহিলা আছে—তাঁর সঙ্গে সাঁতার কেটে, সিনেমায় গিয়ে, গভীরভাবে মিশে সময় কাটে। বাইরে তার একেবারে সাদামাটা জীবন, ভিতরে তীব্র অনাসক্তি। এমনকি তার মায়ের মৃত্যুসংবাদ তাকে এতটুকুও বিচলিত করে না। ম্যরসুনকে নায়ক করে ক্যামু জীবনের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা-সূত্র ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। 'দ্য আউট-সাইডার'-এর কেরানি নায়ককে দেখা যায় সমকালীন আলজিরিয় কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে সচল হতে। এ অভিজ্ঞতা ক্যামুর নিজস্ব। আসলে 'বহির্জগতের' ব্যাখ্যা ক্যামু রেখেছেন অস্তিত্ববাদীর দৃষ্টিতেই। তাঁর 'দ্য ফল' ( The Fall ) উপন্যাসে আছে সমাজ-মানুষে, মানুষে-মানুষে, রাষ্ট্র-মানুষে সম্পর্কের বিন্যাসে নৈরাশ্য থেকে আশার

ভূমিতে পা রাখার চেষ্টা। 'দ্য রেবেল' গ্রন্থে আছে রাজনীতির পটভূমিকায় মানুষে-মানুষে স্থায়ী সম্পর্ক চিত্রের উদ্বোধন প্রয়াস।

অস্তিত্ববাদী সাহিত্য আলোচনায় বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের অবদান কম নয় আদৌ। তাঁর 'ফর হুম দ্য বেল্ টোলস' উপন্যাসকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের যদি এক প্রান্তে রাখি, 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি' উপন্যাস অন্য মেরুতে সহজেই সরে যায়। প্রথম উপন্যাস যুদ্ধের ভয়াবহ প্রেক্ষিতে মানব অস্তিত্বের মূলকে দেখায়, দ্বিতীয় উপন্যাসে অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত, বলা যায় সর্বহারাদের জীবনের পটে বাঁচার আশায় জীবনের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার প্রয়াস। হেমিংওয়ের কাছে 'ফর হুম দ্য বেল্ টোল্‌স্'-এর নায়ক এক বিপরীত অবস্থার মধ্যে বাঁচার মত সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি'-এর সেই বুড়ো নায়কের নৌকা নিয়ে উত্তাল সমুদ্রের বুকে জীবনকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস বস্তুতে নিখুঁত অস্তিত্ববাদিতার নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি।

কাফ্‌কার উপন্যাসেও দেখি সেই অস্তিত্ববাদ—যা মানুষকে সমস্ত বিসদৃশ অবস্থা, বৈপরীত্য থেকে সরে আসতে শেখায়, তার জন্য সংগ্রাম করতে শেখায়। কাফ্‌কা কিয়েরকে-গার্দকে অস্বীকার করেন নি, করতে পারেন নি নীৎসে-কেও। কাফ্‌কা বুঝেছিলেন জগত ও জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের ফল কি, সেই সঙ্গে এসবের একমাত্র অধিকারী মানুষের অস্তিত্বের মূল্যও। তিনি উপন্যাসে বার বার বোঝাতে চেয়েছেন অস্তিত্বের বাহির আর ভিতর মিলেই পূর্ণতা. সংকট দেখা দিলে দুই-এই সমান টান পড়ে। তখন সেই টানকে সহনশীল করতে গেলে জীবন, জগৎ, মানুষ, ব্যক্তি সম্পর্কে স্থায়ী সমাধানে আসা দুরূহ হয়ে ওঠে। দ্য ট্রায়াল, দ্য ক্যাস্‌ল গ্রন্থ দুটি কাফ্‌কার অস্তিত্ববাদী ধ্যান ধারণার প্রধান পরিচায়ক। 'দ্য ট্রায়াল' গ্রন্থে যাকে আসামীর কাঠ গড়ায় আনা হয়, তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির 'অ্যামবিগুইটি' একে একে গভীর শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা রচনা করে। 'দ্য ক্যাস্‌ল' গ্রন্থেও আছে এমন মানুষের বুদ্ধি-সংকটজাত ফাঁকা, ফাঁপা অবস্থার প্রতিরূপ। 'দ্য ক্যাস্‌ল'-এর নায়কের নাম 'কে'। অর্থাৎ দস্তয়ভ্‌স্কির 'নোটস ফ্রম দ্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড'-এর নায়কের নামহীনতার মতই কাফ্‌কার এই নায়কও নামহীন। এই উপন্যাসে 'কে' যে দুর্গে ঢোকার অ্যাডভেঞ্চার করেছে তা মূলত দিব্য করুণার অনুসন্ধিৎসায় ও অন্বেষায় বেরিয়ে এক নিঃসঙ্গ আত্মার অ্যাডভেঞ্চার। ফ্রীডা চেয়েছিল 'কে'-কে ভীষণভাবে। এই ভীষণভাবে চাওয়ার মধ্যেই আছে কিয়েরকেগার্দ থেকে প্রবাহিত অস্তিত্ববাদী আন্দোলনের রহস্য। কাফ্‌কার ফ্রীডা নায়ক 'কে'-র মধ্যে যে ক্ষীণ আশার আলো জাগায়, তা আকস্মিক এবং যেখানে পৃথিবী ক্রমশ হয়ে যায় উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন, নিরুপায়, তার মধ্যে এই আলো অনেক বড় পরিবর্তন আনতে পারে জীবনের। জীবনকে নতুন আরও বড় ক্ষেত্রফলে ধরতে চায়। কিয়েরকেগার্দের সঙ্গে এই সাদৃশ্য, সাদৃশ্য দস্তয়ভ্‌স্কির সঙ্গে কাফ্‌কার। কাফ্‌কার নায়ক 'কে' নিযুক্ত হয় একদিন কেল্লার জমি-পরিদর্শক বলে, এবং সেই সূত্রে সে গ্রামে আসে। কিন্তু গ্রাম থেকে কেল্লার সঙ্গে যোগাযোগ অসম্ভব, কিন্তু 'কে' ক্লান্তিহীন। তার প্রয়াসে হতাশা আছে, কিন্তু হতাশা, ভেঙে-পড়া, সমস্ত তৎপরতার মধ্যে বিষণ্ণতা থাকলেও কাফ্‌কার অস্তিত্ববাদী জীবন-ভাবনা তার মধ্য থেকেই উঠে আসে। হতাশা থেকে যে শূন্যতা, বিষণ্ণতা তার সাযুজ্য দেখি মার্সেল প্রুস্তের লেখায়। 'কে'-র ইচ্ছে ছিল প্রাত্যহিক জীবন থেকে সরে গিয়ে কেল্লায় নিরাপদ নিস্তরঙ্গ

উদ্দেশ্যহীন জীবনে নিবিষ্ট থাকা, তাই সে একক প্রয়াসে বিশ্বাস না রেখে গ্রামের মধ্যে বিদেশী গ্রামবাসী হতে চেয়েছে। কিন্তু সেখানেও শূন্যতা। ফ্রীডাকে তার প্রণয়নী করার বাসনা মূলে ছিল। কেল্লার অন্যতম কর্মচারী ছিল তার চেনা। আসল কথা ফ্রীডা চায় সত্যে মোড়া প্রাত্যাহিক জীবন, তা যতই তুচ্ছ হোক, তাই সে হয় এক সহকারীর প্রণয়িনী, আর নায়ক 'কে'র অন্বেষণ নিরন্তর থেকে যায় চিরন্তনের জন্য। এইভাবে জীবনের অর্থ অন্বেষণে কাফ্‌কা হন কিয়ের্কেগার্দের উত্তরসূরী অস্তিবাদী লেখক।

'দ্য মেটামরফসিস' গল্পের নায়ক গ্রেগর সামজার অনিবার্য মৃত্যুবর্ণনা, 'দ্য-ট্রায়াল' উপন্যাসের নায়ক জোশেফ কে-এর বিচারচিত্র—সব কিছুর মধ্যে এক একটি ব্যক্তির দুঃস্বপ্ন, সম্পর্কে বিশ্বাসহীনতা, নিজেদের ভয়, অসুস্থতা, প্রাত্যাহিক জীবনের সমস্ত রকম এসটাব্লিশমেণ্টের বিরোধী হওয়ার ব্যাপার থেকে গেছে। পৃথিবী সম্পর্কে দস্তয়ভ্স্কির জীবনও এমন নারকীয় অস্তিত্বের চিত্রে ব্যঞ্জনা পেয়েছে। তবে সমস্ত রকম নির্মমতা, শূন্যতা অস্তিত্বের সংকট-চিন্তার মধ্যে দস্তয়ভ্স্কি জীবনমুখীন, অস্তিবাদী চিন্তার উপযোগী ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখার মত পরামর্শ দেন, কাফ্‌কা বলেন মূল্যহীন, অস্বাভাবিক পৃথিবীকে মেনে নেওয়ার কথা। কথাসাহিত্যে তাই অস্তিবাদী ভাবনার আর এক প্রয়োগ। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে একাধিক নায়ককে নানান দ্বিধা-দ্বন্দ্বে তাড়িত করেছেন। কাফ্‌কার নায়করা ক্রমশ 'ইনট্রোভার্ট' বা অন্তর্মুখী হয়েছে শূন্যতার, নির্জনতার, নিঃসঙ্গতার, বিষাদময়তা-বিপদময়তার কালো হাতের ছায়ায় এবং কাফ্‌কার উপন্যাসে সমস্ত রকম 'সিচুয়েশান' বা অবস্থা সৃষ্টির মূলেই কাজ করেছে মানুষ ও ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার এক বিশেষ প্রতিক্রিয়াজনিত ভাবনা, কাফ্‌কার উপন্যাসে অস্তিবাদী ধ্যান-ধারণা ব্যক্তির মগ্নচৈতন্য থেকেই উঠে এসেছে।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাসে অস্তিবাদের প্রয়োগ ও প্রকাশ নিয়ে আরও অনেক লেখকের নাম করা যায়। টমাসমান, নরম্যান মেলার, আমেরিকার জন স্টেইন-বেক প্রমুখদের এখনই মনে পড়ে। মানের 'ব্রাডেনব্রুক্স' 'ম্যাজিক মাউণ্টেন', 'ডেথ ইন ভেনিস', নরম্যান মেলারের 'দ্য নেকেড এণ্ড দ্য ডেড', 'বারবারা সোর', স্টেইনবেকের একাধিক রচনা—এসবের মধ্যে কোথাও যুদ্ধজনিত ভয়াবহতা, অসহায়তা, কোথাও রাজনীতির প্রয়োগের মধ্যেকার বি-সম আচরণ—এসব থেকেই সাহিত্যে অস্তি-ভাবনা মাথাচাড়া দিয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য কবিরা কবিতায় অস্তিবাদের ক্ষণিক উদ্ভাস ঘটিয়েছেন কখনো মূল বিষয় পরিকল্পনায়, কখনো একাধিক অভিনব 'ইমেজ' ব্যবহারে। কালচেতনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এসব সামগ্রিভাবে মিলে মিশে কবিতায় অস্তিবাদকে একাধিক ক্ষেত্রে প্রধান করেছে। ইংলণ্ডের 'ওয়ার পোয়েট' গোষ্ঠীর আওয়েন, স্যাসুন—এঁরা যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন মানুষের বাঁচার কথা, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য গভীর আর্ত যন্ত্রণার কথা। এলিয়ট যখন বিশ-শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে বসে লিখলেন 'উই আর দ্য হলো মেন' তখন ফাঁপা মানুষের কথা বলতে গিয়ে মূলত বলতে চেয়েছেন পূর্ণ মানুষ হওয়ার উপযোগী পরিবেশ অবস্থার অনুপস্থিতির কারণে তাঁর অস্বস্তির কথা, দুঃখের কথা। জীবনের অস্তিত্বে গভীর-নিবিড় আকর্ষণ না থাকলে এমন হতাশার কথা, বিচ্ছিন্নতার কথা,

শূন্যতার কথা তিনি বলেন কি করে ? প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বসে এলিয়ট তাঁর সময়কে বুঝেছিলেন, ধরতে পেরেছিলেন যুগের সংকটকে, মানুষের অবক্ষয়কে। কবিতায় অস্তিবাদ তাই এসেছে কবির গভীরতম সত্তার মূল থেকেই। মধ্যযুগে বসে কবি-নাট্যকার শেক্সপীয়র তাঁর নাটকে যেমন, একাধিক সনেটেও তেমনি মানুষের ও জীবনের অস্তিত্বের অন্বেষায় ছিলেন আমৃত্যু তৎপর।

কিয়েকেগার্দের পর আসেন হাইডেগার। দুজনেই অস্তিবাদী দার্শনিক। হাই-ডেগারের আগে আসেন অস্তিবাদী কবি হোল্ডারলিন। যে যুগে হোল্ডারলিনের আবির্ভাব সেই যুগের দর্পণ হল হোল্ডারলিনের কবিতা। আর এই যুগের প্রবাহেই হোল্ডারলিন তাঁর অস্তিবাদী কবি-প্রবণতায় দার্শনিক হাইডেগারকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন, এখানেই আলোচ্য অস্তিবাদী কবির অনন্যতা। আগেই বলেছি অস্তিবাদী লেখকরা এবং অস্তিবাদী দার্শনিকরাও 'অ্যালিয়েনেশন' থেকে তাঁদের অস্তিত্ব চিন্তার প্রতিক্রিয়া পান। বিচ্ছিন্ন হলেই মিলনের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বাড়ে। আর মিলনে অসম্ভাব্যতা সত্য হলেই শূন্যতা ঘিরে ধরে। অস্তিবাদ তখন নানাখানা হয়ে কবিদের হাতে রূপ পাওয়ার জন্য অস্থির হয়। হোল্ডারলিনের কবিতায় তেমন স্বীকৃতি। জীবনের মূল্য খুঁজতে গিয়ে, হতাশাকে সত্য জেনে, যুগের শাপে বিচ্ছিন্নতাকে স্পষ্টত সামনে দেখে, কবিমনের দোষ, ত্রুটি, পাপ্-ভাবনা, সমস্তরকম বিচ্যুতি-চিন্তা হোল্ডারলিনের কবিতায় অস্তিবাদী ধ্যান-ধারণাকে কারুণ্যমিশ্রিত করে তোলে। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে ঈশ্বরের অস্তিত্বহীন অস্তিত্বের কল্পনায় মনের ভাগ্যের নিঃসঙ্গতাজনিত যন্ত্রণা মিশিয়ে মানুষের অস্তিত্বের সার্থক মূল্যায়ন করেছেন কবি হোল্ডারলিন তাঁর 'ব্রেড এণ্ড ওয়াইন' নামের কবিতায়।

পাশ্চাত্য নাটকে অস্তিবাদ কখনো প্রত্যক্ষভাবে এসেছে অ্যালিয়েনেশনের সূত্রে, কখনো বা এ্যাবসার্ডিটির অবয়বে। ফরাসী নাট্যকার সার্ত্র্, ইউজিন, ইয়েনেস্কো, আইরিশ নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট, ইংরেজ নাট্যকার জন অসবোর্ন, হ্যারল্ড পিণ্টার, আর্নল্ড ওয়েসকার, আমেরিকান নাট্যকার ইউজিন ওনীল, টেনেসি উইলিয়েম্স্, আর্থার মিলার, এডওয়ার্ড ফ্র্যাঙ্কলিন অল্‌বি, জার্মানির ব্রেশ্‌ট প্রমুখের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে রচিত একাধিক নাটকে এর প্রমাণ মেলে। সার্ত্র্ তো নিশ্চয়ই, বাকি প্রায় সকলেই কম-বেশী যুদ্ধ-পরবর্তী ভেঙে-পড়া, হতাশ, অসহায় মানুষের জীবন যাপনের ও জীবন ধারণের বৈষম্যকে কেন্দ্রে রেখে বস্তুত অস্তিবাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিশ শতকের ফরাসী নাট্যকার, আধুনিক অস্তিবাদী দর্শনের অন্যতম ধারক ও বাহক, বলা ভাল, সচেতন অসাধারণ ক্ষমতাবান টীকাকার জঁ-পল সার্ত্র্ তাঁর নাটকে সচেতনভাবেই অস্তিবাদের ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে লেখা 'দ্য রেসপেক্‌টেবল্ প্রস্টিটিউট' গ্রন্থটির বক্তব্য মানুষের অস্তিত্ববোধের সম্যক উদ্‌বোধনের মূল্যায়নে উজ্জ্বল। এই নাটকে যা মৃত তা দিয়েই জীবনের মূল্যায়ন প্রয়াস দেখানো হয়েছে। মৃতদের তিনটি শ্রেণী এই নাটকে প্রতীক প্রতিম। একদল বাস্তবিকই মৃত, আর একদল জীবন্মৃত, তৃতীয় দল বর্তমান সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির শোষণে, নিপীড়নে মৃত। প্রথম শ্রেণীর প্রভাব আছে জীবিতদের বেঁচে থাকার মধ্যে ঐতিহ্যের সবল অনুসরণে, দ্বিতীয় শ্রেণী হল নাটকের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের মানুষগুলি,

তৃতীয় শ্রেণীতে আছে নিগ্রোরা—যারা স্বভাবে ও জীবনে স্বাভাবিক কিন্তু নিপীড়নে, শোষণে তারা নিজেদের একসময় অপরাধী ভাবে শ্বেতাঙ্গদের কাছে, বেশ্যা লিজির কাছে। নিগ্রো ও লিজি নাটকে অশুভ শক্তির মত হয়ে ওঠে। ফ্রেড নিগ্রোকে গুলি করে মারে, বেশ্যা লিজিকে ভোগ করে। লিজির পুরুষ-উত্তরাধিকার থেকে নিরন্তর মুক্তির বাসনা ও নিগ্রোর অসহায়তা এবং শর্তাধীন আত্মসমর্পণ, ফ্রেডের ঐতিহ্য বহনের নামে এদের মধ্যে নিজের অন্যায় অস্তিত্ব ঘোষণা—এসবই সার্ত্র্-এর মানুষের অস্তিত্ব বাঁচানোর জীবনের ইতিবাচক জীবনাচারণের দিককেই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য করে নাটকে।

ইউজিন ইয়োনেস্কোর 'দ্য লেশ্ন' ও 'আমোদি' বা 'হাউ টু গেট রিড ওফ ইট'—নাটক দু'টিতে স্পষ্টত অস্তিবাদের ঘোষণা। অবশ্যই তিনি নাটকে সমাজকে নিয়ে যতটা ভেবেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ভেবেছেন ব্যক্তিকে নিয়ে। ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্লোকের উন্মোচনেই তাঁর নাটকের শেষ কথা! সেখানে আশা নেই, আছে দুঃখ। কিন্তু আমরা জানি, ব্যক্তি কখনই সমাজ-বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তাই একজন ব্যক্তির কথা সমাজের কথা টেনে আনে, ব্যক্তির দুঃখ আলো হয়ে জ্বলে দুঃখ থেকে মুক্তির কথা শোনাবার জন্য। ইয়োনেস্কোর 'দ্য লেশন' নাটকে 'ক্যারিকেচার' ও 'ফ্যান্টাসি'-র মিশেল দিয়ে নাট্যকার যে ভয়ংকর উচ্ছল, তীব্র প্রাণশক্তিসম্পন্ন ছাত্রীকে এক প্রৌঢ় অধ্যাপকের কাছে তার পাঠ গ্রহণের জন্য নিয়ে এসে ভাষাতত্ত্ব, অংক, ভূগোল ইত্যাদি নানা বিষয় শিখিয়ে শেষে যান্ত্রিক পাঠ্যাভ্যাসের অর্থহীন অবস্থায় এনে প্রৌঢ় অধ্যাপকটিকে দিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণ করার ঘটনায় তার মৃত্যু ঘটায়, তাতে কৃত্রিম, প্রথাসর্বস্ব, শিক্ষা ব্যবস্থার শূন্যতাকেই তুলে ধরেন। প্রকৃত অর্থে ছাত্রীর মৃত্যু ঘটে না, অধ্যাপকটিও প্রত্যক্ষ অর্থে ধর্ষণ করেন নি, আসলে পড়াশুনার ব্যাপারটাই মানসিক, ধর্ষণটাও সেই গতানুগতিক পড়াশুনায় অধ্যাপকদের ভূমিকার প্রতীকী প্রতিবেদন। ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন সম্পর্ক-স্থাপনে শিক্ষাব্যবস্থায় যে সমাজ ও শিক্ষাবিদরা নাক উঁচু, প্রৌঢ় অধ্যাপকের ধর্ষণের ঘটনা তারও প্রতীকী প্রতিবাদ। অর্থাৎ সামাজিক মানুষের সুস্থ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার পক্ষেই ইয়োনেস্কোর ব্যক্তিচরিত্রকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বের এই নাটক! তাঁর 'আমোদি' নাটকেও দেখানো হয়েছে এক দম্পতির দাম্পত্য জীবনের ভয়ংকর এক শূন্যতার ছবি। স্বামী পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের আমোদি বুক্কিনিওনিও একজন লেখক, যে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে শেষ পর্যন্ত সারাজীবন ধরে দুটি বাক্যের বেশী লিখতেই পারে নি। তার স্ত্রী মেডেলেইনের বয়সও স্বামীর সমান সমান। একজন টেলিফোন অপারেটার—যে সারা দেশের লোকের সঙ্গে অন্য লোকের টেলিফোনে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়, অথচ নিজের পাশের লোকটির সঙ্গে বোঝাপড়ার কোন সূত্র ধরতে পারছে না। এভাবে চলে পনেরো বছরের বেঁচে থাকার জীবন। এর মধ্যে তারা আবিষ্কার করে, একটা মৃতদেহ কবে থেকে, কেমন করে যেন বেড়ে বেড়ে তাদের গোটা ফ্ল্যাটটাকেই অধিকার করে নেয়। শেষে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে মৃতদেহটি নদীর ধারে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় মড়ার সঙ্গে নিজেরাও শূন্যে হারিয়ে যায়। আসলে মৃত প্রেমটাই হল গতানুগতিক দাম্পত্য জীবনের থেকে বেরিয়ে আসা মৃতদেহ। প্রতিদিনের অভ্যাস জীবনকে শূন্যতার দিকে ঠেলে দেয়। এখানেও সেই অস্তিত্ব নিয়ে যন্ত্রণা, শূন্যতাবোধ বিরক্তি নাট্যকারের। 'দ্য কিলার' নাটকের নায়ক মসিয়ে বেরাঁজে-কেও দেখি নতুন ঝকঝকে চিরবসন্তের এক শহরে গিয়ে মুগ্ধ হবার পরেও এক সেই শহরে আসা হত্যাকারীকে হত্যা থেকে নিবৃত্ত

করতে গিয়ে শেষে নিজেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। ধনতান্ত্রিক সমাজের কৃত্রিম সুখ সম্ভোগ আনে শূন্যতা। বেরাঙ্গে তো তারই এক শিকার। এসট্যাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে নাট্যকারের এই বক্তব্য তো অস্তিত্ববাদকেই সমর্থন জানায়।

'দ্য ওয়েটিং ফর গোডো' ও 'এ্যাক্ট উইদাউট ওয়ার্ডস' আইরিশ নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেটের দুটি নাটকই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালের রচনা। এখানেও আছে ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গতা, শূন্যতার বেদনা। প্রথম নাটকটির নায়ক ঈশ্বর (গোডো)-এর অপেক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে যায়। বিষাদ নেমে আসে তার জীবনে। দ্বিতীয় নাটক অর্থাৎ 'এ্যাক্ট উইদাউট ওয়ার্ডস' নাটকেও আছে বাইরের জগৎ-বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তিক শূন্যতা, নিঃসঙ্গতাবোধ। প্রত্যহের জগৎ থেকে সরে এসে বেকেটের নায়করা যে নির্জন ঘরে নিজের সামনের আয়নায় নিজেকে দেখে সত্য উপলব্ধির জন্য অস্থির হয় তাতে নিশ্চিতভাবে নৈরাশ্যবাদ নেই, জীবনের নেতির দিক নেই, মানুষের ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাকে আত্মোপলব্ধির আলোয় সংযুক্ত হওয়ার কথা সত্য হয়। তা ইতিবাচক অস্তিত্ববাদের পরিপূরক।

বৃটিশ নাট্যকার জন অসবোর্ন, হ্যারল্ড পিন্টার ও আর্নল্ড ওয়েস্কার—এঁদের বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত একাধিক আধুনিক নাটকে 'এ্যাবসারডিটি'র মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব-বাদ-এর স্বীকৃতি লক্ষ্য করি। বিখ্যাত নাটক—যে নাটক ১৯৫৬ সালের ৮ই মে রয়াল কোর্ট থিয়েটারে প্রথম দীপ্ত অভিনয় দিয়ে শুরু এবং ইংরিজি নাটকের মোড় ঘোরানোর এক প্রথম 'মাইল স্টোন' হয়ে যায়, সেই 'লুক ব্যাক ইন এ্যাঙ্গার' নামের অসবোর্নের নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের ক্রুদ্ধ যুবকদের হতাশা, বেদনা, ব্যথা, অসহায়তা মেশানো সংকটসুলভ যন্ত্রণা নায়ক জিমি পোর্টারের আত্মার আয়নায় দেখার মত করে দেখি। যদিও সেখানে কোন বদলের কথা নেই, তবু সমস্ত বৈপরীত্যের উপস্থাপনে জীবনের অস্তিত্বের টানই লক্ষ্য করি। জিমি পোর্টারের যে সমকালীন যুবমানসের প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষোভ তা চিরকালের বদ্ধ গলির মত। তবু কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি ঘটায় এই নায়ক। এই নাটক রচনার সময়কার একাধিক উপন্যাস—আইরিশ মার্ডকের 'আণ্ডার দ্য নেট', কলিন উইলসনের 'আউটসাইডার', জন ওয়েইন-এর 'হারি অন ডাউন,' কিংসলে এ্যামিস-এর 'লাকি জিম' ইত্যাদিতে যে জীবনের অস্তিত্ব-মূল্যায়নে প্রবলতম বিক্ষোভের ছবি, তারই আর এক আধার —নাটকে 'জিমি পোর্টার'-এর মত নায়ক। আর একভাবে নাটকে আসে অস্তিত্ববাদ। হ্যারল্ড পিন্টারও হতাশাগ্রস্ত জীবনের কথা বলতে গিয়ে মানুষের বিচ্ছিন্নতার ছবি এঁকেছেন তাঁর 'দ্য রুম', 'দ্য বার্থডে পার্টি', 'দ্য কেয়ারটেকার' ইত্যাদি একাধিক নাটকে। 'দ্য কেয়ার-টেকার'-এর নায়ক ডেভিসের যে অসহায় আশ্রয়হীনতা, তার মূলে তারই সমূহ ভ্রান্তি, 'দ্য বার্থ ডে পার্টি''র নায়ক স্ট্যানলিকে নাটকের শেষে দেখা যায়। কোন্ এক অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে সে লেডেমবার্গ ও ম্যাকবান নামের দুজনের কাছে শত্রু হয়ে ওঠায় তারা ওকে নিয়ে যায় অজ্ঞাত স্থানে সম্ভবত হত্যার জন্যই। স্ট্যানলির বাধা দেওয়ার মত সমস্ত ইচ্ছাশক্তি সমূলে বিলুপ্ত। অপেক্ষমান গাড়িতে তোলার সময় তার বোর্ডিং-এর মালিক পেটেই এমন মানবতা বিধ্বংসী আচরণের প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও অক্ষম। এই অক্ষমতা পেটেইকে মর্মান্তিক অন্তর্যন্ত্রণার জগতে এনে তাকে দগ্ধ করতে থাকে। পিন্টার বলেছেন, এই অন্যের অসহায়তার মধ্যে মানবিক সম্পর্কের কারণে তাকে সহায়সম্পন্ন করার বাসনায় মানুষের অক্ষমতা—এটার

মূল হল জীবনের মর্মমূলেই আছে গভীরতম বেদনাবোধ যা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। এই চিন্তা কিন্তু জীবনকে জীইয়ে রাখার সুস্থ আর্তির আর এক নাম। আর এক ইংরেজ নাট্যকার আর্নল্ড ওয়েস্কার। ইনি সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তি নয়, সমাজ নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বকে নিয়েই বেশী চিন্তিত। তারই মূলে আছে জীবনের অস্তিত্বের মূল্যায়ন। একদিকে ধনতন্ত্র, তার নির্লজ্জ দাপট, আর একদিকে তার শাসনে শোষণে পর্যুদস্ত শ্রমিক মানুষ। এই নাটকের আঙ্গিকগত ত্রুটি যাই থাক, তার সমাজ-ভাবনা যতই দ্ব্যর্থবোধক (ambiguous) হোক, তবু নাটকে আছে সমষ্টি মানুষের বাঁচার তীব্রতম বাসনা। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে এঁর নায়করা, যেমন 'রুট্স্' নাটকের নায়ক স্টানম্যাক ইত্যাদি সমস্ত রকম হতাশা, অবসন্নতা, বিষাদ, আত্মক্ষয়ী স্বভাব, উৎসাহহীনতা নিয়েও মোহহীন হবার কথা ভাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল এক চরম অনিশ্চয়তার কাল, অনেক কিছু নৈতিক বিশ্বাস হারানোর কাল। এই কালের সমস্ত রকম ক্ষণস্থায়িত্ব ও অসঙ্গতিকে মেনেই ওয়েস্কার এঁকেছেন বাঁচার ছবি। তাঁর ট্রিলজির প্রথম নাটকের নাম 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি,' দ্বিতীয় 'রুট্স্'। অসুস্থ ও জরায় ভেঙে পড়া হ্যারিকান্, তার স্ত্রী কর্মিষ্ঠ অথচ পৃথিবীর গভীর অসুখ দেখে বিপর্যস্ত সারা, এদের ছেলে রনি, মিসেল বিটি ব্রায়াণ্ট ও মিস্টার ব্রায়াণ্ট, এডা, ডেভ —এদের সম্পর্ক-চিত্র এমনভাবে আঁকা—যার মধ্যে স্বপ্ন আছে, আছে স্বপ্নহীনতাও। সারা এক সময় তার ছেলে রনির মধ্যে আবেগ ঢেলে জীবনার্তির তীব্রতা ও জীবনের অস্তিত্বের মূল্যবোধ জাগাবার জন্যে, জীবনের হতাশা ও শূন্যতাকে উপেক্ষার জন্যে বার বার বলে— 'You've got to care, you've got to care or you'll die'-এমন সব সংলাপে নাট্যকার-চিন্তিত অস্তিবাদেরই উজ্জ্বল দ্যোতনা।

সাহিত্যে অস্তিবাদী ধ্যান-ধারণাকে রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণের মত গ্রহণ করার ব্যাপারে আমেরিকান নাট্যকারও পিছিয়ে নেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে। প্রথমেই স্মরণ করি ইউজিন ও'নীল-এর কথা। এঁর নাটক নিয়ে আবির্ভাব অবশ্যই বিশ শতকের শুরুতে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ঠিক সময়কালে রচিত 'দ্য আইসম্যান কামেথ' নাটকেও এই যুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশে রচিত 'দ্য লঙ ডেজ জার্নি ইনটু নাইট' নাটকেও তাঁর যে কেন্দ্রীয় কথা, তা আঙ্গিকের কৃত্রিম খোলস ; ছাড়ানো সত্যিকারের জীবন অস্তিত্বেরই কথা। দ্বিতীয় নাটকটিতে আছে নাট্যকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এবং তা ব্যক্তিক হলেও সমস্ত মানুষের হয়েছে একটিমাত্র কারণেই তা অস্তিবাদী জীবন গ্রহণের কথা বলে।

আমেরিকান নাট্যকার টেনেসি উইলিয়েম্স্ও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। তাঁর দ্য গ্লাস মেনেজারি'-র প্রধান তিনটি চরিত্র—বিধবা মা আমন্ডা, ছেলে টম, মেয়ে লরা -প্রত্যেকেই বাস্তবের আঘাত থেকে ডুব দেয় অতীতের জগতে, স্বপ্নের আশ্রয়ে। মা তার স্বামীর কথা ভাবে, ভাবে তার সতেরোজন সেই প্রেমপ্রার্থীর কথা, ওয়্যারহাউসের এক সাধারণ কর্মী ও কবি ছেলে টম জীবনের ব্যর্থতায় চলে যায় সিনেমার কল্পলোকের ভাবনায়, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র লরা—যে কিশোর কালেই ব্যর্থ প্রেমিকা ও পঙ্গু—সে পুতুল নিয়ে খেলার মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ করে। টমের পরিচিত ছেলেটি ওদের বাড়িতে মা আমন্ডার যে তার মেয়ে লরার সঙ্গে ঐ ছেলেটির সুস্থ ভাবী সম্পর্কের কথা ভেবে সুখী—তা থেকেও ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় একদিন। এদের মানসিকতার যে দোলাচল স্থিতি ও স্থিতিহীনতা তার মধ্যে থেকেই আসে সুস্থ জীবনের কথা। এমন জীবনের কথা আছে 'এ স্ট্রীটকার নেমড্

ভিজায়ার' নাটকেও। মুখ্য চরিত্র ব্লাঁশ দ্যুবয়ের বিয়ে হয় এক সমকামীর সঙ্গে—যে পরে তার অপরাধবোধে আত্মহনন বেছে নেয়। এই দ্যুবয় একে একে আধা বেশ্যাবৃত্তি, নতুন প্রেম, নিজের কলঙ্কিত অতীত ভোলার জন্যে ভদ্র হওয়া, ভদ্রবেশ পরা, শেষে বোনের স্বামী স্ট্যানলির বন্ধু মিচ-এর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্ট্যানলির দ্বারা ধর্ষণে নিযুক্ত হওয়া—এসবের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের স্তরে স্তরে প্রবলতম অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে, শেষে তার উন্মাদগ্রস্ততা আসে। এই নাটকে যে বাস্তবতা ও কল্পনা—দুয়ের জগতের দ্বন্দ্ব, মুখ্য চরিত্রের যাওয়া-আসা—তাতেও আছে পূর্ণ জীবনের বিশ্বাস।

আর্থার মিলার এমন এক আমেরিকান নাট্যকার—যাঁর নাটকে আছে নায়কের অনন্য সুখ অনুসন্ধানের নিরলস বাসনা। এই সুখ জীবনকে কেন্দ্রাতিগ করে না, কেন্দ্রানুগ করাকেই লক্ষ্যে রাখে। মিলারের 'আফটার দ্য ফল' নাটকে এক ভ্রষ্ট চরিত্র নায়কের পাপবোধ ও পাপমুক্তির অস্থিরতাই সত্য। মিলার বলতে চান মানুষের ট্রাজেডী তার নিজেরই স্বভাব-নিহিত, তা তার জন্মগত বিশিষ্টতা। জন্মের মূলে যে ভুল, তা-ই তার জীবনের নিয়ন্ত্রণী শক্তি। নাটকের নায়ক কোয়েন্টিন নায়িকা ম্যাগির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করতে গিয়ে বার বার নীচে নেমে যাওয়ার শংকায় কাঁপে। তার এমন সম্পর্ক রচনার প্রয়াস তো জন্মসূত্রেই পাওয়া, তার ভার বহন তার নিয়তি, কিন্তু সে তার বিরুদ্ধে যেতে চায়, চায় বড় বিশুদ্ধ, পরিশীলিত এক সুখ, যা জীবনকেই পরিশীলনে দীপ্ত করতে পারে। সেই অস্তিত্বের কল্পনায় ঘটে তার সচেতন দ্বিতীয় বিবাহ। মিলারের নায়কের এমন সুখ অন্বেষণ তো জীবন-অন্বেষণের নামান্তর মাত্র। আর এক আমেরিক্যান নাট্যকার এডওয়ার্ড ফ্র্যাঙ্কলিন অলবি-ও উনিশ শ' আটান্নয় প্রকাশিত 'দ্য জু স্টোরি' ইত্যাদি নাটকে যে সমস্যাকে নিয়েছেন, তা যুদ্ধোত্তর কালেই পায়ের তলার মাটিহীন জীবনযাপনের পক্ষে মাটি শক্ত করার কথা। মানুষে মানুষে সম্পর্কের শূন্যতা, যন্ত্রজীবনের মানবিক আবেগ শোষণ করার নির্মম চারিত্র্য, একালের মানুষে মানুষে বিবেকহীন বদ্ধ অবস্থা, জীবনের মানে খোঁজার পথে কেবল শূন্যতার হাহাকার, যুগোচিত সংশয়-সংকট, সমস্ত রকম অনিশ্চয়তা—এসবকে অলবি সত্য করেছেন তাঁর একাধিক নাটকের সমস্যায়, সমস্যার প্রতিচিত্রণে। এই যে নেতিবাচক জীবনের কথা, তা তো ইতিবাচক জীবনের নিশ্চিত আহ্বায়কই!

জার্মান নাট্যকার ব্রেশ্‌ট-এর কথা বলে আমরা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদের পরিচয় অনুসন্ধানের পথে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-পরিক্রমার প্রসঙ্গটির শেষ টানছি। নাটক নিয়ে পরীক্ষায় ব্রেশ্‌ট্ বিশ শতকের এক কঠিন স্তম্ভ, এক সুচিহ্নিত 'মাইলস্টোন'। কিন্তু ব্রেশ্‌টের নাটকের বিষয়ে আছে আগাগোড়া জীবনেরই কথা—যে জীবন সমস্ত রকম অসঙ্গতি, শূন্যতা, যন্ত্রণা নিয়ে যেমন উপস্থিত, তেমনি ধনতন্ত্রের শোষণ শাসন অত্যাচার একদিকে, সমবেত মানুষের নির্মল সরল জাগরণ অন্যদিকে—এই দু'য়ের কথায় উজ্জ্বল। উল্লেখনা করেই বলি, তাঁর প্রায় সব নাটকই জীবনের অস্তিত্বের মূলকেই সত্য করে. জীবনের বিচ্যুতির চিত্র তাই নানারঙে সেখানে সুন্দর চিত্রিত—সে রঙ যেমন কৌতুকের, তেমনি তীব্র তীক্ষ্ণ জীবন গঠনের উপযোগী শ্লেষ, ব্যঙ্গের। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অস্তিত্ববাদের ব্যাপক স্বীকৃতির ব্যাপারে ব্রেশ্‌টকে বলা যায় নীলকণ্ঠ।

॥ ৩ ॥

প্রথমেই স্পষ্ট করে বলে রাখি, বাংলা সাহিত্যে কোন কথাকার কবি-নাট্যকারই পাশ্চাত্য লেখকদের মত, সার্ত্র্, ক্যামু, কাফ্‌কা প্রমুখদের মত অস্তিবাদী লেখক হিসেবে চিহ্নিত হবার নয়, আদৌ চিহ্নিত করা সম্ভবও নয়, ঔচিত্যবোধে বাধে। অবশ্যই বাংলা সাহিত্যে অস্তিবাদের প্রয়োগ কখনো সচেতন ভাবে, কখনো বা লেখকদের অ-সচেতন ভাবনায় সম্ভব হয়েছে বিশ শতকের কালেই, একথা মানায় আমাদের কোন আপত্তি নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুদূর ইউরোপে হয়েছিল, ভারতে তথা বাংলাদেশে তার কোন প্রত্যক্ষ-চিহ্ন মেলে না। তবে সে সময়ে যেহেতু বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণে এক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, তাই শাসককুলের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অংশগ্রহণ বাধ্য হয়ে ওঠায় ভারত তথা বাংলাদেশও তার তাপ কমবেশী পেয়েছে।

আর এই সূত্রেই পাশ্চাত্ত্যভূমির সঙ্গে প্রাচ্যভূমির সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক আদান-প্রদান সহজ হয়, যেমন রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন ও যোগাযোগেও সেই ছবির পরিচয় মেলে। কল্লোলীয়দের যে আবির্ভাব, তার মূলেই ছিল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্তর যোগ। বিদেশ থেকে সে সময়ের আধুনিক গ্রন্থাদির এদেশে আগমন, একাধিক গ্রন্থের অনুদিত হওয়া, পঠন-পাঠনের ঘটনা ক্রমশ আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের বিদেশী চিন্তা-চেতনার, দর্শন-ভাবনার সঙ্গী করে তোলে।

এরই ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমুখ কথাকার, জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের রচনায় বিদেশী ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটে। পাশ্চাত্ত্য অস্তিবাদী দর্শনও গভীর কঠিন মাটি নিয়ে নেয় বাংলা সাহিত্যের ভূমিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের ঘটনা ঘটে একেবারে বাংলাদেশের দোর গড়ায়, অনেক সময় ঘরের মধ্যে তার প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ আমাদের বিপর্যস্ত করে। এই যুদ্ধ পাশ্চাত্ত্য সমকালীন সাহিত্য ভাবনা ও সাহিত্যিক সঙ্গকে, দর্শনকে একাত্ম করে তোলার উপযোগী হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ত্বরিত এই সব নতুন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ভাবনা ও দর্শন একাধিক অনুবাদের কারণে লেখক বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের রক্তের আত্মীয়তায় চিহ্নিত হয়ে ওঠে। আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের একাধিক কথাসাহিত্যিক, কবি, নাট্যকারকে নতুন পাশ্চাত্ত্যদেশীয় দর্শন ভাবনায় নিমগ্ন হতে দেখি সাহিত্য রচনার মাধ্যমে।

সে বিষয়ে সাহায্য করে এ দেশীয় যুদ্ধোত্তর অবস্থার অবক্ষয়িত পরিবেশ, অসুস্থতা, অসহায়তা, নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা ইত্যাদি। যে জীবন ছিল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরেও কিছুটা সমাজ ও আদর্শ কেন্দ্রিক, তা-ও সমূলে নষ্ট হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশে, তার প্রকাশ্য ফল মেলে ধীরে ধীরে যুদ্ধোত্তর কালে।

এমন পরিবেশেই এদেশের কথাকারদের রচনায় জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রচনার ভাবনা তীব্র হয়। যে জীবন স্বভাবের বৈপরীত্য নরম নরম মাটি সে সময়ের সমাজে, তারই দিকে তাকিয়ে জীবনকে, তার অস্তিত্বকে ধরার, বোঝার চেষ্টা করছেন কথাকাররা। বিচ্ছিন্নতা নয়, সুস্থ জীবন চাই, জীবনের স্বীকৃতি চাই, জীবনের অস্তিত্বের সব রকম মূল্যায়ন একান্ত কাম্য—এই ভাবনাটিকেই তাঁরা কথাসাহিত্যে রূপ দিতে সচেষ্ট থেকেছেন। আমরা একালের

বাংলা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদের প্রয়োগ, স্বরূপ ও অসচেতনভাবে প্রকাশের বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় নির্দিষ্ট কয়েকজন লেখকের কিছু উপন্যাস ছোটগল্পের বিস্তৃত আলোচনায় আসি।

বস্তুত দেশের মানুষ, তার জীবন, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, তার প্রেম যৌনতা—সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, তারই প্রতিরূপ ক্রমশ এক শূন্যতার বিবর রচনা করতে থাকে। বাংলা দেশের কথা সাহিত্যিকদের যাঁরা পাঁচের দশকের মধ্য সময়ের কিছু পরবর্তীকালে প্রথম এলেন কথাসাহিত্যে, তাঁরাও সেই শূন্যতার ছায়া-মেশানো নায়ক-নায়িকা নিয়ে তাদের সেই অস্তিত্বের সংকট ও সংকটত্রাণের ভাবনা নিয়ে কথাসাহিত্যের পসরা সাজান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী', 'পুতুলনাচের ইতিকথা,' 'পদ্মানদীর মাঝি' 'চতুষ্কোণ' 'ধরা বাঁধা জীবন' ইত্যাদি উপন্যাস ও একাধিক ছোটো গল্প, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর', 'নীলরাত্রি', ইত্যাদি উপন্যাসে এবং একাধিক ছোটগল্পে, বিমল করের 'ফানুসের আয়ু' উপন্যাসে 'সুধাময়'ও অশোক কানন ইত্যাদি ছোটগল্পে, বুদ্ধদেব বসুর 'শেষ পাণ্ডুলিপি' উপন্যাসে যেমন জীবন অস্তিত্বের সুস্থ-সবল অন্বেষণ, স্বরূপ, সংকট ও সংকট-ত্রাণের প্রতিরূপ দেখি, তেমন জীবন নিহিত, সমাজ-ব্যাপ্ত শূন্যতার ছায়াও দেখি চরিত্রের চলা ফেরায়, ভাবনায় ও সিদ্ধান্তে। সেই সময়ের নবাগত লেখক মতি নন্দীর 'নক্ষত্রের রাত', 'বেহুলার ভেলা' ইত্যাদি গল্প উপন্যাসে, দেবেশ রায়ের 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পেও সেই বিষয়-ভাবনার প্রাথমিক রূপের আভাস মেলে।

প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে কিশোর কবি সুকান্ত যেমন ছিলেন কমিটেড কমিউনিস্ট কবি, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের, কল্লোলের কালের, যুদ্ধ সমকালের এবং যুদ্ধোত্তর কালের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন সাম্যবাদী কথাকার। অবশ্যই যুদ্ধ-সমকালের শেষদিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন প্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু এই সদস্য হওয়ার কালে তাঁর লেখার মান উঠেছে, না নেমেছে—এ নিয়ে সমালোচকমহলে নানান তর্ক হতে পারে, তবু তিনি যে সাহিত্য-ভাবনায় মনেপ্রাণে বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক ছিলেন সমকালীন কথাকারদের থেকে, তা মানতে আপত্তি থাকে না। সাহিত্য-শিল্পভাবনায় বামপন্থী এই লেখক কিন্তু জীবনের সুস্থ সম্পর্কের, বলিষ্ঠ জীবন-আর্তিকেই বুঝতে সক্রিয় থেকেছেন তাঁর গল্পে-উপন্যাসে।

এই প্রসঙ্গেই আসে তাঁর সাহিত্যে একজন অস্তিত্ববাদী লেখকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে লেখা তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক শশী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যায় যে তীব্র সংকট দেখা দেয়, তারই গভীর মানসক্রিয়া থেকে জাত এক ব্যক্তি-মানুষ। তার অস্তিত্বের সংকটই উপন্যাসের বড় দিক। গাওদিয়া গ্রামের মানুষ দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। ওদের নিয়ে যে সমাজ-প্রেক্ষাপট এঁকেছেন লেখক, তা 'মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর মর সমাজ'। এই সময়ের লেখা সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট মনোভঙ্গিটি হল—'ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে।'

অর্থাৎ প্রথায় পরিণত, সংস্কারে সংকীর্ণ এতকালের স্বীকৃত মিথ্যা রূপকে সরিয়ে সত্যের সমাজ ও জীবনকে ধরার, বোঝার যে প্রয়াস শশীর, তার জীবনের অস্তিবাদী দিককেই সাদরে স্বীকৃতি দেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশী প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন, 'শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ'। আর যেখানে মানুষের অন্বেষণ, সেখানেই জীবনের ইতির দিক, বাঁচার দিক, চরম ও পরম সুস্থতার দিক।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেও সমস্ত রকম স্বার্থপরতা, দীনতা, রেষারেষি অতি-দারিদ্র্যের, নিপীড়নের মধ্যে থেকে পদ্মার তীরবর্তী অশিক্ষিত জেলে মাঝিরা যে জীবনের জন্য, বাঁচার জন্য, সংঘবদ্ধ সংগ্রাম করে, যেভাবে হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপের গোপন রহস্যময় স্বপ্ন তাদের কাছেও একসময় প্রকাশ্য অথচ কাঙ্খিত সত্য এবং বিশ্বাস নিয়ে আসে, তাতে সমস্ত বৈপরীত্য এক সুস্থ সবল জীবন-টানেই দীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির বুকে আপনাপন সীমিত ক্ষমতায় পদ্মানদীর মাঝিদের সংগ্রাম কস্তুত অস্তিত্বকে সবল, নির্বিশেষ জীবনধর্মে টিকিয়ে রাখারই সংগ্রাম।

আর এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অস্তিত্বের সংকট ও সংকট ত্রাণের ছবি এঁকেছেন 'জননী' উপন্যাসের নায়িকা শ্যামার সক্রিয়তার মধ্যে। শ্যামা নিজে মা, কিন্তু একাধিক সন্তানের মা হওয়ার আগের ও পরের জীবন যে কি কঠিন সংগ্রামের জীবন এক নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার জীবনের বাঙালীর পক্ষে, তা শ্যামাই বুঝিয়ে দেয়। খুন করার জন্য স্বামী শীতলের জেল হলে শ্যামা একা সেই ছেলে-মেয়ের সংসার চালায়। কিন্তু এমন সংসার-কর্ত্রীর ভূমিকায় শ্যামার জননী সত্তা বার বার ভাঙে, গড়ে, বার বার শূন্যতায়, নিঃসঙ্গতায়, অসহায়তায় থেমে যায়, আবার কোন এক আত্মিক বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত হয়ে ওঠে। শ্যামার পুত্র-কন্যা-সংসার—সমস্ত প্রত্যক্ষ চিন্তার ভিতরে থাকে একান্ত নিজস্ব কিছু ভাবনা—যেগুলি তাকে সহজ-সরল বিশ্বাসের জীবনের মাটি থেকে সরিয়ে দেয়:

'মেয়েকে কোলে করিয়া পুরানো বাড়ির ছাদে নূতন করে ঝকঝকে দেয়ালে ঠেস দিয়া শ্যামা বসিত, বুজিত চোখ। শ্যামার কি শ্রান্তি আসিয়াছে? আগের চেয়ে খাটুনি এখন কত কম, তাই সম্পন্ন করিতে সে কি অবসন্ন হইয়া পড়ে?·········

·· ·· ধানকলের চোঙাটার কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া উত্তরে উড়িয়া যায়, মধ্যাহ্নে যে মৃদু উষ্ণতা অনুভূত হয়, তাহা যেন যৌবনের স্মৃতি। শ্যামার কি কোনদিন যৌবন ছিল? কি করিয়া সে চারিটি সন্তানের জননী হইয়াছে, শ্যামার তো তা মনে নাই। আজ সে দারুণ বিপন্ন, স্বামী তার জেল খাটিতেছে, উপার্জনশীল পুরুষের আশ্রয় তাহার নাই, ভবিষ্যৎ তাহার অন্ধকার, শহরতলীতে বন-উপবনের বসন্ত আসিলেও জীবনে কবে তাহার যৌবন ছিল, তা কি শ্যামার মনে পড়া উচিত? কি অবান্তর তার বর্তমান জীবনে এই বিচিত্র চিন্তা। মুমূর্ষুর কাছে যে নামকীর্তন হয়, এ যেন তারই মধ্যে সুর তাল লয় মান খুঁজিয়া বেড়ানো।'

স্বামী-সঙ্গহীন, পুত্রকন্যার ভারে বিপর্যস্ত একা এক দরিদ্র জননীর মুমূর্ষু অবস্থায় যে চিন্তা-ভাবনা তা তাকে স্বাভাবিক জীবন-স্বভাবের বিপরীত তীরে এনে ফেলে দেয়। শ্যামার মাঝে মাঝেই জীবনে ও জীবনধারণে এবং জীবন-যাপনে আসে ঘৃণা, বীতশ্রদ্ধ

অভাব, ক্লান্তি, সমূহ বিষন্নতা, পত্রহীন কোন বড় বৃক্ষের নিঃসঙ্গতার মানসিক অভিশাপ। কেন্দ্রচ্যুত জীবনে আসত এক এক সময়ে উদ্‌ভ্রান্তি।

'উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তাও শ্যামা করিত, নিশ্বাসও ফেলিত। জননীত্ব কেমন যেন নীরস অর্থহীন মনে হইত শ্যামার কাছে। কোথায় ছিল এই চারিটি জীব, কি সম্পর্ক ওদের সঙ্গে তাহার; অসহায় স্ত্রীলোক সে, মেরুদণ্ড বাঁকানো এ ভার তার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে কেন? কিসের অন্ধ মায়া? জগজ্জননী মহামায়া কিসের ধাঁধার ফেলিয়া তাহাকে দিয়া এত দুঃখ বরণ করাইতেছেন? সুখ কাকে বলে একদিনের জন্য সে তাহা জানিতে পারিল না, তাহার একটা প্রাণ নিঙড়াইয়া চারটি প্রাণীকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, —কেন? কি লাভ তাহার? চোখ বুজিয়া সে যদি আজ কোথাও চলিয়া যাইতে পারিত! —ওরা দুঃখ পাইবে, না খাইয়া হয়তো মরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায় তার? সে তো দেখিতে আসিবে না। পেটের সন্তানগুলির প্রতি শ্যামা যেন বিদ্বেষ অনুভব করিত,– সব তাহার শত্রু, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ। কি দশা তাহার হইয়াছে ওদের জন্য।'

শ্যামার এমন চিন্তা-ভাবনায় কোথাও বুঝি শক্ত মাটির ভিতরে লেগে থাকা শিকড়ে টান পড়ে, মাটি থেকে আলগা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় শিকড়গুলি, যে কোন মুহূর্তে গাছ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে তার বহুদিনের আশ্রয় মাটি থেকে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের অস্তিবাদে গভীর বিশ্বাসী। তাই যথার্থ চরিত্র-ন্যায়ের মধ্য দিয়েই শ্যামার জীবন, অন্য বাস্তব সংসার পরিবেশ, পরস্পরের সম্পর্ক সূত্র—সব বদলাতে বদলাতে যেখানে শ্যামাকে নিয়ে এসে দাঁড় করায়, তা সেই বহুকাল বাহিত মানব্য-ভাবনার অধিগত এক জীবন—যা আচার-আচরণে, বিশ্বাসে-বিস্ময়ে, ব্যসনে-বুভুক্ষায় হয়ে ওঠে জীবনবেদ। এই জীবনবেদ অস্তিত্ব ভাবনার দলিলই। হৃদয়ে এর জন্ম, হৃদয়ের যুক্তিতেই এর সাধনা, এর সিদ্ধি।

যে ছেলের বউ সুবর্ণকে কেন্দ্র করে শ্যামার মানসিক সমস্যা, সমস্ত রকম শংকা, শংকাহীনতা, দুঃখ-কষ্ট, সেই সুবর্ণের মাতৃত্ব দিয়েই শ্যামার সামনে আসে নিজেকে নতুন করে, প্রত্যয়সিদ্ধ রূপে দেখার আয়না :

'পূজার পরেই আমায় আনবেন মা। সুবর্ণ সজল চোখে বলিয়া গেল।

শ্যামা শুধু বলিল,—আনব।

বিধানের বৌ! সে বাপের বাড়ি যাইতেছে। বুকে জড়াইয়া একটু তো শ্যামা কাঁদিতে পারিত? কিন্তু কি করিবে শ্যামা, যাওয়ার জন্য সুবর্ণ তখন সাজগোজ করিয়াছে, বৌয়ের চোখ ঝলসানো মূর্তির দিকে শ্যামা চাহিতে পারিতেছিল না, মনে হইতেছিল, যাক্, ও চলিয়া যাক, দু'দিন চোখ দুটা একটু জুড়াক শ্যামার।

পূজার সময় মন্দা আসিয়া কয়েকদিন রহিল। শীতলকে দেখিতে আসিয়াছে। মন্দার জন্য সুবর্ণকেও দুদিন আনিয়া রাখা হইল। সুবর্ণ ফিরিয়া গেলে, একদিন মন্দা বলিল. হ্যাঁ বৌ, একটা কথা বলি তোমায়, ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ বৌমার দিকে? আমার যেন সন্দেহ হ'ল বৌ।

শ্যামা চমকাইয়া উঠিল। তারপর হাসিয়া বলিল,—না, ঠাকুরঝি, ও তোমার চোখের ভুল।

মন্দার চোখের ভুলকে শ্যামা কিন্তু ভুলিতে পারিল না, দিবারাত্র মনে পড়িতে লাগিল, স্বর্ণকে মন্দার ইঙ্গিত। কি বলিয়া গেল মন্দা? সত্য হইলে শ্যামা কি অন্ধ, তাহার চোখে পড়িত না? শ্যামা বড় অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সংসারের কাজে বড় ভুল হইতে লাগিল শ্যামার। কি মন্ত্র মন্দা বলিয়া গিয়াছে, সুবর্ণকে দেখিবার জন্য শ্যামার মন ছটফট করে, সে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারে না। একদিন মণিকে সঙ্গে করিয়া সে চলিয়া গেল বাগবাজারে। মন্দার মন্ত্র কি শ্যামার চোখে অঞ্জনও পরাইয়া দিয়াছিল? কই, সুবর্ণর দিকে চাহিয়া এবার তো শ্যামার চোখ পীড়িত হইয়া উঠিল না?

শ্যামা বলিয়া আসিল, সামনের রবিবার দিন ভালো আছে, ওইদিন বিধান আসিয়া সুবর্ণকে লইয়া যাইবে। না, তাকে বলা মিছে, বৌকে সে আর বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না।

সুবর্ণের মাসি বলিল, এই তো সেদিন এল, এর মধ্যে এত তাড়া কেন? আরেকটা মাস থেকে যাক।

শ্যামা বলিল, না, বাছা না, তুমি বোঝ না,—যার ছেলের বৌ সে ছাড়া কারো বুঝবার কথা নয়—ঘর আমার আঁধার হয়ে আছে।

একে একে দিন গেল। ঋতু পরিবর্তন হইল জগতে। শীত আসিল, শীতল পরলোকে গেল, শ্যামা ধরিল বিধবার বেশ, তারপর শীতও আর রহিল না। সুবর্ণকে শ্যামা যেন বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটা দিনের পরীক্ষা করিতে লাগিল, কোথায় গেল ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, তুচ্ছ শত্রুতা। সুবর্ণের জীবন লইয়া শ্যামা যেন বাঁচিয়া রহিল; তারপর এক চৈত্র নিশায় এ বাড়ির যে ঘরে শ্যামা একদিন বিধানকে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে সুবর্ণ অচৈতন্য হইয়া গেল, ঘরে রহিল কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ, দেয়ালে রহিল শায়িত মানুষের ছায়া, জানালার অন্ধ একটু ফাঁক দিয়া আকাশের কয়েকটা তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।'

নতুন জীবনের যোগে জীবনযুদ্ধে নানাভাবে বিপর্যস্ত অথচ জীবনার্ত শ্যামার এই যে নতুন রূপ, এ তো অস্তিবাদী ভাবনার এক লেখকের অস্তিত্বের সফল মূল্যদানে প্রতীক-প্রতীম শিল্পরূপায়ণই!

সমাজ ও মানুষ, ব্যক্তি ও ব্যক্তি যখনি বিচ্ছিন্ন হ'তে থাকে, তখনি অস্তিবাদের চিন্তা-ভাবনা লেখক-শিল্পীদের নানাদিক থেকে ঘিরে ধরে। জীবনের অস্তিত্ব, বাঁচার প্রয়োজনীয়তা, মানুষে-মানুষে হৃদয়ের সম্পর্ক বিচার—এসবই লেখকদের মনোলোকে সক্রিয় হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসেও সেই ভাবনা এসেছে ব্যক্তির যৌনতা, প্রেম-ভাবনা, পুরুষের জীবনে তরুণী, যুবতী নারীর সঙ্গ ও সংসর্গের যৌক্তিকতা এবং এসবের ঊর্ধ্বে এসবেরই জীবনায়নে পুরুষ-রমণীর স্থান নির্ণয় সূত্রে। রাজকুমার এমন একজন নায়ক যার দৈনান্দৈনিক জীবনচর্যায় আছে 'এ্যালিয়েনেশান'-এর চারিত্র্য। তার এমন 'এ্যালিয়েনেশান' তার এক তাত্ত্বিক অসুখের নামান্তর মাত্র! তত্ত্ব হল নর-নারীর যৌন সম্পর্ক, প্রেম বিষয়ক। তার ব্যক্তিগত শারীরিক ও অন্তঃশীল এক মানসিক অসুস্থতা চারপাশের সকলের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ঃ

'বেলা তিনটার সময় রাজকুমার টের পাইল, তার মাথা ধরিয়াছে। এটা নূতন অভিজ্ঞতা নয়, মাঝে মাঝে তার ধরে। কেন ধরে সে নিজেও জানে না, তার ডাক্তার বন্ধু

অজিতও জানে না। তার চোখ ঠিক আছে, দাঁত ঠিক আছে, ব্লাডপ্রেসার ঠিক আছে. হজম-শক্তি ঠিক আছে,—শরীরের সমস্ত কলকব্জাগুলিই মোটামুটি এতখানি ঠিক আছে যে, মাঝে মাঝে মাথা ধরার জন্য তাদের কোনটিকেই দায়ী করা যায় না। তবু মাঝে মাঝে মাথা ধরে।

....আজ গোড়াতেই মাঝে মাঝে সাধারণ মাথা ধরার সঙ্গে আজকের মাথাধরার তফাৎটা টের পাওয়া গেল। দু'চার মাস অন্তর তার এরকম খাপছাড়া মাথাধরার আবির্ভাব ঘটে। নদীতে জোয়ার আসার মত মাথায় একটা ভোঁতা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার সঞ্চার সে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, তারপর বাড়িতে বাড়িতে পরিপূর্ণ জোয়ারের মত যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যে থমথম করিতে থাকে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে না।'

এমন অসুস্থতার মধ্যে রাজকুমারের চলে গিরি, মালতি, রিনি, সরসী—এইসব পরিচিত তরুণীদের সঙ্গে যান্ত্রিক যোগাযোগ, মেলামেশা। রাজকুমারের সরসীকে বলা একটি মন্তব্য তার অসুস্থতাজনিত বিচ্ছিন্নতার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি যেন :

'কারো সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সবাইকে দেখি, খুব যার সংকীর্ণ জীবন, তারও কয়েকজনের সঙ্গে সাধারণ সহজ সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তার, বন্ধুত্বের, ঘৃণা বিদ্বেষের সম্পর্ক। কারও সঙ্গে আমার সে যোগাযোগ নেই। কি যেন বিকার আমার মধ্যে আছে সরসী, আর দশজন স্বাভাবিক মানুষ যে জগতে সুখে বিচরণ করে আমি সেখানে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারি না। আমার যেন সব খাপছাড়া উদ্ভট।'

রাজকুমার তত্ত্বটাকেই বড় করে দেখে, তার পরীক্ষাতেই জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ প্রেম, যৌনতা—এসবের সাঙ্কেতস্থ হয়। নারীর সৌন্দর্য ও নারীদেহের সৌন্দর্য—সবই তত্ত্বের মাপে ধরতে চায়। এতেই তার বিচ্ছিন্নতার চরম। তার অন্যতম পরিচিতা সরসীর কাছে মেলে সত্যিকারের শিক্ষা। সরসী তাকে একদিন তার বাড়ি নিয়ে যায় সন্ধ্যায়। নানান কথায় ওপরের ঘরে আসে। নির্জন বাড়ি।

'উপরে দু'টি পাশাপাশি ঘর সরসীর. একটিতে সে বসে, অপরটিতে সে শোয়। মাঝখানে একটি দরজা আছে, ঘর দু'টির ব্যবধান বজায় রাখিতে দরজাটি সে অধিকাংশ সময় বন্ধ করিয়া রাখে, সামনের বারান্দা ঘুরিয়া যাতায়াত করে এঘর হইতে ওঘরে।

বসিবার ঘরে রাজকুমারকে বসাইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।...

...সরসীর ফিরিতে দেরী হইতেছিল। এত রাত্রে তাকে একা বসাইয়া কি করিতেছে সরসী ? আত্মসম্বরণ করিতেছে ? রাজকুমার নিজের কাছেই মাথা নাড়ে। যতই বিচলিত হোক সামলাইয়া উঠিতে সরসীর সময় লাগে না, নির্জনতার প্রয়োজন হয় না।...

রাজকুমার মৃদুস্বরে ডাকে, সরসী ?

পাশের ঘর হইতে সরসী সাড়া দেয়, আসছি।

কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয় সরসীর গলা। নীচে অত সহজে যে-কান্না সে আটকাইয়াছিল, ওঘরে গিয়া সত্য সত্যই তবে কি সেই কান্নাই সে কাঁদিতেছে ? রাজকুমার কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে।...

রাজকুমার ভাবিয়াছিল, সরসী বাহির হইতে ঘরে আসিবে। শোবার ঘরের দরজা খোলার শব্দে সেদিকে চাহিয়া তাহার চোখের পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল।

সরসী আগাইয়া আসিল আরও কয়েক পা।

রিনির মত রঙ নাই, আমি কালো। তবু ভাবলাম, তুমি তো রঙ দেখতে চাও না — তুমি কাঁদছ সরসী।

মনের জোরে কুলোচ্ছে না। কি মনে হচ্ছে জান? ছুটে গিয়ে খাটে তোষক গদির নীচে ঢুকে পড়ি। কিন্তু ভাবা আর করার মধ্যে কত তফাৎ! তখন থেকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি না ডাকলে দরজা খুলতেই পারতাম না।

তুমি বড় সুন্দর সরসী।

চুপ। ওসব বোলো না। দম আটকে মরে যাব।

মরবে না, শোন। তোমার শরীর এমন সুন্দর বলে তোমার মনটাও সুন্দর। তোমায় এখন আমি প্রণাম করতে পারি, জানো?

অনির্বচনীয় আনন্দে রাজকুমারের চিত্ত ভরিয়া যায়, নিরবসন্ন সক্রিয় শান্তির মত এক অপূর্ব অনুভূতি জাগে। শক্তি ও সহিষ্ণুতার যেন সীমা নাই। শ্রদ্ধা, মমতা, কৃতজ্ঞতা আর সহানুভূতি মেশানো যে মনোভাব সরসীর প্রতি জাগে প্রেমের চেয়ে তা বোধ হয় কম জোরালো নয়। সরসী তাকে বোঝে, বিশ্বাস করে। ব্যাখ্যা করিয়া সরসীকে কিছু বুঝাইতে হয় নাই,·· আর জেরা করে নাই, তর্ক তোলে নাই, নিজের হইয়া ওকালতি করার যন্ত্রণা তাকে দেয় নাই, বিনা ভূমিকায় নিজের দেহটি তাকে দেখিতে দিয়াছে। সরসী ছাড়া আর কেউ তা পারিত না।

সরসীর মুখ বিবর্ণ হইয়াই ছিল, ধীরে ধীরে কখন আপনা হইতে তার চোখ বুজিয়া যায়, আর চোখ খোলে না।

এবার যাও সরসী।

তোমার কাজ হয়েছে? এসেছি যখন, মাঝখানে পালিয়ে গিয়ে লাভ হবে না। দু'তিন মিনিট কোন রকমে সইতে পারব।

আর দরকার নেই।

সরসী শোয়ার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, কিন্তু বুঝা যায় দরজার কাছেই সে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় দম নিতেছে।

এবার তুমি যাও রাজুদা। আজ আর তোমার মুখ দেখতে পারব না।

আচ্ছা।

লছমনকে ডেকে দিয়ে যাও।

আচ্ছা। সরসী!

না-না-না। বলো না রাজুদা। রাস্তায় নেবে গেলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে তোমার ভয় হল সরসী? সামনে থেকে সরে গিয়ে? আমি অন্য কথা বলছিলাম।

কি কথা?

আমি কাউকে ভালোবাসি না।

সে তো আমিই তোমাকে বলেছি একটু আগে।

তুমি বললে কি হবে, আমি তো জানতাম না। আজ জানতে পেরেছি, তোমায় একটা সার্টিফিকেট দিয়ে যাই। তোমার শরীর আর মন শুধু সুন্দর নয়, তুমি ভাল, তোমার

বেঁচে থাকা সার্থক। তুমি আমাকে উঁচুতে তুলে দিয়েছ। তোমার সাহায্য না পেলে কোনদিন হয়তো সেখানে উঠতে পারতাম না সরসী।'

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের নায়কের এই যে অভিনব উত্তরণ, তা প্রেম ও যৌনতার সীমিত রূপকে অস্বীকার ক'রে বিস্তৃত ক্ষেত্রে উজ্জীবনই! রাজকুমার তত্ত্বকে নিষ্ফল জেনে যায় জীবনের সুস্থ দাবীর কাছে। প্রেম ও যৌনতা মানুষের জীবনে সব নয়, এক অতি খণ্ডাংশ মাত্র। তাকে নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে গেলেই আসে বিকৃতি। এই বিকৃতি নিজস্ব তত্ত্বে যুক্ত হয়ে রাজকুমারের জীবনে সমাজ-সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নতাকে ডেকে আনে। কিন্তু রাজকুমার নির্ভীক নিরাসক্তচিত্ততায় সরসীর নগ্ন দেহ দেখে মানসিক বন্ধ্যা দশা থেকে মুক্তির শ্বাস নিতে সক্ষম হয়, তা তার সামান্য সংলাপেই স্পষ্ট—'তুমি আমাকে উঁচুতে তুলে দিয়েছ। তোমার সাহায্য না পেলে কোনদিন হয়ত সেখানে উঠতে পারতাম না সরসী।' রাজকুমারের ছিল নারীর দেহ,যৌনতা ও প্রেম-সম্পর্কভাবনাজাত এক অ-সম অস্তিত্ব-ভাবনা —যার আর এক নাম বিচ্ছিন্নতা, তা থেকে সরসীর নগ্নদেহ দর্শনে তার যে 'অনির্বচনীয় আনন্দে চিত্ত ভরিয়া যায়' এবং 'নিরবসন্ন সক্রিয় শান্তির মত এক অপূর্ব অনুভূতি জাগে', —তাতেই রাজকুমার জীবনের দিকে মুখ ফেরায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন নায়ক-ভাবনায় ও পরিণতি চিন্তায় জীবনের অস্ত্যর্থক মূল্যের স্বীকৃতিই প্রধান হয়।

জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখেনি রাজকুমার, দেখেনি 'বাঁধা-ধরা জীবন' উপন্যাসের নায়ক ভূপেনও। বিপত্নীক ভূপেন বন্ধু প্রসন্নর বোন লেডি ডাক্তার প্রভার সঙ্গে নতুন করে সম্পর্কের কথা ভাবে। কিন্তু আগের স্ত্রী সরমা ও তার পুত্র নন্তুর কথা তার মনে পড়ে যায়। প্রভাকে বিবাহের কথাও ভাবে। একদিকে সরমার মৃত্যুজনিত একাকিত্ব ও অভাববোধ, আর একদিকে প্রভাকে বিবাহ করে, ভালোবাসার গভীরতার কাছে আসায় দ্বিধা—দু'য়ে মিলে ভূপেনকে ভিতরে ভিতরে অসুস্থ করে অলক্ষ্যে। অস্তিত্ব রক্ষার যে স্থির কেন্দ্রবিন্দু, সেখান থেকে ভূপেন হয় ক্রমশ কেন্দ্রচ্যুত। একসময়ে সে একথাও ভাবে,—'সংসারে ভালোবাসার স্থান নাই। সুখ-শান্তির সঙ্গে সম্পর্ক নাই ভালোবাসার।' প্রভার সহজ কথায়, জীবন সম্পর্কে সুস্থ চিন্তায় ভূপেন নিজেকে স্থির করতে পারে না, এক নিজের গড়া গভীর শূন্যতাবোধ পীড়িত করে। ভূপেনের ব্যবহার থেকে প্রভা সুস্থভাবে যে প্রেমমনস্কতা বাঁচিয়ে থাকার কারণে বিবাহ না করে মুক্ত থাকার কথা ভাবে, ভূপেন সেখানেই প্রভার বিরুদ্ধে যায় স্বগত-চিন্তার সূত্রে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অসুখ-জীবনভাবনা থেকে সুখ-জীবন, সুস্থ অস্তিত্ব রক্ষার সাহসকেই 'ধরা-বাঁধা জীবন' উপন্যাসের সিদ্ধান্তে সত্য করে তোলার কারণে প্রকারান্তরে হৃদয়ের যুক্তিতে অস্তি-ভূমিতে নায়ককে ফিরিয়ে এনেছেন।

'প্রভার জীবনেও হাসি ও আনন্দ আজ এত সুলভ! নিজে সে তবে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে কেন? এ দোষ তো তার নিজের। প্রেমকে এত বড় করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন তো তার ছিল না। ব্যর্থতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে কেউ তো তাকে অনুরোধ করে নাই। সরমা আর নন্তুর জন্য শোক যদি তার হইয়া থাকে হোক, প্রভা যদি স্বপ্ন আর কল্পনার জগৎকে অনুর্বর মরুভূমি করিয়া দিয়া থাকে দিক। আরও তো অনেক কিছু আছে জীবনে, সে সব অস্বীকার করিবার কোন কারণ তো নাই। হাতের খেলনা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে বলিয়া অবোধ শিশু ঘরের আসবাব ভাঙিতে আরম্ভ করে। সে তো শিশু নয়।

প্রভার সঙ্গে আবার অনেকটা বুঝোপড়ার মতলব ভূপেনের কাছে হাস্যকর ছেলেমানুষী হইয়া যায়। কি হইবে প্রমাণ করিয়া প্রভার মনে কি ছিল আর কি ছিল না? তার চেয়ে হাসিতে দেওয়াই ভাল।'

দোতলায় প্রভার ঘরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে উচ্চরব স্বতঃস্ফূর্ত হাসির মধ্যে ডুবে থাকার বিষয়কেই যথার্থ ভাবার মধ্যে ভূপেনের আংশিক জীবন সত্য নয়, সমগ্র জীবন-অস্তিত্বের স্বীকৃতির ব্যঞ্জনা থাকায় লেখক হৃদয়-যুক্তি-নিহিত অস্তিবাদী সাহিত্যিকের ভূমিকা পালন করেছেন বলেই মনে করি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জগদীশ গুপ্তও একজন বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির অধিকারী রূঢ় বাস্তববাদী কথাকার। তাঁর একাধিক উপন্যাসে ও গল্পে মানবভাগ্যের নিষ্ঠুর নিয়তির শোচনীয় পরিক্রমাকে সত্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা আছে। কিন্তু এমন নিয়তি-নির্দেশ গ্রীক নিয়তি-সূত্রের সঙ্গে আদৌ যুক্ত নয়, যুক্ত বাংলদেশের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ভেঙে-পড়া মানুষের পচনশীল সমাজ ও সংসারে অর্থনৈতিক বণ্টন-বৈষম্যের সকরুণ অভিশাপ ও দারিদ্র্য এবং এসবের মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত স্বভাব, স্বার্থ, লোভ, সুবিধাভোগী বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এসবের মধ্যেও আছে জীবনের দিকে মুখ-ফেরানোর আর্তি। সমস্তরকম Negation থেকে একটা affirmation-এর ভিত্তিতে জীবনকে দেখার ও মূল্যায়ন জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে মেলে। মেলে তাঁর 'লঘুগুরু' উপন্যাসের গণিকা নায়িকা উত্তমের আচার ব্যবহার ও অন্তিম জীবন-প্রত্যয়ে।

উত্তম বাস্তব পেশাগত অর্থেই গণিকা, সে তার পেশা দিয়েই জীবনের বিপরীত রূপ ভজনা করে। শরৎচন্দ্রীয় গণিকা থেকে জগদীশ গুপ্তের গণিকা চরিত্র অনেক বেশী জীবন্ত ও বাস্তব। এমন বাস্তব ভাবনার পরিচয় তার স্বভাবের বর্ণনায় লেখক উপস্থিত করেছেন, '—মানুষকে হাতে পাইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া খেলাইয়া খেলাইয়া পিশাচ করিয়া তুলিবার বিদ্যাটা সে চেষ্টা করিয়া, ভিতরকার বিরোধী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল—তখন তাহার নাম ছিল বনমালা—তারও আগে নাম তার যূথী। মানুষ সেই যূথীর শত্রু।' বিশ্বম্ভর নামের যে পুরুষের সে রক্ষিতাজীবন যাপন করে, সেখানেও থাকে তার সুস্থ জীবনভোগের আর্তি থেকে জাত এক অদ্ভুত প্রতিশোধস্পৃহাজাত মনোভঙ্গি— 'মনে মনে সে কল্পনা করিত, বিপরীত পথে চালিয়া শয়তানকে শাসন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেও না জানি কত আনন্দ।' এই উত্তম বিশ্বম্ভরের মেয়ে টুকিকে কেন্দ্র করে বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ে যে জীবনের কথা ভাবে, টুকিকে যেভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্রজীবনে স্থিত করতে সংগ্রামী হয়, পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতিকূল আচরণেও নিজে দৃঢ় থাকে, তা তো জীবনবিশ্বাসী অস্তিবাদী লেখকেরই চিন্তা!

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর' উপন্যাসে অধ্যাপক হীরেন চক্রবর্তী ও তার সুন্দরী স্ত্রী মীরার যে সংসার তা এমন এক মধ্যবিত্তের সংসার যেখানে স্বামীর অসুখের কারণে মীরাকে সংসার চালাবার জন্য টাকা ধার করতে বেরুতে হয়, যেতে হয় কলেজে-পড়া বন্ধুদের কাছে। তেমন এক বন্ধু ধনী অমরেশ, যার সঙ্গে বিয়ের পরেও মীরা শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। অমরেশের হাত স্পর্শ করা শুধু নয়, নির্জনে গঙ্গার ধারে নির্জন পরিবেশে বসে অমরেশের চুমুতেও যার আপত্তি থাকে না, অমরেশের হাত থেকে কয়েক

হাজার টাকার চেক নিতেও যার সামান্য দ্বিধাটুকু সহজেই সরে যায়। মীরা চাকরী খোঁজে। মধ্যবিত্ত সংসারের সমস্ত নৈতিক বন্ধন ভাঙতে থাকে, অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। কিন্তু শুধু অর্থাভাবেই নয়, সেই সঙ্গে স্বামী হীরেনের ঈর্ষা, নিম্নবিত্ত বেকার শিল্পী পাশের ঘরের ভাড়াটে মৃগাংক মজুমদারের মীরার প্রতি দুর্বলতা. শিল্পীর সপ্রশংস দৃষ্টিও যে এমন নৈতিক অধঃপতনের একটি কঠিন জটিল ধাপ, লেখক সেদিকও দেখিয়েছেন।

বাধ্য হয়ে অভাবের সংসারেও ঝি রাখতে হয়েছে মীরাকে। কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনে সেই মালতীর কাছে টাকা চাইতে বাধে না।

'হীরেন ডাকলো, 'শোনো'।

কি ?

মীরা আধখানা হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

'মালতীর কাছে চেয়ে দেখতে পারো, একটা দুটো দিয়েও চালাতে পারবে। ও এখুনি এসে যাবে।'

নিঃশব্দে মীরা একবার মাথা নাড়লো শুধু।

তার দুই কানের ডগা লাল হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি বারান্দায় চলে গেল বলে হীরেন আর দেখতে পেলে না।

টাকা চাইতেই মালতী আঁচল খুলে পাঁচ টাকার একটা নোট দাদাবাবু বা দিদিমনি কারুর হাতে না দিয়ে টেবিলের ওপর রাখলো।

দু পাঁচ টাকা সর্বদাই তার আঁচলে বাঁধা থাকে। এমন হাস্য ও লাস্যভরে কথাটা ঘোষণা করে ঝি টাকাটা টেবিলের ওপর রাখছিলো যে অন্যদিন হলে হীরেনের চেহারার কি রঙ ধরতো মীরা ঠিক মনে করতে না পারলেও এখন বুঝলো. এই মুহূর্তে হীরেনের চেয়ে সরল কৃতজ্ঞ ও দরদী মানুষ খুব বেশি পৃথিবীতে নেই।'

ঝি-এর কাছে অর্থ ঋণ গ্রহণের সময় মালতীর ব্যবহার, হীরেনের অভিজাত মনে হীনমন্যতার অসহায়তা ও মীরার সেই সূত্রে সাংসারিক জটিলতা থেকে মুক্তি ও তার সেদিনের বাইরে জরুরী কাজের চাপের মধ্যে সাময়িক একটু সুযোগ পাওয়া—এসব লেখক এমন দৃশ্যে উপস্থিত করেছেন। এমন চিত্রে আছে জীবনের বিপরীত ছবি, জীবনের অস্তিত্ব যেখানে টিকিয়ে রাখতে নায়ক-নায়িকার সংগ্রাম নিস্ফল হয়ে যায়, মীরা হয় কেন্দ্রাতিগ। অস্তিত্বের মূল্যায়ন এখানে বিপরীতে।

'মীরার দুপুর' উপন্যাসের শেষে মীরার স্বামী হীরেনের মৃত্যু ঘটেছে আকস্মিক আত্মহননে। লেখক মীরার জীবনের অবক্ষয়টিকেই সত্য হিসেবে রেখে উপন্যাস শেষ করেছেন। মীরার ভবিষ্যৎ কি ? সে যে অমরেশের মত পুরুষকেও স্বীকার করতে পারে না তার জীবনে, তা তার 'হীরেন এক অর্থে গোঁড়া. অমরেশ অন্যভাবে'— এই ভাবনায় ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু যে মৃগাংক মজুমদারের অকুণ্ঠ প্রশংসা শোনার পর 'অমরেশ ও হীরেন ছাড়া তৃতীয় এক পুরুষের চোখে নিজেকে এই প্রথম দেখে মীরার যার প্রশংসায় কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়।'—সে-ও তো বিত্তে অত্যন্ত অসহায়, তার কাছে ভবিষ্যতের নির্ভরতায় মীরা স্থায়ী সুস্থ আশ্রয় পাবে, তেমন আশা নেই। মৃগাংকর প্রশংসাই মীরার বোধের জগতে নতুন এক আকাঙ্খার জন্ম দেয়ঃ 'রূপ রূপ আর সেই রূপের মন্দিরের মধ্যে জ্বলছে সেবা মমতা সংযম ও প্রেমের মোমবাতিগুলো।' রূপের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা মীরা

আর কোনদিন কারুর মুখে শোনে নি। এমন নিজের রূপ সৌন্দর্যের বিলাসদীপ্ত সচেতন আত্মরতিতেই মীরা মৃগাংককে মনোভূমিতে আর একভাবে গ্রহণ করে ফেলে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মীরার পরিণতিতে একমাত্র মধ্যবিত্ত রমণীর অবক্ষয়ের দিকটিকেই সত্য করে রেখেছেন। আর সে অবক্ষয় যুদ্ধোত্তর জীবন অস্তিত্বের সংকটকে করে ঘনীভূত।

অন্যদিকে 'নীলরাত্রি'-এর নায়িকা মালার মতো আত্মিক সংকটের সমাপ্তি ঘটেছে তার স্বামী মানিক দাসের সঙ্গে ঘরে প্রত্যাবর্তনে। মালা সাময়িকভাবে স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে বৌবাজারের টি মার্চেন্ট দাদা প্রফুল্ল ও বৌদি রমলার কাছেই ছিল। তাদের সংসারের গলগ্রহ যেন। যেখানে বিপত্নীক নীরদের গোপন প্রেম সম্পদ ও তার পুত্র বাবুর প্রতি স্নেহ ভাবনাকে ঘিরে যে মানসিকতা মালার, তাতে সর্বশেষ ফাটল ধরে পুত্রসহ নীরদের পলায়নের কারণে। কিন্তু মালার বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও নীরেন তাকে প্রেমে ও দেহ সম্পর্কে গভীরভাবে কাছে রাখবে, কিন্তু বিবাহ করতে পারবে না এমন কথা বলায় মালার চিন্তা তাকে এক গভীর শূন্যতার দিকে ঠেলে দেয়। যে শূন্যতা এক কঠিন অবক্ষয়েরই আর এক দিক—'যেন হঠাৎ এক পাতালপুরীতে নেমে এল ও। কি হবে কি হবে। মালার ভয় করতে লাগল। জিভটা বিস্বাদ ঠেকছে। কেবল বিস্বাদ না, পাথরের মত শক্ত হয়ে আছে, জড় হয়ে আছে মুখের ভিতর, ইচ্ছা করলেও মালা এখন সেটা নেড়ে একটা কথা বলতে পারবে না। · শরীরের সব কটা ইন্দ্রিয় তার বন্ধ হয়ে আছে মরে গেছে, কেবল শরীরটা আছে। স্থির অনড় ঠাণ্ডা শক্ত একটা বড় মাংসখণ্ড। দোকানে ঝুলিয়ে রাখা মাংসগুলো মনে পড়ে মালার। আজ ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে আছে কাল সকাল থেকে পচতে আরম্ভ করবে। তারপর পোকা পড়বে পোকা কিলবিল করবে। এর দাম নেই। উঃ এত বড় ঠাট্টা। আমিও রইলাম তোমার স্বামীও রইল। তবে আরও একজনকে থাকতে দোষ কি, আরো একজন, আরো, আরো—বিকেলে বাড়ির সামনে পার্কে যত পুরুষ জড়ো হয় সব।' মালার এই ভাবনা অবৈধ প্রেম ও যৌনতার সূত্রে ভয়ংকর এক নৈতিক অধঃপতনকে চিহ্নিত করে, যার মধ্যে গৃহী, সুস্থ নারী হয়ে ওঠে দেহজীবা রমণীমাত্র। মালার প্রেম ছিল তার জীবন প্রেম, তা তার গভীরতম প্রয়োজনের দিক। সেখানে সে ব্যর্থ। লেখক স্বামী মানিকের ঘরে মালাকে পাঠিয়ে অবক্ষয় থেকে সুস্থ জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু ফেরার সময় ট্যাক্সির মধ্যে লেখক যে ছোট ছবি এঁকেছেন দুজনের অন্তরঙ্গতার, তার মধ্যেও কোথাও যেন গভীর শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়ঃ

মালা একসময় বলল, 'অনুতাপ করা ভাল, অনুতাপ করলে মানুষের সব পাপ মুছে যায়।' বলে ও রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন একটু অন্যমনা হয়ে গেল। মালার এই হঠাৎ অন্যমনস্কতা এবং সর্বশেষ নীরদের ছেলে বাবুকে মেরে ফেলার জন্য গোপনে তার ওষুধের গ্লাসে বিষ রেখে দেওয়ার মধ্যে অবক্ষয়ের আর এক দিক স্পষ্ট হয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বের টীকা-ভাষ্য অন্য ব্যঞ্জনায় রেখেছেন।

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী স্পষ্ট করেই নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের জীবন্ত ছবি তুলেছেন, যার মধ্যে লেখকের নির্মম নিরাসক্তির দিকটিও লক্ষ্য করার মত। সেই সমকালের রক্তিম বিষণ্ন পরিবেশে জীবন-অস্তিত্ব ব্যাখ্যার প্রয়াস। উপন্যাসে বারো ঘরের যে বস্তি জীবন তার অধিবাসী নিম্নবিত্ত অথচ শিক্ষিত মানুষই। সমাজের গরীব সর্বহারাদের এই বস্তি নয়। বেলেঘাটার ট্যাংরা কুলিয়া অঞ্চলের এমন বস্তিতে চলে

আসতে বাধ্য হয় মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের ভাল ফ্ল্যাটের আকর্ষণ ত্যাগ করে ফেল-পড়া হিমালয়ান ব্যাংকের ম্যানেজার শিবনাথ, তার শিক্ষয়িত্রী স্ত্রী রুচি ও পাঁচ বছরের মেয়ে মঞ্জু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তীকালের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে রাতারাতি ব্যাংক ফেল করার পটভূমি এখানে স্বীকৃত। বস্তির বারোটি ঘরের বাসিন্দারা একটি উঠোনকে ব্যবহার করে। শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষদের বৈশিষ্ট্য হল তারা যেমন প্রত্যেকে একে অপরজন সম্পর্কে কৌতূহল মনে পোষণ করে, তেমনি আবার এক নিরাসক্তিকে মনের মধ্যে ধরে রাখে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙনের জীবন্ত চিত্র আঁকতে গিয়েই এনেছেন এই বস্তিতেই একদা সাহেবী-অফিসের বড়বাবু কে. গুপ্তকে যার সঙ্গে আছে তার নিজ অতীত আভিজাত্য-সচেতন স্ত্রী সুপ্রভা, ছেলে রুনু, মেয়ে বেবি, আছে বস্তির মালিক রায় সাহেবের অত্যন্ত অনুগত কুচক্রী রমেন রায়, নার্স কমলা, মমতা সাধনা দুই যুবতী মেয়ে নিয়ে বিধুমাস্টার, সেলুনওয়ালা পাঁচু ভাদুড়ী, কারখানার শ্রমিক বিমল হালদার, ফেরিওয়ালা বলাই, সন্দেহ রোগে ভোগে এমন মানুষ অমল চাকলাদার ইত্যাদি। বস্তির মালিকের পুত্র-পুত্রবধূ পারিজাত ও দীপ্তিকে, সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র পরিচালক চারু রায়কে লেখক এই মধ্যবিত্ত বস্তির জীবনের সঙ্গে বাইরে থেকে এনে যুক্ত করেছেন।

বস্তির মধ্যে মানুষগুলির যে ভাঙনের ছবি তার মূলে আছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। সেই অর্থনীতির সঙ্গে অবক্ষয়িত সমাজনীতিও যুক্ত। মানুষে-মানুষে সম্পর্কের নীতি আদর্শ. মনোবিকতাবোধ পর্যুদস্ত। বেকার শিবনাথ সংগোপনে খোঁজে যুবতী রমণীর দেহ। সুরুচি বস্তি-জীবনে কিছুটা সুস্থ থাকলেও শেষ দিকে লেখক তার সঙ্গে চারু রায়ের এক সম্পর্ক তৈরি করিয়ে দেয়, তার মধ্যেও এক অত্যন্ত আড়ষ্ট অস্বাভাবিকতা এনেছেন। মনে হতে পারে সুরুচির পক্ষে তা আকস্মিক, চরিত্র-ন্যায়ে অসঙ্গতি আনে, কিন্তু লেখক নির্মম নিরাসক্তিতে চরম রূপ দেখাতে চেয়েছেন নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়ের। কে গুপ্তর সঙ্গে শিবনাথের নিজের স্ত্রী এবং চারু রায় সম্পর্কিত এক চরম মন্তব্যের সূত্রে সংঘর্ষের চিত্রে অবক্ষয়ের নিরাসক্ত রূপটি লক্ষ্য করার মত :

'শিবনাথ প্রবল শক্ত হাতে কে. গুপ্তের গলা টিপে ধরেছে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে সাপের মত হিস্‌হিস্ আওয়াজ বার করল মুখ দিয়ে, দম বন্ধ হয়ে কথা আটকে গিয়ে এই অবস্থা হচ্ছিল। আমি, আমি ভুল দেখতে পারি, কিন্তু আমি তো পরিষ্কার দেখলাম মশাই, দ্যাট বাগার, হু চারু হি কিস্‌ড্ রাইট অন হার—

একটা আলো জ্বললো সামনে। শিবনাথ চোখ তুলল। হ্যারিকেন হাতে রুচি।

···অন্ধকারকে সম্পূর্ণ পিছনে রেখে শিবনাথ আলোর দিকে, রুচি যেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'কি বলছিল তোমায়' রুচি প্রশ্ন করল : পাগলটার সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করছিলে ?'

'পয়সা চাইছিল। অনেক পয়সা দিয়েছি ওকে। আজ আবার।' শিবনাথ স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে সুন্দর করে হাসল। 'রাস্কেলটা আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখতে এসেছিল পয়সা আছে কিনা।'

'দাওনি তো !'

'না, আমার এত মায়া দয়া নেই !' সুরটাকে কঠিন করল শিবনাথ। বলে কিনা এই

পয়সা রোজগার করতে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে আমার।' রুচির সামনে শিবনাথের মূল প্রসঙ্গকে মিথ্যা ভাষণের মধ্য দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া এবং অস্বস্তির মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভাঙনের বীজ নিহিত। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অত্যন্ত শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের গোপন কক্ষের দিকটি এঁকেছেন ঃ

'সন্তোষ ওরা তো বলছেই, আজ চারুবাবু পর্যন্ত বলছিলেন ঠাট্টা করে, টাকা পয়সার গন্ধ পেয়ে পারিজাত ইলেক্শনের কাজে খাওয়া ঘুম বন্ধ রেখে তুমি খাটতে আরম্ভ করেছ।' ঘাড় ফিরিয়ে রুচি হাসল।

'চারু এসেছিল বুঝি? কখন এসেছিল? একটুও অবাক হবার ভান করল না শিবনাথ।

'বিকেলে, রাত নটা পর্যন্ত তো বসে অপেক্ষা করে গেল তোমার জন্যে। একটু চা দিলাম। বাবাঃ কত জানে লোকটা। আর্ট, কালচার, এদেশের বিউটি, ওদেশের বিউটি। বসে থেকে থেকে কত গল্প করে গেল।'

'আর সেই সঙ্গে আমার একটু বদনাম।' শিবনাথ না বলে পারল না।

'আহা, বদনাম আবার কি, ঠাট্টা করে তো বলছিল।' যেন একটু ঝাঁজ ফুটল রুচির গলায়। তা যেমন বদনাম করে গেছে তেমনি তার দাম দিয়ে গেছে। আস্ত এক টিন সিগারেট রেখে গেছে তোমার জন্যে, বলছিল বার বার শিবনাথবাবুকে দেবেন, ভাল জিনিস নিউ মার্কেট থেকে যোগাড় করে—'

রুচির কথা অসমাপ্ত থেকে গেল।

'এঁ্যা, তাই নাকি, তাই বলো। প্রবল উচ্ছ্বসিত গলায় শিবনাথ বারো ঘরের উঠোন কাঁপিয়ে হেসে উঠল। বেশ, বেশ, ভাল ভাল, পেটে খেলে পিঠে সয়, একটু বদনাম করেছে তাতে কি, কি বলো?' বলে সে এমন অদ্ভুতভাবে স্ত্রীর দিকে তাকাল যে রুচি রীতিমত ভয় পেল।

'কি, তুমি অন্য কিছু ভাবছ নাকি,—এমনভাবে তাকিয়ে দেখছ কি আমার মুখের দিকে?'

হাসল না এবার আর, জোরে মাথা নেড়ে হাজার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শিবনাথ বলল, 'পাগল, কিছু না, কি আবার ভাবব আমি, আমার অত শত ভাবলে চলে? এসো, ঘরে এসো।' বলে সহজ স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর হাতে হাত রেখে উঠোন পার হয়ে সে বারান্দায় উঠে গেল'।

স্ত্রীর কাছে চারুর আসার খবর পেয়ে একটুও অবাক হবার ভান না করা, শিবনাথের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে একা দেখা করে চারু রায়ের আস্ত একটিন সিগারেট রেখে যাওয়া, তাকেই 'পেটে খেলে পিঠে সয়' এমন প্রবাদ প্রবচনে অতি সহজভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যে স্বামী হিসেবে শিবনাথের সে চরম মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিচয় স্ত্রী রুচিকে গ্রহণ করার মত আপসের মনোভাব, তাতেই মধ্যবিত্তের ভাঙনের চিত্র নিগূঢ় হয়ে ওঠে। রুচির রীতিমত ভয় আর শিবনাথের সহজ-স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর হাতে হাত রেখে উঠোন পার হয়ে বারান্দায় উঠে আসার মধ্যে এক অসহায় নাগরিক দম্পতির নিষ্করুণ অবতরণের সিঁড়ি তৈরি হয়ে যায়।

শুধু শিবনাথ রুচি প্রসঙ্গেই নয়, বস্তির অন্য দুই বাসিন্দা রহস্যময়ী নার্স কমলা ও

চাকরী করতে ইচ্ছুক বীথির কথোপকথনে লেখক যে চিত্র উপহার দিয়েছেন, আবার রুচির মত শিক্ষিত নারীকেও চারু রায়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে তার স্তর থেকে যেভাবে একধাপ নীচে নামিয়ে লেখক শান্ত হয়েছেন, সমগ্র উপন্যাসে যুদ্ধোত্তরকালের সমাজ-সংকট অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বৈষম্য অস্তিত্বের সংকট-ভাবনাই সেখানে প্রবল।

বুদ্ধদেব বসুর 'শেষ পাণ্ডুলিপি' উপন্যাসের নায়ক-লেখক বীরেশ্বর গুপ্তের স্বীকারোক্তির মধ্যে যে শূন্যতাবোধের পরিচয়, তা তার কঠিন আত্মকেন্দ্রিকতারই সম্যক পরিচায়ক। তার জীবনে যে নির্মম আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম, তা একে একে নির্মিত হয়েছে, বলা যায় লালিত হয়েছে তার পারিপার্শ্বের সঙ্গে সংঘাতেই। বাবার আত্মস্বার্থ রক্ষার প্রয়াস ও উপেক্ষা এবং পুত্রের প্রতি শাসন নিপীড়ন, বাবার প্রতি মায়ের সভয় বিসদৃশ আত্মসমর্পণের স্মৃতি, কিশোর বয়সের প্রেমিকা গৌরীকে বাবার পুনর্বিবাহজনিত ঘৃণা, বিমাতা গৌরীর তীব্র জ্বালাময় প্রেমের আকর্ষণ ও গৌরীকে এক রাত্রের ভোগে, স্ত্রী সুধার প্রতি নিজের একাধিক সাবালক সন্তান থাকার পরেও ঘৃণা, শেষে বন্ধুপত্নী অর্চনার প্রতি তীব্র অবৈধ প্রেমাকর্ষণ—এ সবই বীরেশ্বর গুপ্তকে এমন এক শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে যেখানে আত্মহনন ছাড়া কোন মুক্তি নেই।

স্ত্রী সুধা সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে বীরেশ্বর গুপ্ত নিজের বিশ্বাসের কথা বলে, অবসাদ, নিঃসঙ্গতা, সময়ের ভার—'এই অভিশাপগুলো পুরুষের, মেয়েরা তার আভাস পাবে কি করে? কেন না, এই পৃথিবীতে শুধু মেয়েরাই সুখী হতে পারে, শুধু বেঁচে থেকেই সুখী হবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে তাদের। তারা জিজ্ঞেস করে না কেন বাঁচবো? কিসের জন্য?—আর তাই, তাদের মনের উপর কখনোই সেই বিরাট শূন্যতা নেমে আসে না। যার চাপে আকাশ আকর পৃথিবীটাকে ধোঁয়ার মতো ধূসর মনে হয়, বিশ্বাসের বাতাসের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে পড়ে।' বীরেশ্বর বেঁচে থাকার, জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার তাৎপর্য খোঁজে, তার যে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা তা তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে জাত। জীবনের সংকীর্ণ বৃত্তেই তার শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা, অবসাদ সচল, সীমাবদ্ধ। বন্ধু প্রফুল্লর স্ত্রী অর্চনার প্রতি যখন তার আকর্ষণের তীব্রতা, তখনো তার মানসিক জটিলতায় দ্বন্দ্বের দিক অস্পষ্ট নয়—'একই সঙ্গে অন্তরঙ্গ আর নৈর্ব্যক্তিক সেই গতির চেতনার মধ্যে ডুবে গেছি আমি, অন্ধকারের ভাঁজ খুলে খুলে মিশিয়ে নিতে চেয়েছি নিজেকে।' পারিবারিক জীবনে স্ত্রী সুধার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে বীরেশ্বরের চেতনায় কত যে বিশাল ফাঁক রচনা হয়েছে, তা বোঝা যায় তখনি, যখন বীরেশ্বর স্ত্রীর পাশে গভীর রাতে শুয়ে দুজনের সম্পর্কের বর্ণনা দেয়—'সুধা আর কিছুই বললে না, গোরুর মতো সহিষ্ণু আর মন্থর ভঙ্গিতে বিছানায় উঠলো। আমি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম তার পাশে, অর্চনার কথা ভাবতে ভাবতে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলাম'।

বীরেশ্বর গুপ্তের স্বীকারোক্তির মধ্যে যেন সমরেশ বসুর 'বিবরে'র নায়কের দূর কণ্ঠস্বর শুনি। বুদ্ধদেব বসুর নায়ক যে আত্মবৃত্ত রচনা করেছে, তা তার নিজস্ব, কিন্তু তা পাঁচের দশকেরই মধ্যবর্তী সময়ে তৈরি হয়ে যাওয়া সেই শূন্যতা। এই শূন্যতা সামাজিক অর্থ-নৈতিক জীবনে পর্যুদস্ত মধ্যবিত্ত মানুষের সর্বায়য়ব জীবনস্বভাব থেকে জন্ম নেওয়া শূন্যতা নয়, তা তার ব্যক্তির সত্যে ধরা। এক নায়ক এক সময় বলে, 'এতদিন আমি শুধু নিঃসঙ্গ ছিলাম, তৃষিত ছিলাম না। কিংবা, তৃষ্ণা যদি বা ছিল, সে বিষয়ে

চেতনা ছিলো না আমার। নিঃসঙ্গতাকেই আমার স্বাভাবিক অবস্থা বলে আমি ধরে নিয়ে ছিলাম, মেনে নিয়েছিলাম অনিবার্য বলে।···নিঃসঙ্গতা, স্বাধীনতা, দায়িত্বহীনতা, এই সবচেয়ে কাম্য ছিলো আমার, আমি ঘৃণা করেছি সাংসারিকতাকে বোকার মতো তাঁর ফাঁদে একবার মাথা পেতে, তারপর ভণ্ডের মতো সেটারই জয়ধ্বনি করিনি, অবিলম্বে গরাদ ভেঙে বেরিয়ে এসেছি। সেই বাইরেটাকে নোংরা বলে থাকে লোকেরা, কিন্তু আমি দেখেছি সেটা অত্যন্ত ভণ্ডামি আর চালিয়াতি থেকে মুক্ত, সেখানে. যে যা নয়, তাই বলে চালাতে চায় না নিজেকে—যা ভদ্রলোকেরা অনবরত করে থাকেন. টাকার জন্য দেশের কাজ, নিজের বোতল ভরাতি রেখে প্রহিবিশনের বক্তৃতা করা, সমাজে 'চলাচল' হবার জন্য সাহিত্যিকের বুলি আওড়ানো, নিজের কামে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধের জন্য 'পতিতা ভগিনীদের' উদ্ধার করা অন্তত এসব পাপ নেই সেখানে নেশাটা নেশাই, তার ধ্বয়োটা জুয়ো, আর বেশ্যারা খোলাখুলিভাবে শরীর বেচে······এই এক হিসেবে অনেক বেশি পরিষ্কার জগৎ, আমার স্ত্রীপুত্রের বিড়ম্বনাভরা সংসারের চাইতে ভিতর দিক থেকে অনেক বেশি খাঁটি আর পরিষ্কার।' বীরেশ্বরের এই জাতীয় আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে বোঝা যায়, একটি মানুষ কি ভাবে এবং কেন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। পাঁচের দশকের সমাজ ও ব্যক্তি যে ভিন্ন একটা আশ্রয় খুঁজছে, একটা বড় মুক্তি চাইছে, বুদ্ধদেবের নায়ক তারই অনুসন্ধানী। তথাকথিত সংসারের শূন্যতা বীরেশ্বরের কাছে অসহায়তার অঙ্গুলি নির্দেশক, এর মধ্যে 'বিবর'-এর নায়কের বীজাকৃতি।

বুদ্ধদেব বসুর নায়ক যখন বলে, 'শুধু নিঃসঙ্গতা নয়, শূন্যতা—একটা অন্তহীন নেই' গহ্বরের মতো গ্রাস করেছে আমাকে. কী নেই, আলো নেই, গতি নেই, উদ্যম নেই, বেদনা নেই, জীবন নেই। একমাত্র যাতে এসে যায়, তাই নেই।' তখন 'বিবরে'র নায়কের অংশিক পূর্বসূরিত্বকে এই চেতনায় অস্বীকার করতে পারি না। এই সঙ্গে আমরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নায়িকা মীরা (মীরার দুপুর) ও মালা (নীলরাত্রি) দুজনকেই স্মরণ করি। বীরেশ্বরের আত্মহনন মীরার পরিণতিতে অন্যরূপ নিয়েছে। মীরার অবক্ষয়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক একটি ভিত্তি রেখেছেন লেখক। মালারও তাই। মীরার আত্মকেন্দ্রিক রূপ-চেতনা ও উগ্র স্বভাব-সচেতনাই যেমন স্বামী হীরেনের আত্মহননের কারণ হয়েছে, তেমনি মীরাকে ঠেলে নিয়ে গেছে এক ভয়াবহ শূন্যতার দিকে যেখানে সম্ভবত বন্ধু অমরেশ শুধু নয়, শিল্পী মৃগাঙ্ক মজুমদারও থাকবে না, সত্য হবে না। লেখক তা স্পষ্ট করেন নি, কিন্তু সামাজিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় যে অবক্ষয়, তা তার এক শূন্য গহ্বর রচনা করে। মালাও স্বামী মানিক দাসের সঙ্গে শেষ সংসার করতে যাওয়ার পরেও নীরদের কথা ভেবে অন্যমনস্ক হয়, তার ছেলেকে বিষ দেওয়ার ব্যাপারও সচেতনভাবে করে। এ সবের মধ্যেও সেই অবধারিত শূন্যতা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই শূন্যতার একটা স্পষ্ট সামাজিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে ব্যক্তিক আত্মকেন্দ্রিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য ন্যায় রাখতে চেয়েছেন।

সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে শহরে মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়িত রূপকে উপস্থিত করেছেন যথেষ্ট শিল্প-ক্ষমতা যুক্ত করে। নায়িকা নীলাদের সংসারে বাবা শিবতোষবাবু রেসুড়ে, মা হাঁপানিতে ভোগে, দাদা-বৌদি দেবব্রত ও অমিতা তাদের সংসার সম্পর্কে নিরাসক্ত। এই বাড়ির ভাড়াটে স্ত্রী শান্তি ও সাহিত্যিক মনীন্দ্র।

মনীন্দ্রর কবিবন্ধু যুবক ইন্দ্রজিৎ সেই বাড়িতে আসে। নীলার সংগে সেই সূত্রে পরিচয়, নীলার বৌদির ধনী কাকা বয়স্ক অবিনাশবাবু এই মধ্যবিত্ত সংসারে এক জটিল আস্তত্ব--যে নীলাকে বিবাহ করতে চায় ভেঙে পড়া সংসারকে ছলে-ছুতোয় অর্থ সাহায্য দিয়ে। ওদেরই ভাড়াবাড়ির পাশে আসে একদল নার্স—শকুন্তলা, ললিতা, অনিমা, ষ্টেলা ইত্যাদি। তারা 'সেবাসত্র' নাম দিয়ে একটি নার্সিং হোম খোলে।

সবাই যে গলির ভাড়াটে তার নাম কিনু গোয়ালার গলি। এই পুরনো গলি যেন পুরনো জীর্ণ ভেঙে-পড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্যই নির্দিষ্ট। শান্তি বিবাহিতা হয়েও ইন্দ্রজিৎকে সে ভালবাসে, ভালবাসার জটিল বিকারে তাকে আকর্ষণ করে, আবার নীলাও ইন্দ্রজিতের ভালবাসা প্রার্থী। শান্তির আছে তীব্র অর্থপিপাসা এবং সেই সূত্রে স্বপ্ন। এই শান্তি সম্পর্কে বিষিয়ে-ওঠা মনে শান্তিদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ইন্দ্রজিতের চিন্তা- 'কী অহংকারী, কী অন্তঃসার শূন্য।······আবিষ্কার করল, শান্তিকে সে ঘৃণা করে। টাকার স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নবিভোর মেয়েটা তাকে শুধু ঠকিয়ে গেছে। ইন্দ্রজিতের জন্যে যার মনে এক কণা করুণা নেই, তাকে যে সে শেষপর্যন্ত ঘৃণা করতে পারছে, সে কথা ভেবেও ওর মনের অনেকখানি তাপ যেন জুড়িয়ে গেল।' এই ইন্দ্রজিৎ-ই পরমুহূর্তে নীলা সম্পর্কে চিন্তা করে 'নীলাকে নিয়েই ইন্দ্রজিৎ বেঁচে উঠবে। কিছুই হারায়নি· কিছুই ফুরোয়নি, এখনো অফুরন্ত ভবিষ্যৎ সামনে।'

ইন্দ্রজিতের যে মানসিকতা তা মূলত এক শহুরে মধ্যবিত্ত যুবকেরই উপযোগী। প্রেমের আকর্ষণ ও জটিলতায় ইন্দ্রজিৎ আর এক অবক্ষয়িত মানসিকতার সামিল হয়, যখন সে নীলার সাহচর্য, গভীর প্রেম পেয়েও ভাবে—'শান্তিকে সে এখনো ভালোবাসে। কাউকে পছন্দ না করেও ভালোবাসা যায়, ইন্দ্রজিৎ প্রথম জানল ;' নীলাকে গভীরভাবে গ্রহণ করে তার যে সুস্থ জীবন বাসনা, যে প্রেম ভাবনার বলিষ্ঠ স্বীকৃতি, তারই সূত্রে সে নতুন বাসা খোঁজে, কিনু গোয়ালার গলি থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। নীলাকে তার মনের কথাটি শোনায় :

'নীলার একখানা হাত ধরে ইন্দ্রজিৎ বলল, আমি তোমাকে বিয়ে করব স্থির করেছি নীলা।'

• নীলা খুশি হল না, চমকে উঠল না, সরে বসল না একবারো।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাই তুলল একবার। ইন্দ্রজিতের প্রস্তাবে কোন রোমাঞ্চ নেই, নেই কোন অভাবনীয়ের প্রতিশ্রুতি, লেন-দেন যা হবার আগেই হয়ে গেছে, শুধু-চুক্তিপত্রে সই বাকি—কিন্তু তাকে নিয়ে বেশি হৈ চৈ করার অর্থ হয় না। ঠোঁট দুটিতে হাসির চিহ্নমাত্র ফুটিয়ে বলল, 'একটা দুর্ভাবনা গেল।' নীলার এই নিরাসক্তি এক ভয়াবহ অবক্ষয়ের রূপ। নীলা বিবাহের আগেই ইন্দ্রজিতের বিছানায় একাধিকবার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে ভালবাসার দাবিতে। তাই বিবাহের সমস্ত আকর্ষণ, রোমাঞ্চ তার মধ্যে থেকে লুপ্ত। এখন শুধু সামাজিক স্বীকৃতি-পুরুষের দিক থেকে দায়িত্ব গ্রহণটুকুই বাকি শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় বিবাহ সম্পর্কে এক নিরাসক্তচিত্ততা প্রেমিক যুবক-যুবতীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এই নীলাই শেষে অসহায়—অসহায়তার কারণ ইন্দ্রজিতের পক্ষে তাকে সহজ অস্বীকার। ইন্দ্রজিৎ যখন তাকে ছেড়ে যায় তখন সে অন্তঃস্বত্ত্বা। লেখক ইন্দ্রজিৎ-নীলার প্রেম সম্পর্কে সুস্থ জীবনবোধের স্বীকৃতি দিতেই চেয়েছিলেন·

কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তিতে সেখানেও ভাঙন। ইন্দ্রজিতের সন্তান শরীরে নিয়ে নীলা যখন পালাতে চায় গলি থেকে সবার অলক্ষ্যে, যখন নার্স শকুন্তলার সঙ্গে চুক্তি করে, 'আমাকেও আপনার সংগে নিতে হবে শকুন্তলাদি, নিতেই হবে। সব পরে বলব, শুধু এটুকু জেনে রাখুন, আপনার প্রতিষ্ঠানটি একেবারে উঠে গেল না, ছোটখাটো একটা প্রতিষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গে চলল।' —তখন নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে শ্লেষ করে নীলা তার অসহায় জীবনের করুণ রূপটিকেই তুলে ধরে। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে শান্তি-মনীন্দ্র সম্পর্কে, শান্তি-ইন্দ্রজিৎ সম্পর্কে এবং ইন্দ্রজিৎ-নীলার প্রেমবোধের যে চিত্র লেখক এঁকেছেন, তার মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়, নৈতিক পতনের শূন্যতাই প্রধান, বলিষ্ঠ জীবন গ্রহণে উত্তরণের ইঙ্গিত সেখানে নেই। বিপরীত এক অস্তিবাদী জীবনের মাটির ওপর দাঁড়িয়েই লেখক যেন সমকালের জীবন-অস্তিত্বে রক্তচক্ষু।

বিমল করের নায়ক-নায়িকারা যে শূন্যতায় ভোগে তা অবশ্যই বুদ্ধদেব বসুর নায়কের মতই একান্ত ব্যক্তিক এবং দার্শনিক। এমন শূন্য গহ্বর রচনায় বিমল কর বুদ্ধদেব বসুর সমগোত্রীয় হলেও বিমল করের নায়ক-নায়িকার ভাবনা অনেক বেশী আত্মার সংকট-তাড়িত। সে তাড়না তার ভিতর থেকে জন্ম-নেওয়া, বাইরের অভিঘাত সেখানে বেশী প্রকট নয়। 'ফানুসের আয়ু' উপন্যাসে নায়ক প্রথম পর্বে যখন 'তিতু' ছিল, তখন বাবা হেম ও দ্বিতীয় পক্ষ মিনুমাসীর সম্পর্কের অভিজ্ঞতায়, মাসির অদ্ভুত শাসনে-পীড়নে যে অভিজ্ঞতা হয়, তা তার আগামী দিনের শূন্যতা রচনার ভিত তৈরি করে। কিন্তু 'দ্বিতীয় পর্বে' তীর্থপতির যে একাকিত্ববোধ, নিঃসঙ্গতা, সংসার থেকে তীব্র বিষাদময় বিচ্ছিন্নতার ভাবনা, তা তার পারিবারিক সম্পর্ক থেকে নিয়ন্ত্রিত হলেও তার ব্যক্তিক সংকটের ছায়া-যুক্ত থাকে। তীর্থপতির যে নিঃসঙ্গতা, তার সূচনা সম্পূর্ণ পারিবারিক এবং স্বার্থসর্বস্ব পরিবারের মধ্যেই চিরকালের মানবিক সম্পর্কের নিস্ফলত্ব থেকে জন্ম নেওয়া, কিন্তু পরিণত মনে তার নিঃসঙ্গতা আর এক বিশাল শূন্য মাঠের মত ব্যাপ্তি পায়। 'সঙ্গ চাইলে সঙ্গী জোটে, বন্ধু আত্মীয়, প্রেমিকা তাও। এরা জীবনে শুধু জট পাকায়, বাঁধন বাঁধে—মুক্তিকে আগল দেয়। আসলে মুক্তি নেই, তুমি শুধু—তোমার, অন্য কেউ তোমার ভাগীদার হলেই, কিছুটা তার হয়ে যায়। তাকে যদি কিছু দাও, তবে তার হাতে আমার বাঁধনের একটা দড়ি স্বেচ্ছায় তুলে দেওয়া। তীর্থপতি তা দেবে না। সে মুক্তি চায় নিজের মত করে, সে নিঃসঙ্গতা চায় আত্মরক্ষার জন্য।' নায়কের এই ভাবনা সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভাবনা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথে ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা, এই ভাবনা একজাতীয় আত্মিক সংকট—মানুষকে শূন্যের দিকে ঠেলে দেয় অবধারিত ভাবে।

একান্ত পারিবারিক সম্পর্ক থেকেই গড়ে-ওঠা ভয় তিতুকে একা করে। এই একাকিত্ব নিয়েই সে একদিন ভালবাসার মধ্যে থাকতে চেয়েছিল, পায়নি। 'ভালোবাসার জন্যে এককালে কাঙ্গাল ছিল তীর্থপতি। ক্ষুধার্তের মতন খুঁজে খুঁজে মরেছে, তখন তীর্থপতি তিতু ছিল, পরে ভালবাসাও আর সহ্য হত না। তখন সে তীর্থপতি। মনে হত ভালবাসার একটা উদ্দেশ্য আছে। জড়াতে চায়, খর্ব করতে চায় তার ব্যক্তিত্বকে। এ চিন্তাই অসহ্য ছিল তার।' তীর্থপতির এই যে ব্যক্তিত্ব সচেতনতা, তা তাকে অহংমুখ করেছে, তা একান্ত পারিবারিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত, এর সামাজিক অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব

লেখক দেখান নি, কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা, ব্যক্তির স্বরূপ কথাসাহিত্যে বিমল কর সচেতন ভাবেই আনেন। বিমল কর তাঁর নায়কের উগ্রতম ব্যক্তিত্ব চেতনার সংগে জীবন ও মৃত্যু-ভাবনাকে সম্পৃক্ত করেছেন। বিমল কর যে শূন্যতার ভাবনা এনেছেন নায়ক-নায়িকা চরিত্রে তা দার্শনিক। তাই তীর্থপতির অন্তিম ভাবনা জন্ম-মৃত্যুর রহস্য-বিস্ময়েই স্থির থেকে যায়—'জীবনের প্রথম কোষ গঠন থেকে মৃত্যু সব সময় জীবনকে দাবি করেছে। আমরা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতে-পায়ে ধরে আয়ু ধার করে চলেছি। কেন কোন প্রয়োজনে? জীবন কিছু দেবে, মৃত্যু—যা দেয় না। জীবনে কি আছে আর মৃত্যুতে কি নেই—তীর্থপতি আজ আর তা বুঝতে পারছে না। তার জীবন তাকে এক কপর্দকও দেয় নি। মুক্তি না, ভালোবাসা নয়, শান্তিও না। কোন অর্থ সে উদ্ধার করতে পারেনি এই জীবন রহস্যের।'

এমন মৃত্যু সম্পর্কে এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বিমল করের যুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশে। 'সুধাময়' গল্প প্রসঙ্গে তারই জের টেনে লেখক নিজের মনোভঙ্গি প্রসঙ্গে বলেন, 'জীব-জগতে যেটা অবধারিত সত্য সেই মৃত্যু, আমার কাছে নিয়ত এক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল এবং জীবনের অস্তিত্ব, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, সৌন্দর্য, দেহ ইত্যাদি নিয়ে দেখা দিল সংশয়। ... 'সুধাময়' গল্পটি লেখার পর থেকে আমি কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ কোনো সান্ত্বনা। আমার লেখা তখন থেকেই ক্রমশ বিষণ্ন, একান্ত, হয়তো বা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। নিয়তিকে আমি স্বীকার করি না-করি, সে যেন কোথাও অজ্ঞাত, তার শক্তি যেমন অমোঘ, তার আগমনও আমার অজ্ঞাত, তবে তাহলে আজকের যে প্রাপ্তি, তার মূল্য কি, তার কতটুকু স্থায়িত্ব।' বোঝা যায় লেখক ব্যক্তিগত মৃত্যু অভিজ্ঞতা দিয়ে চরিত্রের মধ্যে যে সংকট সৃষ্টি ও আত্মসন্ধানের চেষ্টা এবং আত্মমুক্তির যন্ত্রণা দেখিয়েছেন, তা তাঁর দার্শনিক উপলব্ধিরই সন্নিহিত চেতনা। 'সুধাময়' গল্পে সুধাময়ের যে 'আনন্দ'-এর অন্বেষণ তা তার একান্ত ব্যক্তিগত, জীবন অন্বেষণ। লেখক-বন্ধু পরিমলকে সুধাময় লেখে—'মানুষকে পূর্ণতার পথে যেতে হয় এক একটা পথ দিয়ে। এই রকম পথকেই না বলা হয়েছে আনন্দ। সত্তার পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমি—আমার এই প্রেম সেই পূর্ণতা অনুভব করা-আনন্দ তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার সব দ্বন্দ্ব মিটেছে। আর কোন সংশয় নেই।' এমন কথা লেখে তখনি, যখন রাজেশ্বরী সরে গিয়ে স্যানাটোরিয়ামে তার সামনে আসে হৈমন্তী এবং হৈমন্তীর মধ্যে সে পায় গভীর মুক্তির দিক।

সুধাময়ের জীবনের মধ্যে যে বোহেমিয়ানিজম ছিল তা তার শূন্য জীবনের দিক, তাকে ভরতে চেয়েছিল রাজেশ্বরী। রাজেশ্বরীর মধ্যে তার ভালবাসাকে অন্বেষণ, আর হৈমন্তীর মধ্যে ভালবাসাকে পাওয়ার আর্তি। কিন্তু যে সুধাময় সমস্ত শূন্যতা থেকে সরে এসে পূর্ণতার জন্য আকাঙ্খিত—সে শেষে হৈমন্তীর মধ্যে পাওয়া ভালোবাসার মধ্যেও পূর্ণ আনন্দকে পায় নি। হৈমন্তীর সকরুণ মৃত্যু তাকে আর এক বড় জীবন-গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে বলেই লেখক-বন্ধু পরিমলকে তার শেষ চিঠিতে জানায়—'রাজেশ্বরীর মধ্যে তার দেহের বাইরে আলোর ভুবন খুঁজেছিলাম, পাইনি। হৈমন্তীর মধ্যে তার মনের আলোময় অস্তিত্ব অনুভব করে সারবস্তু পেয়েছি—ভেবেছিলাম, কে জানত—তার দেহের সংগে এত গভীরভাবে সে অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। আমার

ভালবাসা অন্ধকারের মতন, প্রদীপের কাছে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আলোকিত, একে ভালোবাসা বলি না। যে আনন্দ এত চঞ্চল, ভঙ্গুর—সে আনন্দ মিথ্যে।' সুধাময় সেই দার্শনিক শূন্যতাতেই তার জীবনের সীমা চিহ্নিত করে রাখে।

বিমল কর 'অশোক কানন' গল্পে বেশ্যা নায়িকা শোভনার গভীর অবচেতনার জগতে যে শূন্যতা রচনা করেছেন, তা তার ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধির শূন্যতা। তার অন্য মা দুর্গা ও কলকাতার স্বরূপামাসি ইত্যাদির কাছে পাওয়া যে একাধিক তিক্ত জীবন-অভিজ্ঞতা—এসবই তার মনের গভীরে লোকটিকে নির্মাণ করলেও শোভনার পরিণত মনে তার একটি একান্ত নিজস্ব অনুভূতির জগত থাকে। সে জগত অনেকটা অসুস্থ জগতের মত। তারই জন্যই পাশের ঘরের প্রতিবেশিনী বেলা বুড়ির ছেলে—যার বয়স শোভনার থেকে বছর চারেকের কম, তাকে নিয়ে যেমন রাত কাটাতে দ্বিধা করে না, তেমনি তার এক অ্যালুমিনিয়াম কারখানার চাকুরে স্বামী অমলকান্তি বাইরে থাকলে প্রফুল্ল দাশ ইত্যাদির মত একেবারে অপরিচিত একাধিক পুরুষকে অতি সহজেই শয্যাসঙ্গিনী করতে দ্বিধা করে না। শোভনার যে শূন্যতাবোধ তা তার বেশ্যাবৃত্তির সংগে যুক্ত জটিলতম মনস্তত্ত্বের হতে পারে, কিন্তু এমন অসুস্থ শূন্যতাকেই গল্পের বিষয় করেছেন লেখক। শোভনার ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গ উপলব্ধির মধ্যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য—'আমার মনে হল, আমি বড়-একা। এই একাকিত্ব, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমার মনে হয়, মানুষ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তার চোখের সামনে অজ্ঞাত এক পরলোকের যবনিকা নড়ে. এবং ইহলোক পরিপূর্ণভাবে ধুয়ে মুছে যায়—মায়া মোহ আসক্তির চেতনা তার বিন্দুমাত্র থাকে না—তখন সেই সন্ধিপথে দাঁড়িয়ে হয়ত এই রকম অবর্ণনীয় একাকিত্ব বোধ করা সম্ভব। অতীতকে না ভুললে, ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের পারাপারহীন সমুদ্রসম না ভেবে নিলে কোনো মানুষের পক্ষেই তার নিঃসঙ্গতা অনুভব করা সম্ভব নয়।' শোভনার এই নিঃসঙ্গতা সংসার করায় না, সংসার ভাঙে, জীবনকে এমন এক বীভৎস বিকৃত মুক্তির মধ্যে নিয়ে যায় যা তার এক বন্ধনের মতই। শোভনা বাংলাদেশের পাঁচের দশকেরই সংসার ও সমাজ জীবনে একটি ভীষণভাবে পোড় খাওয়া মেয়ে, কিন্তু উপলব্ধিতে তার বলিষ্ঠ জীবন মরণের থেকে বেশ্যার মনোবিকলনজাত এক প্রতিক্রিয়ার চরম শূন্যতা, জীবন ক্ষয়ের দিক সত্য হয়ে আছে। তার শূন্যময় পরিণতি এক বিকৃতির স্বাক্ষর—'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কোন এক অজ্ঞাত রাক্ষস আমায় তার বন্দিনী করে রেখেছে। মাঝে মাঝে সে আসে। আমি তার ভয়ে এত ভীত কণ্টকিত হয়ে থাকি যে অসম্ভব মনে হয়, কেউ তখন আমার পাশে থাক—আমার স্পর্শের মধ্যে।'

সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসের নায়ক এক গভীর আত্মিক সংকটে ভুগে এক সময় তার নায়িকা নীতাকে নিজে হাতে খুন করে। বীরেশ একালের এক জীবন অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নায়ক। কিন্তু এই নায়ক উপন্যাসের শেষে তার বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে চায়, অস্তিত্বহীন জীবন-নিহিত আত্মার সুস্থ জীবন মুখীন পরিশীলন চায়।

উপন্যাসের শেষে নায়ক দক্ষিণেশ্বর থেকে একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে এক সময় ফিরে এসেছে নীতার ফ্ল্যাটে, নীতার বিছানার কাছে। যাকে সে খুন করেছে অতি সচেতন ভাবেই, তার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন লেখক নায়ককে। নায়কের এই ফিরে আসা জীবনের কাছেই প্রত্যাবর্তন। প্রেম মানেই জীবন। নীতার প্রেষ 'সত্য-ভাষণে' ধরতে চেয়েছেন,

পায়নি। সত্য নেই, ছিল না তখনো। তবু নায়কের আকাঙ্খা, আর্তির শেষ নেই, সে চিরকাল তার জন্য বুঝি অপেক্ষাই করে যাবে। তাই নায়কের ভাষায় নায়কের শেষ চিত্র—'আমি হাতটা নামিয়ে, খাটের কাছে নিচু হলাম। নীতার সেই একটি গান, যেটা ওর খুব প্রিয় ছিল, বাংলা করলে, তার মানে, 'ক্যাকটাসের বুকে ইতিমধ্যেই রোদ পড়েছে,' আমার মনে পড়ল, যেন শুনতে পেলাম, ও গুন গুন করছে।' নায়কের এমন ভাবনা বিশুদ্ধ, সত্য-জীবনের, প্রেমের ব্যক্তিক অস্তিত্বের সংকটমুক্ত অবস্থার জন্য আর্তি। এই ব্যঞ্জনাঘন আর্তি দিয়ে যেভাবে সমরেশ বসু উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন, তাতেই 'বিবর'-এর সর্বোচ্চ নৈতিকতার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এখানেও সেই অস্তিবাদী দর্শনের স্বীকৃতি।

সমরেশ বসুর 'সংকট' উপন্যাসে কয়েকটি বেকার, আধা বেকার, ব্যবহারিক জীবনে অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট, অনিশ্চিত জীবন-ভাবনায় শংকিত আড্ডাবাজ যুবকদের আত্মিক যন্ত্রণার কথা বলা হয়েছে। একালের যে কোন প্রত্যয়, মূল্যবোধ এদের কাছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বিষয়। যুগকে, সময়কে, সমাজকে অস্বীকার করাই তাদের স্বভাব ও মনের বিশিষ্টতা। এই অবস্থায় আসে একটি যুবতী রমণী ওদের সান্নিধ্যে, আসে দলের অন্যতম বন্ধুর মত, কিন্তু একজনের সে প্রেমিকাও বুঝি। হঠাৎ মেয়েটির অন্তর্ধান, পাশবিক অত্যাচারে মৃত্যু, তাকে ভোগ করতে না পারায় এবং তাদেরই অপরিচিত কেউ সে কাজটি করায় অন্য মাস্তান দলের অনুশোচনা, পুলিশী সক্রিয়তা—এসবের মধ্যে উপন্যাসে এক বিচ্ছিন্নতা-বাদে রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। আসল দোষীকে ধরার কোন বালাই নেই। এসবের মধ্যে আসে ছেলেদের পরিচিত এবং সত্যিকারের শ্রদ্ধেয় এক চৈতন্যদা। চৈতন্যদার একটি জিজ্ঞাসা ঃ

'শহরটা কী রকম নিজেদের নিয়ে সুস্থতায় স্বাভাবিক তাই দেখেছি। তোমরা, তোমরা কী করেছো ? বোলডারের ভয়ংকর শব্দ শুনেছো ?

'কিসের বোলডার চৈতন্যদা ?' গোগো জিজ্ঞেস করলো।

চৈতন্যদা বললেন, 'বোলডার অফ সিসিফাস। কী রকম সবাই সবাইকে নিয়ে ব্যস্ত, তাদের কানে কিছুই যাচ্ছে না। উই আর দ্য জেনারেশন উইদাউট টাইজ, উইদাউট এনি হরাইজন। সাত্র্-এর সেই কথাটিও আমার মনে পড়ছে, হোয়াট হ্যাভ য়ু ডান উইথ ইয়র হিউম্যানিজম্ ? হোয়াট ইজ্ ইয়র ডিগনিটি এ্যাজ এ থিংকিং রীড ?'

'পাওয়ার ইজ দ্য লাস্ট ওয়ার্ড চৈতন্যদা।' তিমির বললো, 'বাকী সব মিথ্যা। পাওয়ার ইজ থিকার দ্যান পিপলস ব্লাড। পিপলস হরাইজন ইজ এ্যান এ্যাবিশ।' সমরেশ বসুর চরিত্র যে মূল প্রশ্নে চলে আসে, সেখানে, আশির দশকে বসেও বুঝি,— আমাদের সাহিত্যে সার্ত্র্-এর অস্তিবাদী দর্শন-ভাবনা কিভাবে শিল্প-সার্থকতায় প্রযুক্ত হয়েছে।

মতি নন্দীর 'নক্ষত্রের রাত' উপন্যাসের নায়ক বিশু অবশ্য নায়িকা রমার সংগে তার প্রেম-জীবনের পূর্ণতার পথে বাধা হিসেবে যা পায়, তাতে তার শূন্যতা বিমল কর বুদ্ধদেব বসুর নায়কদের মত মানসিকতা তৈরি করে না। মতি নন্দী ও দেবেশ রায়ের নায়কদের সমস্যা প্রধানত সমকালের অর্থনৈতিক-সামাজিক। এই সচেতনা, লেখকদের সচেতন কাল-ভাবনার সংগে যুক্ত। এই ভাবনার সংগে বরং 'বিবর'-এর নায়কের ক্ষীণ,

যোগ দেখানো যায়। 'নক্ষত্রের রাতে'র বিশুর যে অসহায়তা, হতাশা, ভালবাসা থেকে সরে আমার মত মানসিকতা গঠনে শূন্যতাবোধের সূচনা, বা 'বেহুলার ভেলা' গল্পের প্রফুল্ল-অমিয়ার সংসার-ভাবনার সূত্রে যে হতাশা ও শূন্যতায় শ্বাস ফেলা—তা সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায় রচনায় স্পষ্ট। দেবেশ রায়ের 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পের গোপালের যে আত্মহনন তারও সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল নয়।

'বেহুলার ভেলা' গল্পেও সেই অস্তিত্বের সংকট, সমস্যা ও রক্ষার কথা। একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার যেন একটা টাল মাটাল খাওয়া বহুদিনের পরিত্যক্ত জীর্ণ বেহুলার ভেলাই—তার ওপর অর্থনৈতিক চাপ একটু বেশী পড়লেই ডুবে যেতে পারে, সমাজের একেবারে নীচের তলায় বেহুলার ভেলার বিলুপ্তি ঘটতে পারে। এমন সংসারের কর্তা প্রমথ একদিন সংসারের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের কথা, তাদের মমতাময় স্নেহ সম্পর্কের গূঢ় মানবিক-বোধেই কঠিন অভাবের মধ্যে মাংস কিনে নিয়ে আসে। স্ত্রী অমিয়ার সাংসারিক হিসেবী দৃষ্টিতে এমন অপব্যয় চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি করে। কিন্তু 'ওরা যাই বলুক প্রমথ লক্ষ্য করছিল চোখগুলো। ঝিকোচ্ছে বরফ কুচির মতো। ওরা খুশি হয়েছে ব্যাস, এইটুকুই তো সে চেয়েছিল, তা না হলে মাসের শেষ শনিবারে একদম পকেট খালি করার মতো বোকামি সে করতে যাবে কেন।'

মতি নন্দী এই গল্পে পাঁচের দশকের বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিবেশে নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের ভিতরের ক্রোধকে এবং সেই সংগে অসহায়তাকে অদ্ভুত বাস্তবতায় ধরতে চেয়েছেন। প্রমথর ভাবনাও তাই। —'মানুষকে যেন একটা কামার তাতিয়ে তাতিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে বিরাট একটা ভারী হাতুড়ী দিয়ে। সুখ নেই, স্বস্তি নেই, হাসি নেই, সুখ নেই।' বহু ছোট-খাটো স্পষ্ট স্বার্থযুক্ত সংসারের পক্ষে একান্ত ব্যবহারিক মানসিকতার মধ্যেই একটি শহরে মধ্যবিত্ত সংসার গড়ে ওঠে, স্থিতি পায়। জোড়াতালির মত মনে হলেও এই গড়ে-ওঠা, স্থিত-রূপ বস্তুত মধ্যবিত্ত মানুষের কিছুটা কাম্য, কিছুটা শান্তির জায়গা। অমিয়া-প্রমথর সংসারে এমনভাবেই সাম্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিরূপতা দানা বাঁধে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। মেয়ে পুতুলকে বাইরে একা যেতে দেওয়ার আপত্তি তোলে মা অমিয়া। সংঘর্ষ বাধে প্রমথর সংগে :

'চুপ করব কেন। আমি অন্যায় কথা বলেছি? মেয়েকে কেন তুমি ছেড়ে দিতে চাও একটা পরের ছেলের সংগে, তা কি বুঝি না ভেবেছ।

চোখে চোখ রেখে ওরা তাকাল। অমিয়ার চাউনি কসাইয়ের ছুরির মতো শান দিচ্ছে। মাংসের খোলা হাঁড়িতে চোখ পড়ল প্রমথর, থক থক করছে যেন রক্ত।

—কি বুঝেছ তুমি, বল কি বুঝেছ?

দুহাতে অমিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল প্রমথ। খোঁপাটা খুলে পড়ল। চোখ দুটো মরা পাঁঠার মতো ঘোলাটে হয়ে এল, ঠোঁট কাঁপিয়ে অমিয়া বলল, তুমি আমার গায়ে হাত তুললে।'

গল্পটির সবশেষে আছে সংসারী দম্পতির পরস্পরের অন্তরঙ্গতা ও করুণ অসহায়তার ছবি। পুতুলের বিয়ের ব্যবস্থা, চাঁদুর যা হোক একটা চাকরীর যোগাড়, রাধুর আই-এ-পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা—এ সব পুত্র-কন্যা-সম্পর্কিত ভাবনার সূত্রে দুজনে চলে আসে সংসারের ভেঙে-পড়া, টাল-মাটাল অর্থনৈতিক দুর্ভাবনার মধ্যে। এই ভাবনাই

তাদের আরো কাছের করে। প্রমথর কথায় সেই ভাবনার গভীরতর এক আর্ত-স্বর ভেসে ওঠে, একটা শ্বাস যেন ভাগ্যের আসন্ন অন্ধকারের মধ্যে জমাট বেঁধে স্থির হয়ে যায় :

'জানো অমি, আমরা কেমন যেন হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে আমি আর ভালবাসি না, বোধ হয় তুমিও বাস না। তা না হলে তোমার মনে হবে কেন আমি তোমার গায়ে হাত তুলতে পারি। অথচ সত্যি সত্যি তখন ইচ্ছে হয়েছিল তোমার গলা টিপে ধরি, আসলে আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছি, বিষাক্ত হচ্ছি। জানো অমি, মনে হচ্ছে এই পৃথিবীটাই মরে, পচে, ফুলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে আমরাও এই মরাটাকে আগলে বসে নিজেদের বিষিয়ে তুলছি।

অমিয়ার পিঠে হাত রাখল প্রমথ। খসখসে চামড়া, মাংসগুলো ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে, মেরুদণ্ডের গিঁটগুলো হাতে আটকাচ্ছে। মুখ তুলল প্রমথ, যে কটা তারা দেখা যায়, সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, কেঁদো না, মরে গেলেই মানুষ কাঁদে, আমি কি মরে গেছি।

তারপর ওরা বসে রইল অন্ধকারে কথা না বলে।'

স্বাধীনতা উত্তরকালে পাঁচের দশকের শেষ দিকেও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় যে চরম বিপর্যস্ত রূপ ছিল, যার প্রভাব ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারে সবচেয়ে বেশি, সেই প্রেক্ষাপটে প্রমথর যে উপলব্ধি, এই উপলব্ধি চরম হতাশার, শূন্যতার, সব কিছু হারিয়ে ফেলার মত হবেই, তা বোঝা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দগ্ধ সমাজরূপ ও অনিশ্চিত অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে-ওঠা মানুষ প্রমথ। মতি নন্দী এই গল্পে কালকে শহরে মধ্যবিত্ত মানুষের আত্মিক সংকট ও উপলব্ধির সংগে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করেই অবক্ষয়ের প্রতীকী বক্তব্য রাখতে পেরেছেন 'বেহুলার ভেলা' গল্পে।

বাংলা কথাসাহিত্যে দেবেশ রায় মতি নন্দীর সমকালে আবির্ভূত হয়ে কলকাতার সেইরকম এক মধ্যবিত্ত বেকার নায়ক নিয়েছেন তাঁর 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পে। এর মধ্যে নায়কের বাঁচার জন্য যাবতীয় অস্থিরতা, যন্ত্রণা ও হতাশা তাকে এক চরম গভীর শূন্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ গল্পে গোপাল যেন সেই হাজার বছর আগের বাংলা দেশের রাজা গোপালদেবের বংশধর, যে সেই সময়ের বৃহত্তর শক্তির মতই বিশ শতকে কলকাতা নামক এক জটিল শহরের মাৎস্যন্যায়ের মধ্যে পড়ে ক্রমশ পরাজয়ের গ্লানিকে, জীবন-যুদ্ধের হতাশাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। গোপালের মনের বৈশিষ্ট্য হল—'অন্ধকারের সঙ্গে গোপাল পরিচিত। চিরকালই গোপালের মধ্যে একটা খুব গভীর বিষণ্নতা কাজ করে। সেটা কেউ তো বুঝতে পারেই না, সবচেয়ে কম বুঝতে পারে সে নিজে। নিজের গভীর বিষণ্নতায় সে এটা অনুভব করত যে তার এই পরিবারটায় এমন অনেক সমস্যা আছে যা এই মুহূর্তে তাকে পরিবার ছাড়া করতে পারে।'

এমন এক মধ্যবিত্ত পরিবারে গোপাল থাকে, যার সমস্যা গোপালের মত সচেতন যুবককে অসহায় করে তোলে। চাকরী পেলেও দেবেশ রায়ের নায়কের মনে যে সংশয়, তা মতি নন্দীর 'নক্ষত্রের রাত' উপন্যাসে নায়ক 'বিশ্ব'-র মধ্যেও দেখেছি। মতি-নন্দীর নায়ক বিশ্ব এই অনিশ্চয়তা ও হতাশায় প্রেমের বিশুদ্ধ আশ্রয়ে যেতে পারছে না, দেবেশ

রায়ের নায়ক গোপাল শহরে পরিবারের অর্থনৈতিক ও সেই সূত্রে নানান সমস্যার মধ্যে নিজেকে যুক্ত করতে পারছে না। ক্রমশ চরম হতাশায় শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে দেবেশ রায়ের এই গল্পের নায়ক খুঁজেছে আত্মহননের উপায়। গোপাল চলে আসে গড়িয়াহাটে ব্রীজের ওপরে। সেখানে সে আর তার নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কিছু ছিল না তার পাশে। অসম্ভব ক্লান্ত গোপালের শেষ মুহূর্তের মানসিকতার স্বরূপ বোঝাতে লেখক লিখেছেন—'কলকাতা, আছ। আমি একা নই। আমি কলকাতার নই। প্রায় নিদ্রিত গোপাল রেলিং ধরে দাঁড়াতেই ট্রেনটা এসে গেল।

ওভারব্রীজের রেলিঙ ধরে যখন গোপাল ঝুঁকে পড়েছে, তখন, ওভারব্রিজ আর মাটির মাঝখানে শূন্যতার মধ্যে পড়ে যাবার ঠিক পূর্বের হ্রস্বতম মুহূর্তে সে ভেবেছিল— 'আমার মরার কোন মানেই হয় না।' আর এই বাক্যটা পুরোপুরি উচ্চারণ করতে পারার আগেই ইঞ্জিনের ধাক্কায় সে চাকার তলায় চলে গিয়েছিল। বেকার শহরে মধ্যবিত্ত যুবকের যন্ত্রণার মুক্তি ঘটিয়েছেন লেখক নায়কের সচেতন স্বেচ্ছাকৃত আত্মহননে। বাংলাদেশের পাঁচের দশকের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চরম হতাশার পরিবেশে দেবেশ রায় কোন সুস্থ ভবিষ্যৎ খুঁজে পান নি। আশার ক্ষীণতম আলোটুকু দেখাতে পারেন নি আমাদের।

দেবেশ রায়ের 'যযাতি' উপন্যাসের তিন চরিত্র গিরিজামোহন, রেণু ও গিরিজামোহনের ছেলে যে খোকার সম্পর্কের শূন্যতা, তা তাদের ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতাবোধকেই তুলে ধরে। খোকা একসময়ে বাবা-মা-র সম্পর্ক, সংসার ছেড়ে চলে এসে ভাবে. 'মানুষ মানুষে মানুষে যেন এক না হয়। আমি তাহলে নিজেকেও ছাড়াতে পারবো না,—আমার যে নিজের কাছ থেকে সরে যাওয়া বড় দরকার। আমি একটু একলা হতে চেয়েছিলাম। একেবারে একলা। কিন্তু সব ছেড়ে এসেও তো একলা হতে পারছি না। ভেতরে-ভেতরে স্মৃতি। আমার এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্মৃতি। আমার এই অস্তিত্বে স্মৃতি। স্মৃতিকে আমি সইতে পারি না। স্মৃতিকে আমার বড় ভয়।' দেবেশ রায়ের নায়ক এক বিচ্ছিন্নতাকে মানে. আর এক অস্তিত্বকে স্বীকার করে। গিরিজামোহন ও খোকার সম্পর্ক-নির্ণয়ের মূলে থাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার, জীবনের একটা মানে খোঁজার, নতুন প্রজন্মের অর্থ করার গভীর উপলব্ধি ঃ

'আমার যৌবন আমি তোমাকে দিয়ে এসেছি গিরিজামোহন, তোমার উত্তরাধিকার আমি স্বীকার করি না। আমার উত্তরাধিকার তোমাকে স্বীকার করতে হবে। আমারই ধার দেয়া যৌবনের শক্তিতে তোমার প্রতিটি ক্ষণ আর ঘণ্টা, দিন আর মাস আর বছর কাটাতে হবে। আমার এই যৌবনের রক্তগতি বইবার ক্ষমতা তোমার স্নায়ুর শিরায়-উপশিরায় কতোদিন থাকবে, তারপরও কি তোমার যক্ষিণী ঐ পাহাড় বইতে পারবে ?

সেদিন তোমার বায়ুভূত আত্মা এক অঞ্জলি জলের জন্য আর্তনাদ করলেও তর্পণের জল বইবার শক্তি আমার থাকবে না। আমার এ যৌবন তোমাকে মারুক, নিঃশেষ করে করুক। তোমার সেই মৃত্যুতে বোধহয় আমাদের দুজনেরই তর্পণ।'

'জীবন যে রকম' উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নায়ক যুদ্ধ শেষের পরবর্তী আরেকটা সময় কাটিয়ে এসে যেন নতুন করে জীবনের মানে খোঁজে প্রেমে, এক যুবক-যুবতীর প্রেম-সম্পর্কে সহজ, সরল, সচ্ছল উৎসাহ উদ্দীপনায়, আন্তরিক স্বীকারোক্তিতে নায়ক দীপু সুস্থভাবে বাঁচার দাবিতেই নায়িকা শান্তার কাছে সমস্ত বাধা তছনছ করে

চলে আসতে পারে অবলীলায়। এই লেখকের 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসের নায়কের ছিল বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষণ্ণতা, 'জীবন যে রকম'-এর নায়ক দীপুর আছে জীবনের অস্তিবাদী ভূমিকার দিকে নতদৃষ্টি ঃ

'শান্তা দীপুর দিকে ফিরে ভ্রুভঙ্গি করে বললো, তুমি যদি আর একটা দিনও দেরী করতে আমি আর জীবনে তোমার মুখ দেখতাম না।

দীপু বললো, আমার আসার আর একটা কারণও ছিল। সেটা শুনলে তুমি বোধ হয় রেগে যাবে। তুমি রামায়ণ পড়েছো? লঙ্কার সীতাকে উদ্ধার করার পর রাম কি বলেছিলেন তোমার মনে আছে?

—পড়েছি ঠিক মনে নেই।

— কথাগুলো আমারও ঠিক মনে নেই, তবে অনেকটা এই রকম। রাম বলেছিলেন, 'হে জানকী, তুমি ভেবো না, শুধু তোমাকে উদ্ধার করার জন্যই আমি এত বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছি। ও নিয়ে কোন অহংকার করো না। আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি আমার কর্তব্যের জন্য, আমার পুরুষকার প্রমাণ করার জন্য। ···সেই রকম আমিও যখন বুঝতে পারলাম, মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে আমার অধিকার রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে, তক্ষুনি মনে হলো, আগে তোমাকে উদ্ধার করা দরকার। তোমাকে না পেলে আমি সব কিছুতেই ব্যর্থ হয়ে যাবো।

শান্তা হাসতে হাসতে বললো, আমি তো অশোকবনে বন্দিনী ছিলাম না, আমি নিজেও ইচ্ছে করলে— —

এই সময় ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামলো, একটা হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল রাস্তায়। লোকজনেরা ছুটে গেল গাড়ি বারান্দার তলায় কিংবা দোকানের ঝাঁপের নিচে। ফুটপাতের হকাররা তাদের জিনিসপত্র সামলাতে ব্যস্ত। এক ঝাঁক পায়রা যে দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ বৃষ্টির ঝোঁকে তারা ঝটপট করে ডিগবাজি খেয়ে দিক বদলে ফেললো। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দীপু আর শান্তা থামেনি। ওরা নিজেদের মধ্যে তন্ময় হয়ে কথা বলতে বলতে বৃষ্টির মধ্যেই হেঁটে যাচ্ছে।'···

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণ পোকা'র নায়ক শ্যামের আছে প্রবলতম বিচ্ছিন্নতাবোধ। সে সমস্ত রকম এশ্‌টাব্লিশমেন্টের বিরোধী একটি চরিত্র, সে তার দেশ কাল সময়ের নায়ক। এই নায়কের সমস্ত যন্ত্রণা, অসহায়তা, হতাশা, আলস্য, শূন্যতাবোধ— এসবের শেষে যে কথাগুলি যেনবা অবচেতন মনের গভীরে স্বপ্নের মত ভেবে যায়, সে সবে ব্যক্তিসত্তার আর একধরনের আত্মগোপন-প্রবণতা থাকলেও, তার জীবন খোঁজে অস্তিত্ব রক্ষার মূলকেই ঃ

'অস্বচ্ছ চোখে ভিড়ের মধ্যে এক আধটা চেনা মুখ খুঁজে বেড়ায় শ্যাম আঃ সোনা-কাকা। রাঙাপিসি, মানুমামা! আমি মনু, আমি তোমাদের মনু—জন্ম নেওয়া বড় কষ্টকর, তবু তোমাদের জন্যই এই দেখ আমি আর একবার জন্ম নিচ্ছি···ভালবাসা যে কত কষ্টের তা জানে আমার মা, তবু আমি সেই কষ্ট বুকে করে নিলুম···শীগগীরই আমি সুসময় নিয়ে আসছি পৃথিবীতে···অপেক্ষা করো···

বড় মায়ায়, বড় ভালোবাসায় ধুলোমাটির মধ্যে মুখ গুঁজে দেয় শ্যাম।'

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ে শ্যাম চক্রবর্তী যেখানে এসে শেষ করেছে নিজের ভাবনাকে,

লেখক সেখান থেকে সরে আসেন তাঁর 'পারাপার' উপন্যাসে ললিত চরিত্রের ভাবনায়। ললিতও ছিল অসহায়, নিরাপত্তাহীন, আত্মকেন্দ্রিক, আত্ম অস্তিত্বের মূল্য অন্বেষণে বিশেষ-তৎপর। প্রেম, সাংসারিকতা, বন্ধুত্ব, সমাজ সম্পর্ক—সমস্ত সূত্রেই তার ছিল আত্ম-অস্তিত্বের মূল অন্বেষণ-প্রয়াস, কিন্তু উপন্যাসের শেষে সে বরণ করে সুস্থ জীবন অস্তিত্বকে :

'মৃত্যুর কথা ভাবলেই পৃথিবীর প্রতি মায়া-দয়া বেড়ে যায়। অন্তরে অন্তরে ললিত মানুষের প্রতি জীবজগৎ ও গাছপালার প্রতি এক দুর্বোধ্য ভালোবাসাকে অনুভব করে। এ রকম ভালবাসা সে কখনো টের পায়নি। একদিন সে যখন মানুষের মুক্তির কথা বলত, বিপ্লবের রাস্তা তৈরী করতে ব্যস্ত থাকত—তখনও না। তার মরে যেতে ইচ্ছে হয় না। সে ভাবে, এ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সে একটা কিছু করে যাবে। খুব শীগগীরই করবে। মরে যাওয়ার আগেই।

কিন্তু মরেই কি যাবে ললিত। মাঝে মাঝে এর উত্তর সে খোঁজে শাশ্বতীর মুখে। শাশ্বতী সুন্দর হাসে। নিশ্চিন্ত মুখখানা। যেন সে নিশ্চিত বুঝে গেছে যে ললিত বেঁচে থাকবে—অসুখ সেরে যাবে।

মাঝে মাঝে সে মায়ের দিকেও চেয়ে থাকে। কাঠকুড়নীর মতো কোলকুঁজো মা ঘরের কাজ সারছে। খুট্‌খুট্‌ করে ইঁদুরের মতো শব্দ করছে ঘরময়।

কেমন ছিল মায়ের সেই বয়সের চেহারা যখন ললিত ছিল তার কোলে?

কে জানে। ললিতের কেবল ইচ্ছে করে আর একবার শিশু হয়ে এই মায়ের কোলে ফিরে আসতে। মাকে আরো কত ভালবাসার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু আচমকা ফুরিয়ে গেল বেলা।'

জীবন-ভাবনা ও মৃত্যু চিন্তা দু'য়ের বৈপরীত্যে ললিতের হতাশা তার তীব্রতম জীবন কামনার প্রধানতম দিককেই বিম্বিত করে।

দিব্যেন্দু পালিতের 'সম্পর্ক' উপন্যাসেও সেই অস্তিত্ব রক্ষার যন্ত্রণা, অসহায়তাবোধে একাকিত্বে আত্মমুখ হওয়ার প্রয়াস দেখি এর বয়সে পঞ্চাশ-উত্তর-এক বড় কোম্পানির উচ্চমানের একজিকিউটিভ রামতনুর অন্তিম পরিণতিতে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক রচনাই তো বাঁচার শর্ত, সম্পর্ক স্থিত করার প্রয়াসেই তৈরী হয় অস্তিত্বের দলিল। সম্পর্ক সামাজিক হতে পারে, ব্যক্তিকও। ব্যক্তি সম্পর্কের অ-সম বয়সীর প্রেম-ভালবাসা সামাজিক ন্যায়-নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে অন্য অবয়ব পাওয়ার সুযোগ থেকে যায়। মানুষের বিবেক যেমন সাংসারিক ও সামাজিকতায় একরকম, তেমনি এসব থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে একান্ত ব্যক্তিগত গূঢ়-গোপন বাসনা-কামনায় তা মুক্ত থাকতে চায়। স্ত্রী মৃদুলা, পুত্র সুবীর, পুত্রবধূ, কন্যা—এদের বন্ধন থেকে রামতনু আর এক টুকরো নীল আকাশ খুঁজে পায় তুলনায় যথেষ্ট অল্পবয়সী নীরা নায়ারের মধ্যে। জীবনের এমন মূল্যবান একদিক তীব্র আঘাতে চুরমার করে রামতনুর সাংসারিক পরিবেশ, নায়ক ক্ষত-বিক্ষত হয় ব্যক্তিক ও সাংসারিক বিবেকের তাড়নায়। জীবনযাপনের মূল্যায়ন আর জীবন ধারণের প্রয়োজন—দু'য়ের মধ্যে থেকে রামতনু একসময়ে নিজের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্থির, নিবিড় :

'ভাবনাগুলো ক্রমশ স্থির ক'রে আনল রামতনুকে। এই আহত, ভঙ্গুর সম্পর্ক নিয়ে আবার ওই বাড়িতে ফেরা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। দিনে দিনে বিশাল করে গড়েছিলেন

সবকিছু, যাদের জন্য এই আয়োজন তারাই ভোগ করুক, তিনি ফিরবেন না। বয়স হ'লেও এখনো তাঁর কিছু আছে, অখ্যাতি ও আঘাত সত্ত্বেও তার কর্মক্ষমতায় এতোটুকু টান পড়েনি। উদ্বৃত্ত রসদ নিয়ে কেটে যাবে বাকি জীবন—একান্তে নির্জনে।

অসম্ভব ফাঁকা লাগছিল রামতনুর, গভীর শূন্যতাবোধ তাঁর চিন্তার ওপর ধোঁয়ার মতো আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করছিল। একই সময়ে এক ধরনের জ্বালা তিক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল মনে।

তারপর, যতো সময় গেল, দুঃখ ও বেদনা ছাড়িয়ে ভীষণ তিক্ততা তাঁর মনের সবটুকু অধিকার ক'রে নিল। কেন নির্বাসন। ভাবলেন রামতনু। প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও যাদের চিন্তা নীরার প্রতি তাঁকে এতোদিন প্রতিহত ক'রে রেখেছিল, নীরাকে ঘিরে নিষেধের আড়াল রেখেছিলেন তিনি, তারাই আজ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তাহ'লে আর বাধা কোথায়। এখন তিনি যথেচ্ছ হ'তে পারেন, নিছক বন্ধুত্ব ও সঙ্গসুখ আরো ঘনিষ্ঠতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সবই পারেন ইচ্ছেমতো, কোন আড়াল না রেখে। লোকচক্ষু? আর তো লজ্জিত হবার কিছু নেই। বিবেক? আমিই পৃথিবীর একমাত্র বিবেকবান নই। ধর্মাধর্মের কথা ভেবেছি ততোদিন, যতোদিন এ সবের প্রয়োজন ছিল। এখন আমি নিন্দিত, ধিক্কৃত, জঘন্যতম মানুষ, স্বামিত্ব বা পিতৃত্ব যার কাছে একটা খোলস মাত্র। এখন আমি নিজের কথা ভাবতে পারি।'

রামতনুর সর্বশেষ উপলব্ধি তাকে একা করে। ছেলের কাছে পাওয়া অপমানবোধ, স্ত্রী মৃদুলার কাছ থেকে পাওয়া তাচ্ছিল্য, সবশেষে যার জন্য তার এত দিনের দ্বিধা, আকর্ষণ, যন্ত্রণা, অস্থিরতা, সেই নীরা নায়ারের কাছ থেকে নির্মম প্রত্যাখ্যান রামতনুকে এমন এক বোধের জগতে নিয়ে যায় যেখানে সে একালের, এ সময়ের এক বিচ্ছিন্ন নায়ক—যে বিচ্ছিন্নতা বিশাল শূন্য পরিত্যক্ত কোন মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা পত্রপুষ্পহীন পরিত্যক্ত বৃক্ষের মত ঃ

'এখন তাঁর কোথাও যাবার নেই, কিছু করার নেই। গাড়ি চালাতে চালাতে পাশ দিয়ে অনর্গল ট্যাক্সি, মোটর, বাস ছুটতে দেখলেন চতুর্দিকে সরব ব্যস্ততা, আত্মমগ্ন জনস্রোত—এ সবের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। জীবনের একটি বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ ক'রে এখন তিনি একা, সম্পূর্ণ একা।'

আনন্দ বাগচীর 'চাঁদ ডুবে গেলে' উপন্যাসের নায়ক জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কোথাও বুঝি সূক্ষ্ম আত্মীয়তা থেকে যায় দিব্যেন্দু পালিতের রামতনুর। জ্যোতির্ময় রামতনুর মত পঞ্চাশোত্তর নয়, তবু মধ্যবয়সী এই নায়ক কখন যেন চারপাশের উচ্ছল জীবন যৌবনের, এই প্রজন্মের তরুণ তরুণীদের উদ্দাম জীবন গতির মধ্যে একা, পরিত্যক্ত মানুষ হয়ে ওঠে। তাই উপন্যাসের একেবারে শেষে তার করুণ উপলব্ধিটুকু এই রকম নির্মল হয়ে ওঠে তার অস্তিত্বের সংকটের রূপ ধরেই ঃ

'টাল সামলাতে না পেরে অন্ধকারের মধ্যেই একটা জলভরা বালতির ওপর পড়ে যেতে যেতে ওর মনে হল মঞ্জুর কাছে আর কোন দিনই ও পৌঁছাতে পারবে না।'

জ্যোতির্ময় এমন এক জায়গায় থাকে যেখানে কলকাতার দৈনিক কাগজ এসে পৌঁছয় বিকেলে। এমন জায়গায় বাস নির্বাসনের মত, নির্বাসনের দিনগুলিতে জ্যোতির্ময় ছিল নিঃসঙ্গ। এরই মধ্যে আসে তার চারপাশে তার থেকে বড় প্রজন্মের ব্যবধানের কিছু যুবক-যুবতী। নিঃসঙ্গ জ্যোতির্ময়ের শুরু হয় আত্ম-উদঘাটনের প্রতিক্রিয়া তার মনের

গভীরে ঘুরন্ত ঘাঁতাকলের একটানা গুর গুর শব্দের মত। জ্যোতির্ময় নিজের অস্তিত্বের মূল্য মূল্যহীনতাকে বিচার করতে পারে এ সময়ে। তার অস্তিত্বে টান দেয় স্বভাবের বিপরীত এমন পরিবেশ। এই অবস্থায় জ্যোতির্ময়ের ভাবনা যেন তারই মুখের সামনে ধরা তার আয়না ঃ

'কেউ পাপী নয়, ন্যায় অন্যায় দিয়ে পুরনো মাপে এদের জরীপ করা চলে না। কল্যাণ সেদিন বলেছিল, তার অরণ্যের কান্না দিয়ে সে আর একটা অরণ্যে রোদন কভার করতে চায়। সে অরণ্য সেল্লুলয়েডের অরণ্য, কতকগুলো অ্যামেচার একস্ট্রা দুঃখ গ্ল্যামার আর সাক্সেসের পথ খুঁজতে মাথা খুঁড়ে মরেছে। এই ফিলমের জঙ্গলেও নরখাদক আছে, ফেউ আছে, বুকে হাঁটা সরীসৃপ আছে কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ নেই। কিংবা ধরা যাক জন অরণ্য, জীবনের অরণ্য—যেখানে মানুষের শেষ পরিণতি রোদন। কল্যাণ ঠিকই বলেছিল কিন্তু এসব ছবিতে কি করে ফোটাবে, এতবড় একটা ব্যাপার কি করে এই নির্দিষ্ট ছোট গল্পের মোড়কে ধরে দেবে, চিত্রনাট্য জমাবে, জ্যোতির্ময়ের মাথায় ঢোকেনি। আর এ ব্যাপারে সে মাথা ঘামাতেও রাজী নয় শুধু এই কুশীলবদের জীবনের যে সব আত্মঘাতী গল্পের টুকরোর মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছে এই দুদিনে, শ্রোতা এবং সহচর বনতে হয়েছে তার একটা ভাবাবেগ আছে, ধাক্কা আছে যা সামলানো শক্ত।

কয়েকবার পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে জ্যোতির্ময় আজ পাথরটার ওপর চড়ে বসতে সক্ষম হয়েছিল। পায়ের তলা দিয়ে ধারালো জলের ক্ষৌরকর্ম চলেছে, সেই দিকে তাকিয়ে চমকে উঠছে। এই পাথর আর জলের খেলা, চিরকালের খেলা, তার জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন মিল। সাঁকোর তলা দিয়ে যে জল গড়িয়ে যায় আর পাথরের গা ছুঁয়ে, দুই-এ বহু তফাৎ।'

'পারাপারে'র ললিত-রমেন-দের মধ্য দিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় জীবন-অস্তিত্বের একটা সমন্বয়ী ভাবনায় ডুব দিতে সচেষ্ট থেকেছেন, দিব্যেন্দু পালিত নায়কের বৈপরীত্য থেকে বেরিয়ে আসা ও অন্তিমে তার একাকিত্বের যন্ত্রণায় ও অস্তিত্বে জীবনের অর্থকে ধরতে চেয়েছেন, আনন্দ বাগচীর নায়ক নিজের জীবনের আর পরিপার্শ্বের জীবনের ভুল অংক কষার উত্তর দিয়ে জীবন-অস্তিত্বের একটা করুণ ছবিতে এসে থেমেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বাঙালী কবিদেরও অস্তিত্বের সংকট নানাভাবে আমাদের চিন্তিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কল্লোলের কালের কবিরা এবং জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রমুখ কবিরা রবীন্দ্রনাথের গোধূলি লগ্নের লেখার পরিবেশে থেকেও নতুন যৌবন—যাকে 'কল্লোলীয় যৌবন' বলা যায়, এবং যার তাৎপর্য বিদেশী কাব্যপাঠ ও ভাবনার দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত ছিল, কবিতার বিষয় ও 'ইমেজ'-এ এই পৃথিবী, জীবন, জগত, মানুষ—এসবের মূল্যায়নে বিশেষ তৎপর থেকেছেন।

বিচ্ছিন্নতার উল্টোপিঠে যদি অস্তিবাদী জীবন-ভাবনাকে রাখি, তা হলে যে সময়টা বাংলা-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাকে তীব্রতম সংকট করে তোলে, সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালকে অতিক্রম করে আমরা দেখি বাংলা কাব্যের যুদ্ধ-সময়ের প্রাক্ ও উত্তরকালের প্রায় সব কবিই কম বেশী তাড়িত হয়েছেন অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সংক্রান্ত ভাবনায়। সম্ভবত এক সংকটজনক সংশয়াকুল বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঝুলতে ঝুলতে জীবনানন্দ দাশের লেখনী থেকে এরকম কয়েকটি চরণের জন্ম হয়—'আলো অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে / স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক

বোধ কাজ করে। / স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়, / হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম নেয়।' ( বোধ )

এই 'বোধ'ই-বুঝিবা কবির সম্পর্কহীন শূন্যতা থেকে একটা আশ্রয়, ভাসমান অসহায় জীবন-মনকে দাঁড় করানোর একটা আধার। কারণ, 'আট-বছর-আগের একদিন' কবিতায় কবির লাসকাটা ঘরের টেবিলে শোয়ানো নায়কের অর্থাৎ কবির নিজের সমস্ত কিছু জাগতিক বাঁচার ও ভরসার কণ্ঠ থাকা সত্ত্বেও যে অ-লৌকিক উৎকণ্ঠা, তা সেই বোধ-মুখীন—'জানি—তবু জানি / নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু—গৃহ-নয় সবখানি / অর্থ নয়, কীর্ত্তি নয়—সচ্ছলতা নয়—/ আরো এক বিপন্ন বিস্ময় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে / খেলা করেও ; / আমাদের ক্লান্ত করে / ক্লান্ত-ক্লান্ত করে ; / লাসকাটা ঘরে / সেই ক্লান্তি নাই ; / তাই / লাসকাটা ঘরে / চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।' এখানে শূন্যতা থেকে কোথাও ক্ষীণ আশার অনুরণন থেকে যায়। আবার সব শেষে কবি যখন অতীত-বর্তমান ভবিষ্যতের নিগূঢ় 'টেন্‌শন্‌' থেকে মুমূর্ষু হয়ে শেষ কথাটি বলে ফেলেন —'আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের / প্রচুর ভাঁড়ার।'—তখন এমন ব্যাপ্ত পৃথিবীর অন্তর্গত সুবিশাল জীবন-ভোগেরও যে ক্লান্তি থাকে, তা থেকে কবির বাঁচার বাসনার্তিই একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। অস্তিবাদী চিন্তা কবি জীবনানন্দের রচনায় নাস্তি থেকে উঠে আসা এক নিকষিত সোনা।

বাঙালী কবিরা—যাঁরা আধুনিক এবং যথেষ্ট খ্যাতকীর্তি ও সত্যিকারের ক্ষমতাবান —তাঁদের নিঃসঙ্গতার ভাবনা কখনো ব্যক্তিক, কখনো বা উগ্র কালচেতনার, কখনো বা প্রত্যক্ষ সামাজিক বাস্তব জীবনজাত হতাশার আর্তি। যেখানে ব্যক্তিক সেখানে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গহীন অস্তিত্ব-ভাবনা নিজেকে দেখার মত আয়নাই—'সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায় / হেরি মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গণ।' ( শাপভ্রষ্ট )।

সমর সেনের কবিতায়, সে সময়ে, কালভাবনা তাঁকে যেভাবে নাড়া দেয়, তার প্রকাশ বিবর্ণ স্বভাবেই সত্য—' মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার / মতো রাত্রি।' ( নাগরিক ) কবির অস্তিবাদী জীবনাকাঙ্ক্ষা কম নয়, তাই যতই চারপাশের বিচ্ছিন্নতার জগত নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, ভাবিত হোন, যে কথাটি তাঁর সবশেষে কাম্য, তা বলতে ভোলেন নি, 'আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল, / নামুক মহুয়ার গন্ধ।' ( মহুয়ার দেশ )

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে এসে আগের কবিরা ও নতুন প্রজন্মের কবিরা শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা, দূরত্ব—এসবকে আরও রক্তের অন্তর্গত করেই অস্তিত্বের কম্পনকে কাব্যে ব্যবহার করেছেন। রাম বসু বলছেন, 'কচ্ছপের পচা খোলের মধ্যে দিন রাত রাত দিন, আমি আর্তনাদ করেছি / আমি প্রতিবাদ করেছি / আমি বিদ্রোহ করেছি' আমার তিমিরে)। নিঃসঙ্গতা জনিত অসহায়তা, সমস্ত রকম দূরত্বের মধ্যেও কবির প্রতিবাদী বাসনা জীবন-অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখারই উজ্জ্বল প্রয়াস নিশ্চয়ই। কবির সময়-নত প্রশ্ন—'কে আমার কণ্ঠনালী ভরে দিচ্ছ প্রাক্তন পৃথিবীর লোভে হিংসায়, লোলুপতায় ?'—এর পরেই কবির ঘোষণা—'না এ জীবন আমি চাই না / দিন বদ-লানোর নামে / প্রভু / আমাদের আর প্রতারিত কোরো না। / অপচয় অনেক হয়েছে / আর নয়, থামো।'—তখন কবিতার বিষয়ে জীবন-অস্তিত্বের স্পষ্ট স্বীকৃতিই সত্যরূপ পায়।

একালের আর এক কবি কৃষ্ণ ধর বাঁচার কথায় বাঁচার উপযোগী নিয়ম কানুনের কথা ভেবে বলেন—'কী ভাবে সে বেঁচে থাকে তার কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই / বেঁচে থাকা দরকার বলেই / নিজস্ব নিয়মে সে আত্মরক্ষা করে।' এই কবি জানেন, মানুষের বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন ও জরুরী। এই মানুষ, বেঁচে থাকা, সমস্ত, প্রতিস্পর্ধী অবস্থার মধ্যে আত্মরক্ষার সংগ্রাম—এসবই মানুষকে ভালবাসা শেখায়, ভালোবাসার গভীর প্রত্যয় আনে। কৃষ্ণ ধর সেই প্রত্যয়কেই বলেছেন,—'তার হাতে আমলকীর মতো পৃথিবীটা তাই / টলতে টলতে সূর্যের দিকে ফেরে / মানুষের আশ্চর্য মুখ দেখবে বলেই।' (কী ভাবে সে বেঁচে থাকে)। বস্তুত কবির এই বিশ্বাসই অস্তিত্বের কেন্দ্রটিকে উজ্জ্বল করে। পরিপার্শ্ব সম্পর্কে কবি একান্ত সচেতন। সমস্ত প্রতিকূলতা, বৈপরীত্যের মধ্যে কবি কঠিন কণ্ঠে বলেন, —'চারিদিকে সাজানো ব্যূহ, উদ্যত শত্রু ফৌজ / আচমকা হানা দেবার জন্য তৈরি / তারই মধ্যে খুঁজে নিতে হয় বেরুবার পথ।' (ঐ) 'কথা দিচ্ছি' নামের 'যে যেখানে আছো' গ্রন্থের একটা কবিতায় কবি যখন বলেন,—'অন্য কোনো গল্প নয়,আমাদের গদ্য পদ্য সময় ও জীবন / সব তাতে ধরা থাকবে / ক্যানভাসের যাদুমন্ত্রে বশ মেনে সুস্থির দাঁড়াবে যেন বন্য কোনো ঘোড়া / কথা দিচ্ছি, জীবনের মুখোমুখি আমরাও বসব সেদিন।'—তখন কবির জীবন প্রেম জীবন-অস্তিত্বের চমৎকার মূল্যায়নে থাকাই হয়ে যায়। পাশ্চাত্ত্য অস্তিবাদী দর্শনের কট্টর প্রয়োগ নয়, দেশীয় মমতায় ও প্রাণে জীবনকে আলিঙ্গন করার এই মানসিকতায় আমরা পাই কবির সুস্থ অস্তিত্ব-ধ্যানের নিশ্চিত পরিচয়। কৃষ্ণ ধর কখনোই নৈরাশ্যবাদী কবি নন, নন জীবন বিমুখ থেকে জীবনের মানে খোঁজার কবি। অন্তত 'যে যেখানে আছো' কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতা সেই কথাই বলে। 'সবই তোমার রক্তে' কবিতায় কবি সুস্থ সিদ্ধান্তে বলেছেন,—'শুধু জানি, সব নশ্বরতা অভিমান সংসারের কষ্ট দুঃখ ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে / আশ্বিনে নদীর জল। / তোমার যন্ত্রণা শুধু আমাদের অস্তিত্বের পরতে পরতে / জেগে থাকবে চিরন্তন / আমাদের নিজস্ব আগুন।' প্রেম, স্মৃতি, মানবতা, প্রতিরোধ—এসবই তো অস্তিবাদী বাঙালী কবির মাটি, জল, বায়ু, রস, আশ্রয়। বিশ্বাসময় বাসনা তীব্রতম না হলে কবি একথা কিছুতেই বলতে পারতেন না, —'যে যেখানে আছো সবার জন্যে / কিছু কথা এখনো বলে যেতে ইচ্ছে করে / কথা বড় গরিমাময়, তার শক্তি বড় আশ্চর্য / কথার জন্যই সে আশ্বিনের হিম মাথায় অপেক্ষা করেছিল / কথার জন্যই সে এখন চলে গেছে।' (যে যেখানে আছো) শিকারী বিড়ালের প্রতীকে কবি কৃষ্ণ ধর পরিপার্শ্বের, অবস্থার, বিক্ষত সময়ের বৈপরীত্যকে এঁকে সুস্থ জীবনকামনায় তীব্রতার কথা বলেছেন কাব্যিক অকপটতায়, অন্তরঙ্গতায়, নির্মল প্রত্যয়ে : 'জানি সে সুযোগ পেলেই ধরবে ইঁদুর / অন্ধকারে হিংস্র থাবায় / অথচ একটু পরেই ভোরবেলা ফুটবে সূর্যমুখী / ইঁদুর জানে না।' (শিকারী বেড়াল) এমন জীবন অস্তিত্বে সপ্রাণ, সনিষ্ঠ বিশ্বাসই এই কবিকে অস্তিবাদী জীবন বেদে নিবিড় করে তোলে।

আবার একালের কবিদের বিচ্ছিন্নতার ভাবনাকে সবচেয়ে স্পষ্ট করে ধরা যায় তাঁদের 'ইমেজ' ব্যবহারে, কারণ 'ইমেজ' হল যে কোন কবির পক্ষে 'to express his own experience for himself, or as it were pass it on to others' (Marjorie Boulton)। শেক্সপীয়রের ছিল রক্তের চিত্রকল্প, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও শেলীর ছিল নির্জন বন, সাপ, সমুদ্র, রবীন্দ্রনাথের পথ, খেয়া, তরী নেয়ে—এমন সব সচল বিষয়। সে

সময়ের কবিরা নিজেদের জীবনদর্শন-অনুসারী 'ইমেজ' ব্যবহার করে কবিত্ব করেছেন, একালের কবিরা 'ইমেজ' রেখেছেন সময়ের রক্ততিলকের রঙে রাঙা বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা, ধূসরতা, হতাশা, বিদীর্ণ বেদনাবোধ—এসবের জন্যেই। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় দেখি একাধিক ক্ষেত্রে 'মরুভূমি'-ব্যবহার, বিষ্ণুদের কবিতায় 'নরক'। একটি শব্দই যেন মানুষে মানুষে মাঝের ব্যবধানের বিপুল বিচ্ছিন্নতাকে ব্যঞ্জনাময় করে আয়াসহীনতায়। একালের বাঙালী কবিরা সমস্ত দিক থেকে সচেতন বলেই বিচ্ছিন্নতার অভিশাপকে তাঁরা কালের পুরোহিত প্রদত্ত তিলক হিসেবে ললাটে গ্রহণ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে শুরু করে মনীন্দ্র রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শংখ ঘোষ, শান্তিব্রত ঘোষ, তরুণ সান্যাল, রাজলক্ষ্মী দেবী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, অরবিন্দ গুহ, অরুণ কুমার সরকার, সিদ্ধেশ্বর সেন, পরেশ গুহ, কৃষ্ণ ধর, আনন্দ বাগচী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, কবিতা সিংহ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ রায়, উৎপল কুমার বসু, শরৎ মুখোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, রবীন সুর, সজলবন্দ্যোপাধ্যায়, বার্ণিক রায়, কেদার ভাদুড়ী, অনন্ত দাশ, রত্নেশ্বর হাজরা, কালীকৃষ্ণ গুহ, কবিরুল ইসলাম, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র প্রমুখ কবিদের একাধিক কবিতায়, ইমেজ ব্যবহারে, কাব্য বিষয়ে তার পরিচয় মেলে। এঁদের মধ্যে একাধিক জন আছেন যাঁরা সমাজবাদী কবি। তাঁরা শূন্যতা থেকে সরে আসতে চেয়েছেন বার বার, জীবনের অস্তিত্বের সত্যকেই একমাত্র লক্ষ্য করেছেন। অনেকেই হয়েছেন বিষণ্ণ, কেউ বা বিচ্ছিন্নতার বেদনায় অহংমুখ হয়ে শান্তি খুঁজেছেন।

অর্থাৎ এঁদের কবিতায় অস্তিত্ববাদের স্বরূপ দেখি বিচ্ছিন্নতা জনিত বেদনা থেকেই। অস্তিত্বের অসহায়তায় যে শূন্যতা তৈরী হয়, তার মূল থেকে যে কান্না, যে বিষাদ ধীর ছায়ার মত প্রসারিত হয়, তা নানান প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গভীর গোপন অনুভব মানুষের ছন্নছাড়া অস্তিত্বের কথা বলতে উৎসুক, উৎসুক সেই সূত্রে নিজের বেদনাবোধের তীব্রতাকে জানাতে যা মূলত অস্তিত্বের কেন্দ্রেই পাঠকদের নিয়ে যাবার আহ্বান বা ইঙ্গিত দেয় সূক্ষ্মভাবে, 'যেখানে পা ফেলি, বেঁধে কুশ। / বুকের ভেতরে আজও জ্বালা / নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমরা দক্ষিণ দিগন্তে চেয়ে থাকি। / দেখি যে, মাটিতে ঘুরছে ঘরছাড়া মানুষ, / দেখি যে, আকাশে উড়ছে পাখি।' (অপরাহ্নে ঝড়) অস্তিত্বের উৎকেন্দ্রিক স্বভাব নিয়ে কবির যেন কোথায় ভয়, ভাবনা।

কবি কিরণশংকর সেনগুপ্ত চল্লিশের দশকে আবির্ভূত একজন প্রতিষ্ঠিত কবি। বর্তমানে প্রবীণ এই কবি স্ব-কালকে সামনে আয়নার মত ধরে ভালোবাসার মুখ দেখতে চান। যে কালে তিনি প্রথম আবির্ভূত, সেই কাল তো আর সামনে নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু সেই বিশ্বাস, সেই আশা, সেই প্রাপ্তির রহস্যময় মুহূর্তগুলি যে তাঁর আজও কাঙ্ক্ষিত। অথচ তিনি বুঝতে পারছেন, কাঙ্ক্ষিত সবই আগে সংশয়কে, অবিশ্বাসকে দূত হিসেবে পাঠায়! কালের এমনি চারিত্র্য। তার 'সন্ধান' নামের কবিতার প্রথমেই তিনি যেন স্বীকারোক্তি দেন,—'ভালোবাসতে গিয়ে থমকে যেতে হয়। / কেননা এই মুহূর্তে / গোপন আড়াল থেকে সাপের ফণার মতো দুলছে / সংশয় আর অবিশ্বাস। / একটার পর

একটা ঘটনা ঘটছেই / একটার পর একটা প্রত্যাশা ভাঙছেই, / সময়ের ঢেউয়ের চূড়ায় মুখ দেখিয়েই সব স্বপ্ন মিলিয়ে যায়।' প্রত্যাশা যদি কাচের মত মেঝেয় আছাড় খেয়ে গুঁড়িয়ে যায়, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়. যদি স্বপ্ন আদর্শ হয়ে প্রতিমার একটি গায়ে লেপে না এসে মিলিয়ে যায় তা হলে জীবনকে টিকিয়ে রাখার মত শক্ত সারযুক্ত জমি কোথায় মিলবে ? বস্তুত এই কবির অস্থিরতা সেকাল ও একালের আর সব কবির মতই তীব্র হয়ে ওঠে নানাভাবে, স্থির অভিমন্যুর ওপর চার দিক থেকে তুমুল আক্রমণের মত। কবি যখন অকপটে বলেন, 'এখন কোথাও হাত রাখা যাচ্ছে না, , দারুণ তাপ লাগে, / এখন কোথাও পা রাখা যাচ্ছে না, / কেবলই পিছলে যায়। / নড়বড়ে কি একটা জিনিস সমস্ত জীবনের মূলে বারবার / কায়েমী হয়ে বসতে চায়.' ( কোথাও হাত রাখা যাচ্ছে না ) তখন জীবন অস্তিত্বের মূলেই বুঝি টান লাগে। এক একটা প্রজন্ম দ্রুত সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়, দ্রুত সরে যায় ! কবি কিরণশংকর সেনগুপ্ত সেই প্রজন্মের স্বভাবেই অস্তিত্বের ভাষাকে অনুভব করে বলেছেন, 'দারুণ দাপাদাপি করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে / হিংসা আর অবিশ্বাসের মস্তানগুলো ; / ওরা কেবলই সচেতন জিজ্ঞাসার মুখে চোখে / অন্ধকার ছড়িয়ে দিতে চায়।'

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার বিষয়ে অস্তিত্ব-অনস্তিত্বর ভাবনায় একটি কথা পরিষ্কার বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা অনেকটা সরেই এসেছি। 'সরে এসেছি' কথার অর্থ তাঁকে আদৌ অস্বীকার নয়, তাঁর গভীরতম রক্তের সম্বন্ধকে বিস্মৃত হওয়া নয়, নয় তাঁর আত্মীয়তা ও শিক্ষাকে উপেক্ষা ! আসলে রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিকতার পথ তৈরী করেছেন তাঁর সত্তর-উত্তীর্ণ বয়সের কবিতায়, সেই পথ ধরে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। আমরা বলতে কবি ও স্বভাবী পাঠক—উভয় দিক থেকেই কথাটা সত্য।

একালের কবিরা রবীন্দ্র-উত্তর কালে সবচেয়ে যে বড় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা সেই ছ' বছরের ভয়ংকর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ! এই ঘটনা তাঁদের চরম ও পরম অভিজ্ঞতা, কাব্যের ক্ষেত্রেও। সেই যুদ্ধের ভস্ম থেকে কিছু নতুন কবির জন্ম হয়েছে ফিনিক্স্ পাখিদের মত। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আরও নতুনের দল ভিড় করেছে পাঁচ, ছয়, সাত ও এই আটের দশকেও। সময় বদলায়, অভিজ্ঞতা নতুন সঞ্চয়ের থালা সামনে ধরে। রবীন্দ্রনাথ যে সময় দেখেন নি, অথচ বার বার দেখতে চেয়েছেন, দেখেছিলেন তাঁর কাব্যে একাল দর্শনের প্রজ্ঞায়, একালের কবিদের তা-ই একেবারে রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই তাঁদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও কিছু নতুন কথা, শব্দ, ইমেজ আশা করব বই কি !

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একেবারে আমাদের বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ায়, ঘরের দরজা-জানালা ভেঙে ঢুকে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু তা ছিল না। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ সুদূরবর্তী হওয়ায় তার প্রভাব পরোক্ষে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা কবিতায় যে সংকট তা নর-নারীর দেহ-নির্ভর বাস্তবতায় নগ্নতার প্রয়োগকে কেন্দ্র করেই স্পষ্ট হয়। কল্লোলের লেখকদের কথা ভেবে, তাঁদের দেখে সম্ভবত সজনীকান্ত দাসই প্রথম রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই সংকটের কথা পৌঁছে দেন। সজনীকান্ত দাসের চিন্তা-ভাবনা, অমল হোমের 'অতি আধুনিক কথাসাহিত্য' একসময়ের কাব্যে নতুন সংকটের দিক তুলে ধরে।

আগেও এর সমস্যা অনেক ছিল, কিন্তু অশ্লীলভাবে দেহবাস্তবের নগ্নতাকে ঠিক এই ভাবে আর আগে দেখা যায় নি। রবীন্দ্র-ভাবনা থেকে সে সময়ের আধুনিকতার প্রথম পুরুষের দল—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ সরে আসতে চাইলেন। এলেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে জীবনানন্দ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আনে দাঙ্গা, মন্বন্তর, প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ, দেশবিভাজন, বাস্তুহারা সমস্যা, তীব্র বেকারত্ব, অবক্ষয়, হতাশা, নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য যুদ্ধোত্তর কালের অব্যবহিত পরবর্তী দশক গুলিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাই মানুষের, সমাজের, ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকটকে তীব্রতম করে।

প্রতীচ্যের সার্ত্র্, ক্যামু প্রমুখ কথাকার এবং একাধিক কবিদের মত এদেশীয় কবিরাও অস্তিত্বের শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা, সংকট নিয়ে বোধ হয় সময়ের প্রভাবেই এবং সূক্ষ কাল-চেতনায় কবিতার মধ্যে নিজেদের অনুপ্রবেশ করান। আমি এই প্রসঙ্গেই বলে রাখি, প্রতীচ্যে যে অর্থে একজন সাহিত্যিককে অস্তিবাদী বলা হয়, আমাদের দেশের বাঙালী কবিরা সে অর্থে নিশ্চয়ই এবং কোনক্রমেই চিহ্নিত হবেন না। অবশ্যই যুদ্ধোত্তর কালের কোন কোন কবি সচেতন বুদ্ধিনির্ভরতায় কবিতায় সেই অস্তিবাদী দর্শনকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে অস্তিত্বের সংকট-ভাবনা নানাভাবে তাঁদের তাড়িত করেছে প্রেম, সমাজভাবনা, মৃত্যু, প্রকৃতি, রাগ, ভয়, শূন্যতা—এসবের সূত্রে। আমরা আগে বলেছি বিস্তারিত, তবু প্রসঙ্গত আবার এখানে উল্লেখ করি, সমস্ত রকম বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে, বা যা কিছু পূর্ণ, সমর্থিত, মূর্ত, ঐক্যবোধে সার্থক, তার সমূল ধ্বংসের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার নামে সংগ্রামের দীপ্ত রূপই ইংরেজিতে Existentialism। যে কোন সংগ্রাম ছোট হোক, বড় হোক, কোন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার কারণে বা অন্য কোন বড় অস্তিত্বকে গঠন করার জন্যই ঘটে। অর্থাৎ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আসে সংগ্রাম, আর সংগ্রাম কথাটার সঙ্গে অস্তিবাদ গভীর-নিবিড় ভাবে জড়িত। 'বিচ্ছিন্নতা' আপাতত ইংরেজি প্রতিশব্দে 'এলিয়েনেশান্', (যদিও এই ইংরেজি শব্দটির আরও একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ হতেই পারে) 'সংগ্রাম' স্ট্রাগল্, আর 'অস্তিত্বের' এক্জিস্টেন্স—এই তিনটি শব্দ গভীরতম ব্যঞ্জনায় অস্তিবাদী কবি-সাহিত্যিকদের সূক্ষ্ম অনুভূতির স্তরে সক্রিয় এবং সেই সক্রিয়তার রূপময় প্রকাশে সহায়ক তাঁদের 'ইমেজ'।

এলিয়ট ১৯২১-এ বললেন, 'We are the Hollow man'.। তাঁর ককটেল পার্টিতে বললেন, 'Every one is alone, or it seems to me'। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও তো বলেছেন, 'কেহ একা থাকিও না।' সবই অস্তিত্বের সংকটের কথা ভেবেই বলা হয়েছে। বস্তুত, অস্তিত্বহীনতা সত্য হলে জীবন মূল্যহীন, মানুষ নিঃসঙ্গ। এমন সঙ্গহীনতার নাম বিচ্ছিন্নতা। এ এক অভিশাপ। এইঅভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যই কবিতায় একালের বাঙালী কবিদের নিরন্তর আত্মিক সংকটজাত সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখি। নানা-ভাবে তাঁদের সেই সংগ্রামের কথা স্পষ্ট হয় আমাদের কবিতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কালের প্রায় সব তরুণ সদ্য-আবির্ভূত কবিই কোন না কোনভাবে অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে ভাবিত হয়েছেন। অনেক পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন এইসব কবিও ষাটের দশকে কবিতা লিখতে বসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সামনে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নয়, অন্য কিছু বলে, অন্যভাবে বলে স্বাধীনতা-উত্তর কবিতাকে নতুন পথ ধরানোয় সচেষ্ট হয়েছেন। বিষয়ের অস্তিত্বভাবনা তেমনি এক নতুন পথের পরিচয় নির্দেশক বিষয়। কিছু কবির বিশিষ্ট

কিছু কবিতার সামান্য ব্যাখ্যাতেই আমাদের বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য স্পষ্ট হবে বলে মনে করি।

অস্তিত্ববাদীদের মূল ভাবনা মানুষের হৃদয় সম্পর্ক নিয়েই এবং এই হৃদয়-ভাবনা যখনি কোন পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংঘর্ষে বিপর্যস্ত হয়, যখনই কোন গভীর সংকটে পড়ে, তখনি লেখক-শিল্পীরা হাতের আরও প্রসারিত মুঠির শেষতম প্রান্তটি পৌঁছিয়ে দিতে চান জীবনেরই কেন্দ্রে। কবিরা নিজেকে খোঁজেন, দিশাহারা হন,' কখনো বা বিভ্রান্ত হন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে তাই বলতে শুনি—'কে যেন কোথাও গেছে। কোন্ খানে গেছে ? / তেমন অপেক্ষা—ধুলো ঝুল ভিজে কাগজের মতো / মাখামাখি, দরোজার কোণে পড়ে আছি।' ( কেউ কেউ একা থাকে বেশ একা ভয়ংকর একা ) আপন অস্তিত্বের এমন হীন, দীন অবস্থা কোনক্রমেই কবির কাম্য নয়, হবার নয়। তবু এমন অবস্থার মূলে আছে 'চারিদিকে ঘুম আর অন্ধকার কাকশ ফুলের মতো বসে,' ( ঐ )। কিন্তু কবির এই স্বগত-ভাবনার মধ্যে টলস্টয়ের 'রেজারেকশান' উপন্যাসের নায়ক নেখল্যুডকের এক সময়ের অন্তিম উপলব্ধির মত যে বোধের জন্ম, তা পদ্মের কোরক থেকে জাত অস্তিত্বের সুস্থ শ্বাস নেওয়ার সূর্য-আকাঙ্ক্ষাই,—'মনে মনে আমি বড়ো ভালোবাসি, মানুষের ভিড়ে / চাপ পেতে, রাশি রাশি সুস্থ ও অসুস্থ মাংস দেবে কায়ক্লেশ, কাম, ক্রোধ ; অতিরিক্ত দেহের বাতাস/লাগবে দেহে, প্রাকৃতিক চৈত্র ও বৈশাখে রুখু ঝড়/বোঝাবে সমস্ত কিছু মেয়েলি সন্ন্যাসে নয় জড়ো/কেউ কেউ একা থাকে, বেশ একা, ভয়ংকর একা।' ( ঐ/'আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তু জাল' গ্রন্থ ) কবির একাকিত্ব অনেকটা অস্তিত্ববাদী কথাকার সার্ত্র, ক্যামু প্রমুখের যন্ত্রণার মত, আর ফিরে-আসা সেই তাঁদের সঙ্গেই একাত্মতার অঙ্গীকারবদ্ধ রূপ।

'মানুষ বড়ো কাঁদছে' গ্রন্থের 'মানুষ যেভাবে কাঁদে' কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন বলে ওঠেন—'একা থাকি বড়ো একা থাকি, / ভিতরে ভিতরে একা, অরণ্যের মাধ্যখানে একা, দিনে-রাতে, দুঃখে ও সুখে/ছায়া নেই, মায়া নেই, ফুলের বাগানে নেই ফুল'—তখন একই একাকিত্ববোধ আরও গভীরতম প্রতীকের ব্যঞ্জনায় দুঃসহ হয়ে ওঠে কবির পক্ষে। একাকিত্বের যন্ত্রণার মূল অর্থই হল আপাত দৃষ্টিতে Negation-এ নিবদ্ধ থাকা, কিন্তু ভিতরে আছে তার প্রতিস্পর্ধী Affirmation-এর, জীবনের Positive দিকের নিত্য সন্ধিৎসা। একাকিত্ববোধ হৃদয়ের কথা, আবার হৃদয়েরই যুক্তি দিয়ে তাকে সুস্থ সজীব করা, তা-ও হৃদয়-বুদ্ধির কথা। শিল্পীর একাকিত্ব অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের সেই রঘুপতির গোপনে দেবী মূর্তির মুখ ফিরিয়ে দেওয়ার মত। আসলে তা দেবীর জীবন্ত স্বভাব দেখানোর কারণে হলেও দেবী অর্থে জীবনের বড় স্বভাবকে ধরার প্রয়াস। শক্তি চট্টোপাধ্যায় মানব্যের রক্তেই যেন বাঁচার বাসনাকে আর্ত করে বলে ওঠেন—'তবুও মানুষ বাঁচে, মৃত্যু আছে বলে বেঁচে থাকে / মৃত্যু তো জীবন নয়, ধারাবাহিকতা নয় কোনো। / ভিড়ে বাঁচে, একা বাঁচে, মানুষের সমভিব্যাহারে/বাঁচে. বেঁচে থাকে—এই বাঁচতে হবে বলে বেঁচে থাকে'—( ঐ )।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন বলেন, 'পিছনে জল অথৈ আর সামনে আছে জ্বালা/দূর-দেশের শিশুর কান বোমায় করে কালা/চোখের কাছে আঁধার—প্রাণ বাঁধার মন বাঁধার/ কাজ কি শেষ এই দেশ ?' —তখন কবির প্রশ্ন অস্তিত্বের মূল নিয়েই, তার স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়ার বাসনা নিয়েই সামনে আসে। কবি বার বার কখনো প্রেমে, কখনো মৃত্যুতে,

কখনো মানুষে মানুষে ব্যবহারে শূন্যতাকে চন্দন করেছেন কবির অনুভূতির চারপাশে, কিন্তু জীবন অস্তিত্বের অমোঘ বাণীর স্বীকৃতি দিয়েই যেন সমস্ত জীবন-বৈরাগ্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর শক্তি নিয়ে মৃত্যুকে অবলীলায় বলেন, 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো ?'

তেত্রিশ বছর বয়সে পা দিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর প্রেমার্ত ভাবনাসূত্রে বলতে শুনি, 'কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না।' (কেউ কথা রাখে নি)। সামাজিক মানুষ এই কবির পরিপার্শ্ব থেকে কবি যে মানসিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই একথা বলেছেন, বলেছেন ছেলে বেলা থেকে ক্রমাগত তাঁর নানান সূক্ষ্ম আশাভঙ্গের কথা, যৌবন বয়সে কেন এক রমণী বরুণার ভালবাসার আর্তিতে বসে থেকে থেকে না পাওয়ার হতাশার কথা—'তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখনো তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ/এখনো সে যে কোন নারী !' প্রেম তো জীবনেরই একটা সিঁড়ি ! কবির এই ভাবনা তাঁর বেঁচে-বর্তে থাকার তীব্রতম বাসনার গভীরে স্থিত নাভিমূলের যন্ত্রণাই !

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সময়ের ঘেরাটোপে জড়িয়ে, বা সময়কে একটা পরিষ্কার আয়নার মত সামনে এনে নিজেকে আমাদের কাছে চিনিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন—'পাঁচজনে পাঁচ কথা, আমি নিজেকে এখনো চিনি না'। কবির নিজেকে না চেনার মূলটাই তো বিচ্ছিন্নতার সুতোয় ধরা। যে কবি একসময় বলেন, 'আমিও ছিলাম, আমিও ছিলাম, এই সুখে নিঃশ্বাস।'—সেই কবি কিন্তু কবিতার শেষ স্তবকে এসে সুখ সরিয়ে, সুখের ছায়া মাড়িয়ে ,নোংরা করে কান্নার অসহায়তায় নিজের ভিতরের একটা মূর্তি গড়েন, যার অস্তিত্ব উত্তাপের, সমূহ কষ্টের, দুঃখ-কান্নার—'চেয়েছিলাম তো সকালবেলায় শুধ মানুষ হতে / বার বার সব ভুল হয়ে যায় এত বিপরীত স্রোত/বুকের মধ্যে প্রবল নিদাঘ, পশ্চিমে হেলে মাথা/আমিও ছিলাম, আমিও ছিলাম, কান্নার মতো শোনায়।' (আমিও ছিলাম)

একই সঙ্গে অস্তিত্ব-অনস্তিত্বকে অনুভব করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিস্ময়ে, জিজ্ঞাসায়, নিজের দিকে উন্মুখ তাকিয়ে থেকেই। 'দূরের বাড়ি' কবিতায় কবি বলেন, 'এত অন্ধকার, এত নিঃসঙ্গ, হারিয়ে-যাওয়া/প্রান্তরের মধ্যে/ঐ বাড়িটি কেন? কেন? দূরে গাছের নীচে/দাঁড়িয়ে আমি কোনো/উত্তর পাই না !' দূরের নিঃসঙ্গ অন্ধকার বাড়ি আর গাছের নীচে কবি—এমন শূন্য জীবন আর সবল, সুস্থ জীবন—দুই মেরুগামী আকাঙ্ক্ষার যোজক প্রাণ-অনুভবেই কি কবির মন স্থিত নয় ?

অমিতাভ দাশগুপ্ত একালের আর এক প্রতিষ্ঠিত কবি, যিনি এই নানান বিপরীত জটিল সময় স্রোতের মধ্যে খুঁজে বেড়ান শৈশবকে, তাঁর অতীতের বিশ্বাসকে। এমন শৈশব, এমন বিশ্বাস তাঁর বেঁচে থাকার মূল্যবান সম্বলটুকুই। তিনি যখন তাঁর 'ভাসানের গান'-এ বলেন,—'সে কালে বিশ্বাস ছিল/বিশ্বাসের ক্রাচে ভর ক'রে/পঙ্গু গিরি পার হত। খৃষ্টের মহিমা গান গেয়ে/কেউ কেউ সরাসরি চলে যেত সিংহের গুহায়—/শোণিত যৌনতা ব্যথা বিশ্বাসে বিলীন হ'য়ে যেত।' (ভাসানের গান), তখন অতীতের সেই খাঁটি বিশ্বাসটুকুই বুঝিবা একালের পরিবেশে কাম্য হয়, কবির অস্তিত্বকে মাধ্যাকর্ষণে অমোঘ করে, মাটি দেয়। একাল, মানে উৎকেন্দ্রিক, অনিশ্চয়তার কাল।

সেই কালের বিশ্বাসহীনতাই কি এই কবিকে বিশ্বাস্য গভীর কোন অনুভূতির কেন্দ্রে টেনে নিয়ে যায় বলে কবি সোচ্চার হন এমন কথায়—'যেন পাগলা হয়ে যাব এত জোরে ঘণ্টাধ্বনি বুকের অন্দরে, (ঐ)? আমার মনে হয়, সম-সময়চেতনা তাঁকে এত বেশী পরিপার্শ্ব থেকে বিবিক্তির মধ্যে নিয়ে যায়, যার ফল তাঁর এমন কাব্যময় স্বীকৃতিতে—'এতকাল ছিল একটু আগে ছিল এই মাত্র হাত থেকে গেল প'ড়ে / খান খান হয়ে গেছে, সবিতার বিলীন প্রভায় / মা দিদিমা বড়োকাকা তোমাদের স্নেহে আর্দ্র মুখ / মনে করতে পারছি না, প্যাকাটিতে বটের আঠায় / মাখানো শৈশব সব একূল ওকূল ভেসে যায়' (ঐ)। এই যে সূত্র ছিঁড়ে যাওয়া, উৎসমূল থেকে নিজেকে কোন রহস্যময় অস্তিত্বে টেনে আনা—এটাও সেই সংকট যা কবির পক্ষে সমকালের সঙ্গে কবিমনের সুস্থ আকাঙ্ক্ষার বৈপরীত্যই!

আর্ত এই কবির আর এক স্বীকৃতি,—'বাইরে আমার অনেক দাবি, দুয়ারে দিই কলঙ্কী খিল,/নয়ন তুলে দেখালো কে, 'এখানেই তো নিখিল বিশ্ব,/এখানেই তো বর্ষা-বাদল, রোদ ফাটানো আকাশ সুনীল,'—/কোন্ পিপাসায় কেঁদে বেড়ায় ভাঙা বুকের তিরিশ গ্রীষ্ম?' (ভাঙা বুকের তিরিশ গ্রীষ্ম) কিন্তু যা ছিল সন্দেহের, সংশয়ের, অনিশ্চয়তার প্রশ্নে চিহ্নিত, যেখানে পিপাসাই ছিল, মেটানোর কোন পথ ছিল না, কবি কিন্তু সেখানেই থেমে তাঁর আবেগকে অনিশ্চয়তার শিকার করেন নি, বরং স্থিত জীবনের সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে আলোকে অনুভব করেছেন—'চমক তোলা ভীষণ কাছে এসে দাঁড়াই, হারায় ছন্দ, / ভালোমন্দ সহজ জটিল বুঝছি না কি মিথ্যে, খাঁটি, / অন্ধকারে মাণিক হয়ে জ্বলছে দুটি মণিবন্ধ' (ঐ)।

নিজ অস্তিত্বের স্বরূপ নিয়ে কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত নিজের ভাবনার গভীরে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে বুঝতে আগ্রহী কখনো কখনো। একটি কবিতায় কবির যেন বা স্বগতোক্তি,—'এতদিন আমি জনে নির্জনে/অর্গলহীন গড়িয়ে/নিজের বাইরে নিজেকে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে / ছাড়িয়ে এসেছি / যা হ'তে পারত আমার (জনে-নির্জনে)। নিজের সম্পর্কে কবির এ এক আত্মগত ব্যাখ্যা। এখানে কবি একা। কিন্তু কবিতার শেষে এসে কবি যা বলেন, তা অস্তিত্বের বড় মূল্য দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত আশার সংগ্রামী রূপই—'চোখের সামনে গর্জে উঠেছে / খড়্গ প্রতিম খাঁড়ি,/দূরে, বহু দূরে সাধের বসতবাড়ি, এ কি ভীম সুরে বেজে ওঠে নহবৎ, / পদে পদে কাঁটা ঢেকেছে আমার সকল ফেরার পথ,/শোণিতে বাসনাময়ী/ঘনিয়ে কুহক ডাকে বার বার—/'ভোর ভয়ি,' ভোর ভয়ি,' (ঐ)।

আনন্দ বাগচী আর এক কবি যিনি বন্ধ কানাগলির সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের আর্তিকেও শ্বাস-প্রশ্বাসে মিলিয়ে নিয়ে বলে ওঠেন,—'বন্ধ কানাগলির মধ্যে টুকরো আকাশ জানলা দিয়ে।' (স্মৃতি) বিস্মৃতি যে অস্তিত্বের, অস্তিত্ব-চেতনার শত্রু, তা যেন মনের মধ্যেকার সেই ব্লটিং পেপার যা সব সিক্ত অবস্থাকে শুষ্ক করে পরিত্যক্ত করে দেবার ক্ষমতা রাখে। আনন্দ বাগচী সেই সূত্রেই বলে ওঠেন,—'যেসব বেদনা নিয়ে দিন কাটে, / বুক জ্বলে দুঃখের বারুদে' সেগুলির 'একদিন সব কিছু ভুলে যাব অন্যমনে ফিরে যেতে যেতে।' (বিস্মরণ) এখন ভুলে যাওয়ার শূন্যতা-তো কবি-আত্মার জীবনমুখীন অস্তিত্বের সংকটকে জাগিয়ে দেয়। আর সে সংকটের স্বরূপ

কবির একান্ত নিজস্ব,—'পুরাতন পথ দিয়ে শূন্য মনে হেঁটে যেতে যেতে / সব নাটকের গল্প তুমুল বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে মধ্যরাতে।' এর পর যে নিঃসীম শূন্যতা— তার ভার কবির পক্ষে সহনীয় হবে কিনা, তারই চিন্তা থেকে যায় ব্যঞ্জনায়, অ-লৌকিক কোন অস্তিত্বের অন্বেষায়।

কবি শিবশম্ভু পালের অভিজ্ঞতাও আনন্দ বাগচীর অনুরূপ, ভালো থাকতেই কবির একান্ত বাসনা,—'অথচ আমার হাত চেপে ধরে অনাস্থা প্রস্তাব।'— এই হল কবি শিবশম্ভু পালের অসহায় অক্ষমতার দিক। এই অক্ষমতা কবিরই অন্তর-গত! কবির কাম্যও বুঝি! অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সমস্যাকে সমস্যা করেই কবি যা কিছু ভালো, স্থিত, সকলের কাম্য—তাকে অনাস্থায় খারিজ করতে চান, বলেন 'এই তো বিক্ষিপ্ত পড়ে রয়েছে করুণ শবদেহগুলি, প্রেম, শুভাশিস! / তোমাদের হাওয়া এই অনাস্থার আর্তনাদ নয়' ( তোমাদের হাওয়া )।

বিচ্ছিন্নতাবোধ অভিশাপ কিনা ঠিক বলা যায় না, তবে বিচ্ছিন্নতার ভাবনা বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের কবিদের একটা বিশিষ্ট প্রবণতা বা প্রতিক্রিয়া—নিশ্চয় বলা যায় যে প্রতিক্রিয়া শরীরের ধমনীতে রক্ত হয়ে মিশে থাকে। কবিতা সিংহের কবি-সত্তায় সেই বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব রক্ত হয়েই যেনবা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবাহিত। তিনি যখন লেখেন—'স্মৃতি গেলে / চতুর্দিক থেকে আমি যাই / চতুর্দিক চলে যায় আমার নিকট থেকে আমি / ধর্মহীন, অনুগত স্মৃতির কুকুরহীন একা ( একা )!' —তখন একাকিত্বকে তিনি মেনে নেন, আর মেনে নেওয়ার পরেও শূন্যতা থেকে মুক্তির স্বাদ পেতে উৎসাহী হন,—'একা / হা হা করে শব্দ যায় উচ্চারণ ভাঙে / আমার শূন্যতা ভাঙে আমার শূন্যতা ( ঐ )।' কবিতা সিংহ নিশ্চিতভাবে আত্ম-অস্তিত্ব-সচেতন কবি। নিজের সঙ্গে একাধিক সংলাপ বিনিময়ের মধ্যে বলে ওঠেন একসময়ে, —'কার সঙ্গে কথা বলো? আমি তো কবেই চলে গেছি!' ( আমি ত কবেই চলে গেছি )। আর এমন স্বগত-ভাষণে কবি চারপাশ থেকে নির্জন অন্ধকার অতীতের কোন এক কোণে সরে এসে একাকিত্বের আস্বাদ নেন প্রথম জন্মের যেন সেই শীতল মাটি-টুকুর প্রথম স্পর্শের পুলকে—'সঙ্গীবিহীন একা, নিজের আঁতুড়ে / আপন মৃত্তিকা ছেনে নিজের নির্মাণে' (ঐ)। অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সুতীব্র অথচ সংগুপ্ত সচেতনা না থাকলে এমন আত্ম-আলোয় স্বমহিম অবস্থান অসম্ভব। নিজের অস্তিত্বের ঘোষণাকে এই কবি উল্কার প্রতীকে রেখে তার খসে পড়ায় আত্মহনন, আনন্দ এসব খুঁজতে খুঁজতে একসময় সিদ্ধান্তে এসে নিজেরই যেন এক স্বচ্ছ আয়না ধরেন সামনেই— 'নাকি তার বুকে ভিতরে জ্বলে আশা,—যদি কেউ একবার দেখে / তার চলে যাওয়া দেখে, তার পোড়া, একেলা দহন / উদগ্র স্মৃতিতে কেউ যদি সেই উল্কার দর্শন / আজীবন করে যায়, ভিতরে বহন' ( উল্কা )। সময়-সচেতনতা, পরিপার্শ্ব সম্পর্কে আগ্রহ, পৃথিবীর সুখ-দুঃখকে বুঝতে, ধরতে বসে বার বার তার স্বরূপকে স্পষ্ট করার প্রয়াসে কবিতা সিংহ অক্লান্ত। পৃথিবী কোন কালে অনাবাসযোগ্য হলেও কবির কাছে বাঁচার আর্তি অফুরন্ত থেকে যায়। 'বিঁধে আছো বুকের ভিতর বেঁচে আছি / জলে বিঁধে এভাবেই মাছ / হাওয়া বিঁধে পাখি বেঁচে যায়!' ( আমার আকার )। এই বেঁচে থাকা, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, অস্তিত্বের মূল্যবোধে আস্থা

স্থাপনের সূত্রেই আলোচ্য কবি স্ব-প্রকাশে ক্ষান্ত দেন না। অস্তিত্ব তো অনস্তিত্বের অর্থেই বড়! কবিতা সিংহ পৃথিবীর দুঃখ কান্নাকে মেনে নিয়ে এক রহস্যময় বৈপরীত্য দিয়ে নিবিড় করে নিজেকে সামনে এনেছেন আমাদের। অস্তিত্বের স্বাদ তিক্ত-কষায় হলেও কবির কাছে আত্মপ্রকাশের আনন্দে তা একান্ত কাঙ্ক্ষিত,—'এভাবে কি পৃথিবীর সমস্ত আকার / দুঃখের আশ্রিত / এ ভাবে কি দুঃখ ছেনি কিমাকার ছেনে যায় একা / সমস্ত সৃষ্টির গায়ে তাই এত কান্নার আদল! / বিঁধে থাকো এভাবেই বিষতীক্ষ্ন ফলা / কিমাকার থেকে তুমি বিদ্ধ করো স্পষ্ট করো / আমার আকার'। বস্তুত কবিতা সিংহ তাঁর একাধিক কবিতায় জীবন-অস্তিত্বের নানান সূক্ষ্ম-স্বর্ণসূত্র নির্মাণে নিবিষ্ট হতে উৎসুক।

'কার্ণিশে ফুলের টবে বেঁচে থাকা'র সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা ও শিহরণ প্রসঙ্গে কবি শক্তিব্রত ঘোষ তাঁর যে নিঃসঙ্গ অনুভূতির কথা বলেন 'বনবাস' গ্রন্থের 'শীত' কবিতায়, তাতে জীবন-অস্তিত্বের মর্মমূলে তাঁর দৃষ্টি থাকে স্থির। জীবন সময়ের ফেরে এক সময় এমন এক কেন্দ্রে স্থিত হয়, যেখানে অদৃষ্ট অঙ্গুলি নির্দিষ্ট করে, কবির সমস্ত স্মৃতি নির্জনতায় ধূসর, রক্তহীন হয়ে যায়। একাকিত্ব কবির কাছে সত্য হয়,—'লেভেল ক্রশিং ঠেলে গাড়ির সময় ঠিক লাইনে দাঁড়িয়ে / অদৃষ্টের হাতে হাত ধরা, / অথবা নির্জন পাত্রে পরিত্যক্ত মদের মতন স্মৃতিহীন / সব অভিজ্ঞতা : / জানালায় একা রাত, হিমপতনের শব্দে পরস্পর।' স্মৃতিহীনতা ভয়ংকর। অস্তিত্বের মূল ধরেই দেয় টান। যেখানে স্মৃতি নেই, অবলুপ্ত, সেখানে 'একাকীত্ব হেঁটে যায়, মুখরতা স্তব্ধ হয় / সঙ্কটের মত ; / দু'হাত তুলেও কিছু চাইবার নেই, পায়ে পায়ে / নেমে যাওয়া অসম্ভব, কোথাও গীর্জায় / মধ্যরাতে ঘন্টা বাজছে ;' ( কার্ণিশে ) কিন্তু এই কবি সমস্ত রকম জৈবনিক অসম্ভাব্যতার ক্ষণেও বিশ্বাস করেন মানুষকে, মানুষের অস্তিত্বকে। তাই কবির যেন আর্ত আবেদন,—'তোমরা প্রার্থনা করো, মানবতা (ঐ)।' কখনো-কখনো কবি নিজেকে একান্তভাবে বন্দী মনে করেন। এই বন্দীত্ব সময়ের স্বভাবের, মানুষ-সম্বন্ধ বিক্ষত পরিপার্শ্বের, অধিগত আত্মচেতনার অসহায়তার। এই অসহায়তায় কবি অস্তিত্বের সংকট গভীরতম সত্তায় উপলব্ধি করেন বলেই চতুর্দিকের অলৌকিক অথচ কঠিন এক দেয়ালের ক্ষেত্রফলের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন,—'লোহার মত কৃষ্ণচূড়া, লোহার মত চৈত্র / পা দুখানি জড়িয়ে ধরে আছে, / এবং জলের কাছে / অঙ্গুরীয় হারিয়ে এসে / দু'হাত জুড়ে শকুন্তলা, / আমার পায়ে শিকল, আমার দু'হাত জুড়ে তালা ; / যতই ঘন্টা বাজাও ক্যাথিড্রালে' ( বন্দী )। শক্তিব্রত ঘোষ জীবন-অস্তিত্বের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সম্বন্ধ, শূন্যতা-পূর্ণতার সন্ধিৎসু কবি। তিনি যখন লেখেন,—'যত যাই শিকলে সুপ্রিয় থেকে মুক্তিলাভ তত / ক্লান্ত প্রতিফল ফিরে আসে ; / ( মানুষের আচরণ মূল্যানুগ হলে ভয়াবহ ) / ভিতরে গভীর ঘৃণা চর্চা ছাড়া / যেন হিংসা অনায়ত্ত থেকে যায়॥' ( ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে রক্ত, বিলাস ), তখন কবিকে বোঝা যায় তাঁর অস্তিত্বের সংকট সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মানসিকতার বিশিষ্টতায়। এই বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বুদ্ধিজীবী হৃদয়বান কবি অকপট হন এই বলে,—'আমি অন্তরাল চাই : / মুখোশের স্থায়ী বিশ্বস্ততা, / এবং এই পতাকাহীন নিশাকালে ঘুম, / আচরণ।' ( কলকাতায়

রাত দুটো ) কঠিন অর্থে প্রতীচ্যের অস্তিবাদী ভাবনা নয়, কিন্তু এক হৃদয়বান কবির বেঁচে-বর্তে থাকার আর্তি রাত্রির প্রতীকে চমৎকার প্রতিমা হয়েছে শক্তিব্রত ঘোষের 'রাত্রি' নামের কবিতায়,—'চিতাভস্ম সার হয়ে অসাড় বিশুদ্ধি / ছড়াচ্ছে জীবনে, / দ্যাখো, বেঁচে আছি মৃতদেহ উৎসবে পানীয়ে ; / বেঁচে আছি রাতের মতন আত্মাহুতি।' যেখানে চারপাশে কেবলই স্খলন, পতন, শূন্যতা, অনিশ্চয়তা, যেখানে মানুষ কেবলই নামছে নীচের দিকে, যেখানে সমস্ত হৃদয়-সম্পর্ক, বুদ্ধি-বিবেক সংকট-সংশয়কেই করতে চাইছে সত্য, সেখানে এই কবির বেঁচে থাকার উপযোগী বিবিধ ব্যাখ্যা অনুভূতির সূক্ষ্মতায় যে অভিজ্ঞতার আলো ফেলেছে একাধিক কবিতায়, তা প্রকৃতি, মানুষ, জীবন, স্মৃতি, মৃত্যু, মানবতা—এসবের মিশেলে হৃদয়ার্ত অস্তিবাদী চিন্তা-ভাবনার সুরেই স্পষ্ট করে।

রবীন সুর সামাজিক ভাবনাকে কাব্য-বিষয়-বিচ্ছিন্ন করেন নি কোন ভাবেই। তিনি সামাজিক মানুষ। কিন্তু সামাজিক হতে গিয়ে যে বিচ্ছিন্নতাবোধের গূঢ় ও গাঢ় অভিজ্ঞতার জন্ম হয় তাঁর বোধের জগতে, সেখানে কবি নির্মম ব্যঙ্গে বলতে পারেন,—'সুখের আড়ালে মুখ শয়তানের মতো অনুভব।' তাঁর সঙ্গে সমাজকে আলিঙ্গনে নিয়ে বাঁচার প্রয়াসগুলি বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করে, বিভ্রান্ত করে, ভাবিত করে, পর্যুদস্ত করে। আর করে বলেই—'ঘাতক বা হত দিনগুলি ক্লান্তি উৎপাদক।' কবি ক্রোধে বলতে সংকোচ করেন না এতটুকুও,—'শকুনের খাদ্য এই অদ্ভুত সময়।' এত সব অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে যে বোধের জন্ম দেয়, তা হাহাকারের, তা জীবনকে বরণ করার উৎসাহের কারণেই বিরাট ধাক্কা খেয়ে অভিনব হতাশার জন্ম দেয় কবির অভিজ্ঞতার মর্মমূলে,—'অন্তিম শূন্যতা এক মানসিক পক্ষাঘাত প্রাণান্ত প্রদাহ, / ফানুষের মতো ফাটে মানুষের শেষ ভালোবাসা।'

ক্রুদ্ধ, আর এক রবীন সুরের সমবয়সী, কবি অনন্ত দাশও—'আমার সমস্ত ক্রোধ ফেটে পড়ে হাঙরের দাঁতে।' ক্রোধ কবির কাল চেতনার স্বীকৃতি। যে কাল সমস্ত রকম অস্থিরতা, অসুস্থতা, অস্থিত-চিত্ততাকেই সত্য করে, জীবনের কঠিন মাটিকে নেয় সরিয়ে অবলীলায়, মানুষকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখতে তার কোন কসরৎ করতে হয় না, যে কাল সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, মানুষ—সমস্ত দিয়ে ফাটলের দাগে চিহ্নিত, সেই কালে বসে কবির পক্ষে একথা বলাই বোধ হয় সঙ্গত,—'অবাধ শূন্যতা যেন আজীবন ঘিরে থাকে / দৃঢ়মূল বৃক্ষের ছায়ায়' ( মেঘের কঙ্কাল ভেঙে )। কবি কি জীবন বিমুখ ? নাকি জীবনের কাঙাল বলেই প্রাত্যহিক জীবনের ঊর্ধ্বে বড় জীবন-প্রার্থী ? অস্তিত্বের এমন সংকটকে অনুভব করেছেন বলেই নিজের ঘৃণাটুকু গোপন রাখেন নি কোথাও,—'নিদ্রিত ধমনী ধেয়ে নক্ষত্রের আলো ! / তবু এই জীবনের সারাৎসারে/কেন এত ঘৃণা বাড়ে ?' (ঐ)। ক্রোধ প্রশমিত হলে, ঘৃণা রক্তের কণিকায় মিশে গেলে আসে শূন্যতা, আর শূন্যতা কবিকে নিঃসঙ্গ করে কখন যেন! কিন্তু কবি যে জীবন-অস্তিত্বে শান্তি চান, হয়ত পানও, তাই এই দায়িত্বশীল কবি অকপটে নিজের স্বীকৃতি দিয়ে দায়িত্বটুকু পালনে তৎপর হন,—'জমাট রাত্রির মতো নিঃসঙ্গতা বুকের দুপাশে / অন্ধকার উইঢিপি ঢাকা / উষ্ণতা কোথাও নেই, বন্দরের আলো / বৃক্ষের কোটরে জমা হয় / মেঘের কঙ্কাল ভেঙে আমি কিছু রৌদ্র নিয়ে আসি' ( ঐ )।

এঁদেরই আর এক সমসময়বর্তী কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় তো অস্তিত্বের তাড়নায় এত বেশী নিমজ্জিত মুখ হয়েছেন যে তাঁর কোন কোন কাব্যগ্রন্থের নামই দিয়েছেন, 'অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত'। তাঁর 'ইবলিসের আত্মদর্শন' কবিতাটিতে কবিমনের শূন্যতার হাহাকার, বিচ্ছিন্নতার ক্ষোভ তীব্রতম হতে দেখি। বেদনায় ক্ষিপ্ত হলে যে মানুষ সব কিছু ভেঙ্গে-চুরে লণ্ড ভণ্ড করতে পারে, কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় এই কবিতায় তারই ভূমিকা নিয়েছেন। কেন এই বেদনা? জীবনকে তার সঠিক কেন্দ্রে স্থিত দেখছে না বলে? সমস্ত জীবন ও জন্মের প্রমাণপত্রে কেন এত অবিশ্বাস? অস্তিত্বকে বাঁচাতে গিয়ে পরাজিত হওয়ার কারণে, নাকি তাঁর উদার, উদাস, মুক্ত প্রান্তর-অন্বেষণের অভিজ্ঞতা এমন বলে,—'প্রান্তর নেই / সব প্রান্তরের শেষে প্রাচীন-পরিখা।' কবির ক্রোধ যা দেখি রবীন সুরের কবিতায়, অনন্ত দাশের কবিতায় এবং এঁদের পূর্বসূরীতে, সেই ক্রোধ আর এক রূপে জ্বলে যায় এই কবির কবিতায়। এমনভাবে অস্তিত্বকে অস্বীকার করার সবল বাসনা ও শক্তিময়তা, কবির জীবনকে গ্রহণ করার অন্তিম বাসনার জন্যই! যে কবির অভিজ্ঞতা এমন,—'জন্ম হতে শুনি শুধু আহত শূকর করছে অন্তিম চীৎকার'—সে কবির সংকট এমন অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সংকটকেই প্রধান করতে বাধ্য। সেই একই কথা,—সময় সচেতনতা কবিকে নিবীর্য করতে চায় বলেই, কবি সময়ের বন্ধ্যা অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সমস্ত কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকারে এতটুকুও ইতস্তত করেন না,—'আমার জন্মের কোনো ইতিহাস নেই / শূন্যতার জরায়ুতে ভ্রূণ হয়ে অস্তিত্ব ঠেকাই / অস্তিত্ব? মাংসের পিণ্ড, / কিছু জল কিছু বায়ু / অনন্ত শূন্যের কিছু অংশ ক্ষীয়মান—/ শূন্যতার জরায়ুতে নির্বোধ যন্ত্রণা।'

আগেই বলেছি, একালের বাংলা কবিতায় বেশীর ভাগ কবিই আক্ষরিক অর্থে প্রতীচ্য অস্তিবাদের প্রয়োগ নিয়ে বিশেষ ভাবিত হন নি। তাঁরা স্ব-দেশের পরিমণ্ডলেই জীবন-অস্তিত্বের অর্থ সন্ধানে হৃদয়ানুগ থেকে ব্রতী হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব ভাবনাকে বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমাপতনে সূক্ষ্ম অনুভূতি-নির্ভর প্রতীকের অভিজ্ঞতায় উপস্থিত করতে আগ্রহী থেকেছেন। কিন্তু কোন কোন কবি সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই, বুদ্ধিগত ভাবেই তাঁদের কবিতায় পাশ্চাত্ত্য অস্তিবাদী ধারণাকে চিত্রল কবিত্বময় করেছেন। বার্ণিক রায় সেরকম একজন কবি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এই কবি 'মনীষা-মনসা' অস্তিবাদকে কবিতায় গ্রহণে উৎসুক, একান্ত উৎসাহী। তাঁর কোন কোন কবিতায় অস্তিত্ব এক ভীষণতায় নিস্তব্ধ রূপাবয়ব পায়। যেমন,—'কাজ শেষে ক্লান্ত দেখে ঠাণ্ডা জল খেতে ফ্রিজ খুলে / ফ্রিজের ম্যাগনেটিক ভোরের মতন ধীরে ধীরে / আপনি এগিয়ে এসে তোমার হৃদয়/কুয়াশা বরফে ঢেকে নিঃশব্দে জড়িয়ে রুদ্ধ করে/ গন্ধভরা অন্ধকার রাত্রির নির্মাণে।' এই কবি অস্তিবাদী দর্শনের অনুগ দায়িত্ব, স্বাধীনতা, বিচ্ছিন্নতা, অপরাধ, মৃত্যু, সীমিত জীবনের অস্বস্তি সম্পর্কে অতি-সচেতন। সেই সচেতনতাই তাঁকে প্রেরণা দেয় 'নসিয়া' বা বিবমিষা নিয়ে কবিতা রচনায়। বার্ণিক রায়ের 'বিবমিষা' নামেই একটি কবিতা আছে। কবিতাটিতে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে, অস্তিবাদী দর্শন চিত্রকল্পে ব্যঞ্জনা পেয়েছে। **'Nausea' হল 'The**

**taste of the facticity and contingency of existence.'** খাঁটি অস্তিবাদী দার্শনিকের কথায় **'A dull and inescapable a nausea perpetually reveals my body to my consciousness.'** আলোচ্য কবির 'ব্যালকনি' নামের কবিতায় এর পরিচয় মেলে,—'বন্ধ ঘরে বসে আছি, পেছনের ঘরের দেওয়ালে/এয়ার কুলার ; ঠান্ডা, মৃদু আলো, শীত লাগে,/সামনে কাচের দরজা আঁটা, ভারী পর্দা/ঝোলানো হাতের মত, কথা বলি,/ শব্দ শোনা যায় না বাইরে ; / পেছনে ময়লা নোংরা দেয়াল ছাপিয়ে উঠছে রোজ/আবর্জনা, বিশাল বিস্তৃত, ঘন, কালো,/চৌকাঠে পা ফেলতে তেল কালি—পেট্রোলের গন্ধ—/ সমস্ত শহর জুড়ে অমিতাভ জঞ্জাল, চৈত্য কবিতা।' বার্ণিক রায় একজন অস্তিবাদী দার্শনিকের মতই কবিপ্রাণের নিগূঢ়তার মধ্যে ভেবেছেন কেমন করে ভীষণতা অস্তিত্বকে চূর্ণ করে,—'একদিন রাত্রিবেলা অনিদ্র চোখের স্বপ্নে ওরা বুকের ভেতরে ঢুকে পাতালের বিভৎস মানুষের মত প্রচণ্ড হাওয়ায় হাত তুলে হুল্লা নাচ শুরু করে। এ ওর কোমরে হাত জড়িয়ে এমন গান ধরে। সে গলা ফাটানো চীৎকারে টেলিভিশনের নীলচে স্ক্রীন চুরমার হয়ে যাবার উপক্রম হয়। আমার ঘরের সাদা দেয়ালে প্রচণ্ড বাঁকা ক্র্যাচ, আমার অস্তিত্বে সূক্ষ্ম ফাটল ধরায়।' দার্শনিক অস্তিবাদ শূন্যতার স্বরূপ স্পষ্ট করে। অস্তিবাদ আরও উজ্জ্বল করে মানুষের সংশয়ের স্বরূপকে। অস্তিবাদের সংশয় অন্ধকারের জিজ্ঞাসা যে কোন কট্টর অস্তিবাদী কবিকে, তাঁর কবি-আত্মাকে লক্ষ্যহীন গন্তব্যে নিয়ে যেতে চায়। বার্ণিক রায়ের একাধিক কবিতায় সেই শূন্যতা, সংশয়, সেই লক্ষ্যহীন গন্তব্যে যাওয়ার আর্তি বর্তমান। তাঁর 'হে আমার মৃত্যু' নামের কাব্যগ্রন্থের দু'টি বিশিষ্ট কবিতার আংশিক উদ্ধৃতি তার প্রমাণ দেয়। ১. 'বিচ্ছিন্ন রাত্রির নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমার পৃথিবী ভারী হয়ে ওঠে।' 'আমার বুকের আলোহীন গভীর অরণ্যে বর্ণহীন নির্মম নিয়তি স্বাদের শূন্যতা তুলে হাঁ করে শুধুই হাসে।' (প্রস্তুতি), ২. শব্দের কফিনে মৃত শুয়ে আছে, শববাহকেরা গভীরে ঘুমোয়, শব্দ-মাটি চাপা দিয়ে, / তবু কথা বলতে চাই, কেউ শোনে না, শুনলেও চোখ মেরে হেসে চলে যয়ে/চলছি-থামছি-হাঁটছি, থামছি চলছি থামছি/ মিথ্যার মদের গন্ধে পৃথিবীর মেদ স্ফীত হচ্ছে রোজ / আমার নিজের কণ্ঠস্বর নিজে শুনে চমকে উঠি।' ( জিজ্ঞাসার আগে )। এই কবি নানা আঙ্গিকে কবিতার অভ্যন্তরে অস্তিবাদের ধ্যান-ধারণাকে প্রয়োগ করতে সিদ্ধ। 'উপবর্হণ' গ্রন্থের 'ট্রেন' নামের কবিতাটিতেও কবিকে দেখি এক্সপ্রেসনিস্ট কবিতার টেকনিকে প্রয়োগে তৎপর হতে। বস্তুত বার্ণিক রায় বাংলা কবিতায় পাশ্চাত্ত্য অস্তিবাদের প্রয়োগে একজন সচেতন সিদ্ধ কবি।

এইভাবে একালের একাধিক কবি তাঁদের কবিতায় অস্তিবাদী চিন্তাধারায় নিমগ্ন হয়েছেন। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতিতে জড়ানো সময় ও মানুষ মিলে একজন আর একজনের ওপর প্রভাব ফেলে, একজন আর একজনকে গ্রহণ বা বর্জন করে। কিন্তু সম্পর্কের বা সম্পর্ক রচনার মধ্যেই আসে শূন্যতা, আসে নিঃসঙ্গতা, আসে অস্তিত্ব নিয়ে জটিলতম নানান ভাবনা। একালের বাংলাদেশের কবিরা কখনো প্রেমে, কখনো সমাজ অস্তিত্বে, কখনো ব্যক্তিত্বে, কখনো বা নিয়তি-নির্দিষ্ট মৃত্যু-চিন্তায় জীবনকে সামনে এনেছেন, যাচাই করেছেন জীবন কি, জীবনের মানে কি, তার প্রয়োজন কতটা,

স্রষ্টার আত্মিক পরিশীলনের পক্ষে এই জগত, জীবন, মানব-সম্পর্ক—সমস্ত কিছুর গুরুত্ব কোন্ ডাইমেনশান্ আনে—তার বিভিন্ন দিকগুলি। এই ভাবেই বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ হৃদয়ের অধিগত থেকেই অস্তিবাদী চিন্তাভাবনা গভীরে প্রোথিত হয়েছে ধীর পদসঞ্চারে।

বাংলা নাটককেও এমন অস্তিবাদী-দর্শনভাবনা থেকে মুক্ত হতে দেখি না। নাটক চতুরঙ্গ শিল্প, তার প্রভাব জনমানসে অত্যন্ত বেশী। গতানুগতিক, পেশাদারী নাটক নয়, শুধুমাত্র বুর্জোয়া-সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনী দায়িত্ব পালন নয়, এসময়ের অস্তিত্ব-চেতনায় দীপিত নাটক একালে একাধিক নাট্যকার রচনা করেছেন। যদিও সাম্প্রতিক কালে আমাদের বাংলা সাহিত্যে মৌলিক নাটকের থেকেও বিদেশী নাটকের ভাব-ভাবনার অনুসরণেই অধিকাংশ নাটকের অভিনয় প্রয়াস দেখি, তবু সে সব নাটকের অনুপ্রেরণা, অন্তর্নিহিত ভাবকে উৎসাহ উদ্দীপনায় গ্রহণ করে যে সব মৌলিক নাটক অভিনীত হতে দেখি সেখানে কিন্তু সময়ের সংকট, ব্যক্তির সংকট, গোষ্ঠীর অসহায়তা, জীবনের সংকট—এসবেরই বিপুল প্রকাশ লক্ষ্য করি। আমাদের কাছে আছে ব্রেশ্‌ট্, সাত্র্‌র্, অসবোর্ন প্রমুখের একাধিক নাট্যাভিনয়ের মাধ্যম। পাশাপাশি পাই বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, প্রমুখ নাট্যকার—যাঁরা মৌলিক নাটকে অস্তিবাদী-দর্শনকে স্পষ্টত প্রয়োগ করে জীবনের দিকে মুখ ফেরানোর কথা বলেছেন। কৃষক-শ্রমিকদের কথা, বুর্জোয়া কালচারের শূন্যতা, ব্যক্তির অসহায়তা—এসবই এঁদের নাট্যভাবনার অঙ্গীভূত। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিত' এক এ্যাবসার্ড-নাটক। এর এ্যাবসার্ডিটির মূল কথাই অস্তিত্ব, অস্তিত্বের সংঘাত, সংঘর্ষ, সংকট। মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নাটকটিকেই যদি ধরা যায়, দেখা যায় এর নায়ক বৃদ্ধ বাঞ্ছারামের যে শেষতম মানস মুক্তি, তা তো জীবনকে ভালবাসারই, বা তাঁর 'পরবাস' নাটকের সেই ছাপোষা ভাড়াটিয়া নায়ক—যে স্ত্রীকে ছেড়ে চাকরী করতে এসে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করার নিরন্তর নিষ্ফল কামনায় ক্ষয় হতে হতে ক্রমশ জীবনের একটা মানে খুঁজে ফেলে—সেখানেও সেই অস্তিত্বের সংকট ও সংকট-শূন্যতার কথা। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাকালীর বাচ্চা' নাটকেও শ্রেণী সংঘর্ষের চিত্রে যে ফলিতার্থের-ব্যঞ্জনা, তার মূলেও সেই জীবনপ্রেম। মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার', 'রাজদর্শন'—দু'টি নাটকেও তীব্র ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে, কখনো বা মানুষের অপরিমেয় লোভ লালসার চিত্র দিয়ে প্রচলিত জীবন-ছবি ও জীবনের বিপরীত বড় আকাঙ্ক্ষার ছবির কথা সত্য হয়েছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দেখি এদেশের সমাজ-রাষ্ট্রনীতি রাজনীতির স্পষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলায় বেঁধে নাটকের বিষয়কে উপস্থাপিত করতে গিয়ে এদেশেরই মাটির কথা, তার মানুষগুলির অস্তিত্বের সংকটের কথা বলেছেন অপরূপ শিল্পসুষমায়। মৌলিক বাংলা নাটকে প্রতীচ্যের অস্তিবাদী ধ্যান-ধারণার প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ব্যাপারে কবি বার্ণিক রায়কেও একাধিক এ্যাবাসার্ড নাটক রচনা করতে দেখি। প্রসঙ্গত তাঁর 'সময়ের ভিড়' ও 'চক্ষুহীন বেদনা' নাটকের কথা মনে পড়ে। এই জাতীয় বাংলা নাটকে নাট্যকার অস্তিবাদী দর্শনের আধ্যাত্মিক আকৃতির সম্যক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নাটক দু'টির প্রেক্ষাপটে আছে 'এ্যাব্সার্ডিটি', এবং মৌল বিষয় ও লক্ষ্যে অন্তঃশীল থেকেছে নিঃসীম শূন্যতা ও অসহায় বিচ্ছিন্নতার শিল্পীত স্বরূপ।

বস্তুত, আমাদের দেশে, সংখ্যায় অল্প হলেও, যে সমস্ত মৌলিক নাটকের জন্ম ঘটেছে একেবারে একালে বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে—সে গুলির মধ্যে সচেতনভাবে অস্তিবাদী দর্শনভাবনা থাকতে বাধ্য, কারণ আমরা এবং আমাদের নাট্যকাররা নানাভাবে সার্ত্র, ক্যামু, ব্রেশ্‌ট, জন অসবোর্ন প্রমুখের অস্তিবাদী ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি, নাট্য-বক্তব্য এদেশের প্রেক্ষিতে অন্য মাত্রা পেয়েছে। সে মাত্রা নিশ্চিতভাবে অস্তিবাদিতারই।

॥ ৪ ॥

সাহিত্য জীবনের কথা বলে, মানুষের কথা বলে। যেহেতু জীবন ও মানুষ সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়, মানুষের রাজনীতি-ভাবনা ও অর্থনীতি-ব্যবস্থা থেকে বিবিক্ত নয়, তাই গোটা দেশই জীবন গঠনের মূলে বিশালতম বটবৃক্ষের মাটির মধ্যেকার শিকড়গুলির মত জীবনকে জড়িয়ে ধরে। একই সঙ্গে মানুষের কথা এলেই সব দিকে পড়ে টান। জীবন সেই আকর্ষণে কখনো হয় দীপ্ত, কখনো হয় বিষণ্ন, কখনো হয় পরাজিত। সব সময় সমাজ জীবনকে গড়ার উপযোগী রসদ দেয় না, দিতে পারে না। বুর্জোয়া অর্থনীতি ব্যবস্থায় বৈষম্য জীবনের ও মানুষের নামাবলী হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র যদিও বলেছেন 'কেহ একা থাকিও না,' তবু জীবনের ভিত্তিতেই একা থাকার, নিঃসঙ্গ হওয়ার রস থেকেই যায়। মানুষ যে কোন ভাবেই হোক তার শিকার হবেই, জীবন হবে তারই দাস।

আর এই দাসত্ব তৈরি করে যাবতীয় অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সংকট। সাহিত্য তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। সারা বিশ্বের সাহিত্যে এক একটি বিশেষ সময়ের আলোড়নে জীবন ও মানুষের অস্তিত্ব নতুন মূল্যায়ন চায়। লেখক-বুদ্ধিজীবীরা তারই আজ্ঞাবহ। সার্ত্র, ক্যামু, কাফ্‌কা থেকে শুরু করে পৃথিবীর সমস্ত সচেতন লেখকই অস্তিত্বের কথা ভেবেছেন। কেউ নিরাশায় হয়েছেন নতমুখ, কেউ আশায় হয়েছেন দীপ্ত, কেউ জীবন গ্রহণে হয়েছেন ঘরে ফেরা পাখীর মত নীড়াকাঙ্ক্ষী ; কেউ ক্রোধে সব কিছু ভেঙে চুরমার করার মত শক্তি নিয়ে পরশুরাম। অর্থাৎ সকলেই বৈপরীত্যের ক্রান্তি রেখায় দাঁড়িয়ে অস্তিত্বের ভাবনায় গভীর-নিবিষ্ট হয়েছেন। এই নিবিষ্টতা তাঁদের নিয়তি। তাই সাহিত্যে অস্তিবাদ, তা সাহিত্যের বিষয়চিহ্নিত নিয়তিবাদ। বিশ শতক যদিও বুদ্ধির শতক, বুদ্ধিমানদের শতক, বুদ্ধিজীবীদের যথার্থ বিচরণ ক্ষেত্র, তবু তার যাবতীয় বুদ্ধিগত বৈজ্ঞানিক তৎপরতাই তার আধুনিকতা। কিন্তু বিশ শতকের সাহিত্যে এমন অস্তিবাদী দর্শনের প্রয়োগ, প্রচার, প্রসার বস্তুত কোন অর্থেই সেই বুদ্ধির তান্ত্রিক আচার নয়। নির্মোহ, রক্তচক্ষু, আত্মানবিষ্ট শ্মশানচারী তান্ত্রিকের যে গৈরিক বা রক্তমাখা ভাবনা, তা অস্তিবাদের মূলে সম্পূর্ণই উপেক্ষিত।

প্রসঙ্গত পাস্কালের একটি কথা মনে পড়ে যায়। পাস্কাল যে কথাটি বলেছেন, তার নির্গলিতার্থ নিজের ভাষায় বোঝাতে গেলে, কথাটা এই রকম দাঁড়ায়—হৃদয়েরও যুক্তি আছে, কোনক্রমেই সে মস্তিষ্কের যুক্তি বা বুদ্ধির কাছে হার মানে না, তার হার মানার কথাও নয়। পাস্কালের এই ভাবনাকে মেনে নিয়েই বলি, অস্তিবাদী লেখকরা হৃদয়ের যুক্তিকেই প্রধান করেছেন। তার যেখানে হৃদয়, সেখানে জীবন, যেখানে হৃদয়ের যুক্তি,

সেখানেই জীবনের চলমানতা। এই চলমানতা হৃদয়ে-হৃদয়ে মানবিক-অমানবিক সম্পর্কেই নির্ধারিত হয়ে যায়। বাঙালী প্রাচীন চর্যাকাররা বলছেন, গুরুনির্দেশিত সাঁকোয় চড়লে বাম-ডাহিন কোরো না, সিদ্ধি হবে না। হৃদয় আর হৃদয়ের যুক্তি দিয়ে জীবন যখন চলে তখন তারও বাম-ডাইন করতে করতেই একটা শুদ্ধ জীবন পাওয়ার আশা থেকে যায়। বুদ্ধি মানেই বিচার, আর এই বিচার যদি গেরুয়া বসন পরে, তাকেই একমাত্র সত্য করে, তবে তা হবে নিশ্চিত নিষ্ফল। বিশ শতকের নিছক বুদ্ধিবাদী দর্শন অস্তিবাদী দর্শনের কাছে নতমুখ, পরাজিত।

অস্তিবাদীরা সমস্তরকম বুদ্ধিনির্ভর বৈপরীত্যকেই মেনেছেন, কিন্তু মেনে নেওয়া আর সিদ্ধান্তে আসা এক নয়। 'মেনে নেওয়া' কথাটি সময়কে স্বীকৃতি দান, সময় প্রসূতির মধ্যে আত্ম-সমালোচনা করা, আর 'সিদ্ধান্তে আসা' তাঁদের একান্ত নিজস্ব। সেখানেই তাঁরা অন্য দর্শন ও দার্শনিক থেকে সরে আসেন, সরে এসে ঘনিষ্ঠ হন হৃদয়ের মানুষের কাছে। পৌরাণিক শিবের ত্রিশূল কিন্তু কেবল অস্ত্র নয়, তার হাতের একটি অঙ্গ, একটি ভূষণও—যা তার অস্তিত্বকে দীপ্ত করে যেমন, তেমনি সুন্দরও করে। তাই সাহিত্যে অস্তিবাদ শিবের ত্রিশূলের মত অনন্তসঙ্গী, অনন্ত ঊর্ধ্বমুখী, অথচ রৌদ্রকরদীপ্ত এবং শক্তিমান মানবরস-সমৃদ্ধ জীবন দর্শন!

## প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও গ্রন্থকার


A Kierkegaard Anthology, Ed. by R. Bretail.
A Short life of Kierkegaard, Walter Lowrie.
A Kierkegaard Handbook, Frederick Sontag.
From Rationalism to Existentialism, The Existentialists and their Nineteenth Century Backgrounds, R. C. Solomon.
Philosophical Fragments, S. Kierkegaard, Tr. by D. F. Swensen.
Concluding Unscientific Postscript, S. Kierkegaard, Tr. by Swensen and Lowrie.
Existentialism, Mary Warnock.
Existentialism, John Macquarrie.
Frederick Nietzsche, Philosopher of Culture, F. Copleston.
Nietzsche, P. E. More.
Nietzsche as Philosopher, A. C. Danto.
Nietzsche : His life and work, Anthony Ludovici.
The Existentialist outlook, Margaret Chatterjee.
Introduction to Existentialism, R. G. Olson.
Introduction to Existentialism, Marjorie Grene.
Existentialism and Phenomenology, R. Solomon.
Phenomenology and Existentialism, Debabrata Sinha.
Phenomenology and Existentialism, Lee and Mandelbaum.
Ideas, Edmund Husserl, Tr. by. W. R. B. Gibson.
'Phenomenology' article in Encyclopaedia Britannica.
The Phenomenological Movement, H. Spiegelberg.
A First Introduction to Husserl's Phenomenology, J.D. Kockelman.
Phenomenology, Thevanez.
Heidegger, George Steinner.
Heidegger and Modern Philosophy, M. Murray.
What is Philosophy, Martin Heidegger, Tr. by. Kluback and Wilde.
Introduction to Metaphysics, Martin Heidegger, Tr. by R. Manheim.
Being and Time, M. Heidegger, Tr. by. Macquarrie and Robinson.

Sartre, A. C. Danto.
Sartre, A Manser.
Sartre : Romantic Rationalist, Iris Murdoch.
Jean-Paul Sartre : Philosopher without faith, R. M. Alberes.
The words, Jean-Paul Sartre, Tr. by Irene Clephane.
Existential Marxism in Post War France, Mark Poster.
Jean-Paul Sartre : A Literary and Political study, Philip Thody.
Camus 1913-1960, Philip Thody.
Camus, A Collection of Critical Essays, Ed. by Germaine Bree. (Sartre versus Camus, a Political Quarrel, by Nicola Chiarmonte)
The Phenomenology of Perception, Maurice Merleau Ponty, Tr. by C. Smith,
The Structure of Behaviour, Maurice Merleau Ponty, Tr. by A. Fisher.
Merleau Ponty : Existentialist of the Social World, Albert Rabil.
Camus, C. C. O' Brien.
The Stranger. A. Camus, Tr. by S. Gilbert.
The Plague, A. Camus, Tr. by S. Gilbert.
The Rebel, A. Camus, Tr. by Anthony Bower.
The Fall, A. Camus Tr. by Justin O'Brien.
Selected Essays and Note books, A. Camus, Ed. and Tr. by Philip Thody.
The Prime of Life, Simone de Beauvoir.
Force of Circumstance, Simone de Beauvoir.
New Left Review, 1976. (Simone de Beauvoir questions Jean-Paul Sartre).
Existentialism from Dostoevsky to Sartre, Walter Kaufmann.
Nausea, J. P. Sartre.
The Age of Reason, J. P. Sartre.
The Repreive, J. P. Sartre.
Iron in the Soul, J. P. Sartre.
Notes from the Underground, F. Dostoevsky.
Crime and Punisment, F. Dostoevsky.
The Idiot, F. Dostoevsky.
The Brother Karamazov, F. Dostoevsky.

**For whom the Bell Tolls, E. Hemingway.**
**The Old Man and the Sea, E. Hemingway.**
**The Trial, F. Kafka.**
**The Castle, F. Kafka.**
**The Naked and the Dead, Norman Meller,**
**The Respectable Prostitute, J. P. Sartre.**
**The Waiting for Good, Samuel Backet.**
**Act without words, Samuel Backet.**
**The Longdays Journey into Night, Yugin O'neil.**
**After the Fall, Arther Miller.**
**The Jew Story, Edward Franklin Olbi.**

কমলাকান্তের দপ্তর/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হোয়াট ইজ লিটারেচার ?/জাঁ-পল সার্ত্র্
পরিচয় পত্রিকা
রাইটার্স কংগ্রেসে ভাষণ/ম্যাকসিম গোর্কি
প্রবন্ধ/J- Meior Graefe
প্রবন্ধ/মেরেজকভ্স্কি
দ্য মেটামরফোসিস/ফ্রাণৎস কাফ্কা
বাডেনব্রুক্স্/টমাস মান
ম্যাজিক মাউন্টেন/টমাস মান
ডেথ ইন ভেনিস/টমাস মান
বারবারা সোর/নরম্যান মেলার
জন স্টেইনবেক
আওয়েন
ম্যাসুন
টি. এস. এলিয়ট
'ব্রেড এণ্ড ওয়াইন' কবিতা/হোল্ডারলিন
দ্য লেপ্ন্/ইউজিন ইয়োনেস্কো
আমোদি বা 'হাউ টু গেট রিড অফ ইট'/ইউজিন ইয়োনেস্কো
লুক ব্যাক ইন এ্যাঙ্গার/জন আস্বোর্ন
অ্যাণ্ডার দ্য নেট/আইরিশ মার্ডক
আউটসাইডার/কলিন উইলসন
হারি অন ডাউন/জন ওয়েইন
লাকি জিম/কিংসলে এ্যামিস
দ্য রুম/হ্যারল্ড পিন্টার

দ্য বার্থডে পার্টি/হ্যারল্ড পিন্টার
দ্য কেয়ারটেকার/হ্যারল্ড পিন্টার
চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি/আর্নল্ড ওয়েসকার
রুট্স্/আর্নল্ড ওয়েসকার
দ্য আইসম্যান কামেথ/ইউজিন ও'নীল
দ্য গ্লাস মেনেজারি/টেনেসি উইলিয়াম্স্
এ স্ট্রীট কার নেম্ড্ ডিজায়ার/টেনেসি উইলিয়াম্স্
বারটোল্ড ব্রেশ্ট্
জননী/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
পুতুল নাচের ইতিকথা/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
পদ্মানদীর মাঝি/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
চতুষ্কোণ/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
ধরা বাঁধা জীবন/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মীরার দুপুর/জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
নীল রাত্রি/জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
বারো ঘর এক উঠোন/বিমল কর
ফানুসের আয়ু/বিমল কর
সুধাময়/বিমল কর
অশোক কানন/বিমল কর
শেষ পাণ্ডুলিপি/বুদ্ধদেব বসু
নক্ষত্রের রাত/মতি নন্দী
বেহুলার ভেলা/মতি নন্দী
কলকাতা ও গোপাল/দেবেশ রায়
লঘু গুরু/জগদীশ গুপ্ত
কিনু গোয়ালার গলি/সন্তোষকুমার ঘোষ
কাণা কড়ি/সন্তোষকুমার ঘোষ
বিবর/সমরেশ বসু
সংকট/সমরেশ বসু
যযাতি/দেবেন রায়
জীবন যে রকম/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ঘুণপোকা/শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
পারাপার/শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সম্পর্ক/দিব্যেন্দু পালিত
চাঁদ ডুবে গেলে/আনন্দ বাগচী
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা

বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা
সমর সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা
রাম বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা
যে যেখানে আছো/কৃষ্ণ ধর
কিরণ শংকর সেনগুপ্তের কবিতা
সোনার মাছি খুন করেছি/শক্তি চট্টোপাধ্যায়
যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো/শক্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রভু নষ্ট হয়ে যাই/শক্তি চট্টোপাধ্যায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা
অমিতাভ দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা
স্বগত সন্ধ্যা/আনন্দ বাগচী
ঘরে দূরে দিগন্ত রেখায়/শিবশম্ভু পাল
কবিতা পরমেশ্বরী/কবিতা সিংহ
বনবাস/শক্তিব্রত ঘোষ
রাবনের সিঁড়ি/রবীন সুর
তেজস্ক্রিয় ঘোরা টোপ/রবীন সুর
অনন্ত দাসের কবিতা
অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সংক্রান্ত/পবিত্র মুখোপাধ্যায়
উপবইণ/বার্ণিক রায়
হে আমার মৃত্যু/বার্ণিক রায়
এবং ইন্দ্রজিৎ/বাদল সরকার
সাজানো বাগান/মনোজ মিত্র
রাজদর্শন/মনোজ মিত্র
পরবাস/মনোজ মিত্র
নরক গুলজার/মনোজ মিত্র
মহাকালের বাচ্চা/মোহিত চট্টোপাধ্যায়
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্তরঞ্জন ঘোষ
সময়ের ভিড়/বার্নিক রায়
চক্ষুহীন বেদনা/বার্নিক রায়
প্রবন্ধাবলী/পাস্কাল